বনজারা

শেখর দাশ

বনজারা

বনজারা

শেখর দাশ

অক্ষর পাবলিকেশানস্
প্রধান কার্যালয় ঃ 'সঞ্জীব ভিলা', জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১

banjara
a novel by shekar das
বনজারা : শেখর দাশ

ISBN- 978-81-89742-79-9

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৩

প্রচ্ছদ : অমিত নাথ

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ : ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, জে. বি. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'বইঘর' ও অক্ষর সেল্স কাউন্টার, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১

সার্বিক যোগাযোগ
অক্ষর পাবলিকেশানস, সঞ্জীব ভিলা, জগন্নাথবাড়ি রোড, , আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১
email : jraksharpub@gmail.com
visit us : www.aksharagartala.com
দূরভাষ : (০৩৮১)- ২৩০-৭৫০০/২৩২-৪৫০০/৯৪৩৬১২১১০৯

মূল্য □ ২৫০ টাকা

উপন্যাসটি আমার একমাত্র সন্তান
কাজরীর স্মৃতির উদ্দেশে

বনজারা

শেখর দাশ

অ্যাটেনশন প্লীজ, অ্যাটেনশন প্লীজ ... ট্রেন ডাউন জি.এল হুইচ ইজ বাউন্ড ফর গৌহাটি উইল অ্যারাইভ্ অন প্ল্যাটফর্ম নাম্বার থ্রী শর্টলি ...।

'এক বিশেষ সূচনা এক বিশেষ সূচ্না গৌহাটি যানেওয়ালী ডাউন জি.এল. কুছেক ক্ষণোঁ, মে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর আ রহী হ্যায় ...

প্ল্যাট্ফর্মের সিলিং-এ ঝোলানো ইলেকট্রিক ঘড়ির গোলাকার শাদা পট। পটের কেন্দ্রে প্রোথিত বড়ো - ছোটো দুটো কালো কাঁটায় দুপুর একটা-দশ।

সাতটা প্ল্যাটফর্মের সবকটা মাইক্রোফোনে মেয়েলি-স্বরে একই ঘোষণা- 'গৌহাটি' বাউন্ড ডাউন জি.এল ...

গোটা জংশনে ছোটাছুটি হুল্লোড়। খাটো ধুতি-পরা, বাজুতে নম্বর - বিল্লাওয়ালা লাল-পোশাকে অন্তত পঞ্চাশজনে পোর্টারের দৌড়াদৌড়ি। হল্লা, চেঁচামেচি,

-লেট আইলে হ রে জি-এল - উয়া! এ বুঢ়ো, তোহর বারী ফৌজী কামরা মে। ঔর পিছে... !

কে বুঢ়ো কাকে কে কী করতে বলছে-এত ভিড়ে বোঝা মুস্কিল।

প্ল্যাটফর্মের শেডের খোঁটায় খাটাউ মিল শাড়ির বিজ্ঞাপন। বাদ-বাকি সব খোটায় ঘুমন্ত মীনাকুমারীর পাশে খালি-গায়ে দাঁড়িয়ে আছে মাতাল ধর্মেন্দ্র। ফুল ঔর পত্থর।

জংশনের প্রায় সব দেয়ালে নিষেধ না মেনে রেলের ইউনিয়নের কেউ-কেউ চিপকে রেখেছে রেল শ্রমিক ধর্মঘটের অজস্র পোস্টার। এছাড়া অসংখ্য বাসি আধছেঁড়া পোস্টার গত সাধারণ-নির্বাচনের। এখনো কিছু পোষ্টার অক্ষত। ওতে সুন্দরী নয়া জেনানা প্রধানমন্ত্রীর হাসি, ইন্দিরা গান্ধি।

টিফিন আওয়ার্সে স্বল্পকালীন অবকাশ পাওয়া দুরন্ত বালকের মতো, যে যার যেদিকে মন ছুটে যায় তিনটে স্টিম ইঞ্জিন হুসহুস বাষ্পের শব্দও কান বিদীর্ণ হুইসলসহ।

রেলের হুইসল দূর থেকেই শুনতে ভালো লাগে, সামনে ভীষণ কর্কশ ও বিরক্তিকর। ইঞ্জিনেরা এসব পাত্তা দেয় না। চেঁচায় কেবল।

অল্পদূরে বি জি ষ্টেশনে গম্ভীর কুলীন উঁচু ক্লাশে পড়ুয়া যুবকের মতো, সিয়াটল ডিজেল ইঞ্জিনের একটানা গুমোর-ঘিরিং , ঘিরিং। আর সময় হলেই মেপেজোখে শঙ্খ বাজায়-পোঁ-ও-ও। যেন দুপুরবেলা প্ল্যাটফর্মের বিস্তৃত চত্বরে সন্ধে হচ্ছে - সুতরাং শঙ্খ -ধ্বনি তোলে চল্লিশ হাজার অশ্বশক্তির খয়েরি ছুটন্ত দানব।

এখনও বাজায়। চটে গিয়ে ক্ষিপ্ত ছোট এক ষ্টিম ইঞ্জিন নিজের ফুসফুসের জোর শুনিয়ে দিলো প্রাণপণে-হু-ই-ই-ই।

যাত্রীরা কানে আঙুল দেয়। আর এভাবেই সরগরম থাকে বিশাল রেলইয়ার্ড।

মিটার গেজে ডি এল ডব্লও-র ডিজেল ইঞ্জিন টেনে আনে লম্বা ট্রেন। কয়েকটা বগি নীল।

এমনি এক ফার্স্টক্লাশ বগি থেকে নামে একজন, রঘু।

বেতের মতো তীক্ষ্ণ শরীর। বলিস্ট হাত-পা। একবিন্দু মেদ নেই শরীরে। কোঁকড়াচুল কালো চকচকে। গায়ের রঙ কফির রসের মতো। দু-চোখে অবসন্নতা ও অস্পষ্ট ক্লান্তি।

গায়ে আকাশিরঙ সিল্কের ফুল স্লিভ ইংলিশ শার্ট। কোমরে ফ্রন্ট প্লেট ছাড়া প্রায় স্কিনটাইট গ্যাবার্ডিন ট্রাউজার। পায়ে র‍্যাঞ্চ-শ্যু। বাঁ হাতে চৌকো শাদা ঘড়ি। ডানহাতে স্টিলের বালা।

বুকের শার্টে দুটো বোতাম খোলা। ভেতরে গেঞ্জি নেই।

প্ল্যাটফর্মে নেমে চারদিকে তাকায়। নিজেই নামায় বেডিং, স্যুটকেস, বড়ো হ্যাভার স্যাক। মাঝারি সাইজের লেদার স্ট্যাচেল ও জলের আর্মি বট্‌ল।

একজন কুলি এল ওর কাছে। বলল,

-সামান উঠাউঁ ক্যা?

চোখে সানগ্লাস পরে নেয় রঘু। গলা ও কপালের ঘাম মুছে নেয় রুমালে। বলল,

-উঠাও।

কুলি প্রশ্ন করে।

-কৌনসা টিরেন (ট্রেন) পাকড়্‌না হৈ সাহিব?

কুলির দিকে না তাকিয়ে রঘু পরখ করে নেয় জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মের ব্যস্ততা।

নিজের ঘড়ি মেলায় প্ল্যাটফর্মের ঘড়ি দেখে। মিলেনা। চৌকো হাতঘড়ির মিনিটের কাঁটা মিনিট দশেক এগিয়ে আছে। যাক। এভাবেই এগিয়ে যাক। মিলিয়ে কাজ নেই। আবার ফাস্ট হয়ে যাবে।

১৩৮ নং কুলি বলল,

-কৌনসা টিরেন? ফাস্‌কিলাস ওয়েটিংরুম মে ক্যা?

গমগমস্বরে বলল রঘু,

-নেহি। বাহর চলো। অটোরিকশা লেনা হৈ।

কুলি বলল,

-কাঁহা যাইয়ে গা?

রঘু সরাসরি দেখল কুলিকে। অল্প শক্ত হল চোয়াল নাক, থুতনি। বলল আরো কঠিন ও ভরাট গলায়,

-তুম্‌হে মতলব?

কুলির তটস্থ জবাব,

-কুছ নেহি সাহিব।

-মাল উঠাও। বাহর চলো।

-জি সাহিব।

পাঁচনম্বর প্ল্যাটফর্মের রেল পাট্‌রি (লাইন) ফাঁকা করে জি এল চলে গেল। মিনিট পনেরোর বিরতি এখানে। এখন দূরে চার নম্বর ওভারব্রিজের তলায় ট্রেন। এক কিলোমিটার দূরে।

রঘু হাঁটছে মূল ওভার ব্রিজে। সামনে কুলি। হাতে লেদার স্ট্যাচেল।

সিগারেট ধরায়। তাকায় বাঁদিকে। এই জনপদ পরিচিত নয় রঘুর। এর আগে আসা-যাওয়ার পথে কয়েকবার ছুঁয়ে গেছে এই জংশন। এবার প্রথম আসা। হয়তো থাকতে হবে বেশ কিছুদিন। কয়েকটা বছরও হতে পারে। এখনো ঠিক নেই। কোনোকিছুরই ঠিক থাকেনা। কতোদিন কোথায় থাকা হবে কিচ্ছু বলা যায় না। কোনোদিন বলা যায়নি।

বাঁদিকে দূরে মঙ্গলবাজারের স্কাই লাইন। উঁচু-উঁচু অনেক দালান, হাভেলি। রকমারি নানান হোর্ডিং। বিখ্যাত এক টুথপেস্টের হোর্ডিং এখান থেকেও দেখা যায় স্পষ্ট।

কোথায় যেন, ঠিক বোঝা যায় না, দু-একটা মাইক সরব। কোনোখানেই স্পষ্ট বোঝার উপায় নেই। এক মাইকে বাজে, মা মুঝে আপনি আঁচল মে ছুপা লে।

মায়ের আঁচল ফালাফালা করে অন্য মাইক বাজে-'হম তো তেরে আশিক হৈঁ সাদিয়ো পুরানি...

ট্রেনের শব্দ, মানুষের কলরব, মোষের ডাক, গাড়ির হর্ন, সাইকেলের বেল-কোলাহলের উচ্চ ডেসিবলে বাইরে স্টেশন চত্বরের পাশে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ায় রঘু।

কুলি মাল তুলে দেয় অটোরিকশায়। আর পি এফ ও 'পুছতাছ' (এনকোয়ারী) অফিস ডানদিকে। বাঁয়ে সিনিয়ার ইনস্টিট্যুটের দালান, মাঠ, জিমনাসিয়াম, আরো দূরে রেলের ডিভিশন্যাল অফিস।

চত্বরের চারিদিকে, অনেক উচুঁতে দারাসিং, ধর্মেন্দ্র, দেবানন্দ, রাজকাপুর, রাজেন্দ্রকুমার, প্রদীপ কুমার ও ববিতা, আশা পারেখ কতোজন যে স্থির লটকানো। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। মীনাকুমারী ওয়াহিদার চোখে সেই প্যাটেন্ট অশ্রুবিন্দু।

অজস্র হোর্ডিং এখানে। শহরের লোক সিনেমা খুব দেখে বোঝা যায়।

অটোরিকশায় উঠতেই ড্রাইভার বলল,

-কাঁহা যাইয়ে গা ?

- মিরচাই বাড়ি।

ড্রাইভার বলল,

-মিরচাইবাড়ি বহুৎ বড়া মুহল্লা (এলাকা)। কৌন সা জগহ ?

-ইমারজেন্সি কলোনি কে বাদ, যো হোস্টেল হৈ।

-দোঠো হোস্টেল হৈ। কৌনসা ?

-রিজেন্ট এরিয়া মে। ডিফেন্সওয়ালা।

-বহুৎ আচ্ছা।

ড্রাইভার মিটার নামায়। কুলিকে আগেই দুটো টাকা দিয়েছে। টাকা নিয়ে চলে গেছে কোনও কথা না বলে।

হ্যান্ড্স্টার্টারে হ্যাঁচকা টান দিল ড্রাইভার। অটোরিকশা গর্জায়। গিয়ারে পড়তেই এগোয় সামনে। থার্ডগিয়ারে পড়ে জলের স্রোতের মতো ছোটে প্রসারিত কালো পিচ-রাস্তায়।

সামনে মোড়। ট্রাফিক আইল্যান্ড। বাঁদিক থেকে শুরু হয়েছে ঝকঝকে ফ্লাইওভার। ডানদিকে পূর্নিয়া যোগবানি নেপাল রোড। সামনে মণিহারিঘাট রোড।

ট্রাফিক সিগন্যালের নির্দেশ মেনে রিকশা এগোয় সামনে।

আবার সূচনা হলো নতুন আরো এক জীবনের-যেখানে আনকোরা অজানা জনপদ।

নতুন মাটিতে, ভিন্ন আকাশের তলায় বয়ে আনা চারা আবার প্রোথিত করতে হবে এবার।

যে চারার মূলে পুরাতন মাটি এখনো লেগে আছে। এই মাটি মিশে যাবে নতুন মাটির সাথে এখানে।

জীবন কি চলমান উদ্ভিদ? উড়ন্ত সময়ের ডানায় বারবার দূরান্তে উড়ে যাওয়া বৃক্ষমূল?

জানালায় ঝিলিক। দোতলায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে রঘু যাচ্ছে একমনে। মঙ্গলবাজার যাবে।

দুবার শিস দিল ঝিলিক, তারপর দুহাত উপরে তুলে শরীর মুচড়ে মুচড়ে শুরু করে দিল ফিল্মি গান-আজ কি রাত, এক ঐসি রাত। হমকো নিঁদ নেহি আতি

রঘু সব শোনে। মনে মনে গর্জায়-ঝাপড় খাবি রে লৌন্ডিয়া।

লৌন্ডিয়া আবার শিস দেয়। ডাকে ফিসফিসিয়ে,

- এই, তাড়ি পিনেওয়ালা! তাকাও না।

একপলক দেখেই রঘু চোখ নামায়। ঝিলিক বাঁ হাত তুলে ইশারা করে। অর্থাৎ - থামো। আমিও যাব তোমার সাথে।

রঘু আরো জোরে হাঁটে। প্রায় আড়াইমাস হলো এখানে। গত একমাস থেকে মেয়েটা একনাগাড়ে ফাজলামো করে সুযোগ পেলেই। রঘুর গরম মাথা আরো গরম হয়।

সেদিন রঘু যাচ্ছে ভাঙ্গড়টোলি। মাঠের মাঝামাঝি যেই এসেছে কুড়িফুট দূরত্বে স্বয়ং আজ কি রাত/ঐসি রাত'-ঝিলিক।

ওকে দেখেই কিছুটা এগিয়ে আবার পেছনে তাকায় রঘু।

ঝিলিক পরেছে আকাশি সালোয়ার কামিজ। শাদা দোপাট্টা মাথায় ঘোমটার মতো জড়ানো। রোদ, তাই।

আরো কিছুটা এগিয়ে ফিরে তাকালো রঘু। বলল,
- তুই এদিকে কেন রে শূর্পনখা
শূর্পনখা বলল,
-কোনদিকে?
-এখানে? মাঠে?
সতেরো বছরের শূর্পণখার স্পস্ট প্রশ্ন,
-মাঠ কি তোমার?
কথার জবাব না দিয়ে আবার এগোয় রঘু। তারপর বলল,
-ফিরে যা। কেন আসছিস দুপুরবেলা?
ঝিলিক ঝকঝকে কথা বলে। বলল,
-যেখানে খুশি যাব। তোমার কী?
-আমার পেছনে কেন আসছিস?
-তুমি আমার আগে-আগে কেন যাচ্ছো?
রঘু তেতে যায়। বলল,
-কেন আসিস এরকম?
ঝিলিক আহলাদ করে গলার স্বরে। বলল
-মজা লাগে!
-তোর মাথা। ভাগ!
- হেই গালাগাল দেবে না। পথ কি তোমার?
রঘু বলল,
-পথটা কি তোর?
ঝিলিক যেন সমঝোতা করে। বলল,
-কারো নয়। সেজন্যেই তো দুজনে যাব। মজা হবে।
-মুন্ডু হবে।
-হোক। তবু -যাবো।
রঘু বলল,
-আমি কাজে যাচ্ছি।
-আমারো কাজ আছে।
-তোর কী কাজ?
-কতো কাজ। নিউ কলোনি যেতেই হবে এখন।
-তবে যা, একা।
দাঁড়িয়ে থাকে রঘু। ওরা আমবাগানের প্রথম গাছটার তলায়। এখানে ছায়া। মুখের

ঘাম দোপাট্টায় মুছে ঝিলিক বলল,

-কোন আজেবাজে কাজে যাচ্ছ তুমি?

-কি!

-আমি জানি, তুমি কেন যাচ্ছ।

-কেন?

-তাড়ি খাবে চামারটেলিতে, তাই না?

-এই দুপুরে তাড়ি? আমার মাথা খারাপ? তুই ফিরে যা। জায়গা ভালো নয়।

ঝিলিক বলল,

-কেন? ভূত বেরুবে?

-যারা বেরুবে, ছিঁড়ে খাবে তোকে।

-কুছ পরোয়া নেহি ইয়ার। কসরত করো তো ভীষণ জোর তোমার শরীরে। শিস দেবে। চামারটোলি থেকে দৌড়ে আসবে তোমার দোস্ত লাঠি নিয়ে। তারপর দুজনে মিলে পেটাবে ওদের। ফিল্মের মতো। সবশেষ হলে তোমার দোস্ত চলে যাবে। তারপর শুরু হবে আসলি চীজ।

-কি?

-গাছের ফাঁকে দৌড়ে-দৌড়ে গান গাইব দুজনে লভ্‌সঙ।

বলেই জোরে হাসে ঝিলিক।

উত্ত্যক্ত রঘু বলল,

-তোর মাথাটা গেছে।

-জানি।.সেজন্যেই তোমার পেছনে আসি।

-আমার পেছনে?

-ইয়েস বস। আমার মাথা ঠিক করে দেবে?

মাথায় বড়ো র্দদ। দবাকে দোগে মেরা শির?

রঘু বলল,

-তোর মাথা কেটে কূয়োয় ফেলে দেব, বেহায়া মেয়ে!

-এই গালি দেবে না একদম। খামচে ছুলে ফেলব তোমার ঘমন্ডি (অহংকারী) মুখ।

দুহাত তুলে ঝিলিক দেখায়। ভিন্ডির মতো সুডৌল ফর্সা আঙুলের নেল পালিশরঞ্জিত বড়ো-বড়ো নখ।

রঘু বলল,

-রাক্ষসনি।

ঝিলিক বলে,

-নোচ্ লুঙ্গি তুম্‌হে (আঁচড়াব তোমাকে)

রঘু বিরক্ত। নিজের মনে বলল,

-ইরিটেটিং এলিমেন্ট!

রঘু এগোয় আমবাগানের ছায়ায় পথ ধরে। পেছনে ঝিলিক। বলল,

- কী কী? ইংলিশে কী গালি দিলে? ইরি, কী যেন?

বাকিটা উচ্চারণ করতে পারে না। বলল,

-বহুৎ দব্‌দবা অংরেজি মে তুমহারা! আমায় শূর্পনখা বলে দ্যাখো! এই, এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেছ কখনো, না দেখবে? অন্ধা কঁহিকা! সুন্দর অসুন্দর বোঝে না।

কোনো কথা না বলে রঘু হাঁটে।

এবার দুজনে তফাৎ তেমন নেই। দু-চারফুট বেশি হলে। ঝিলিকের শরীরের নরম সুঘ্রাণ পায় রঘু।

হঠাৎ দৌড়ে রঘুকে অতিক্রম করে ঝিলিক এগিয়ে গেল অন্তত দশ কদম আগে। একটু হেঁটেই অহঙ্কারী হরিণীর মতো ঘুরে দাঁড়াল। বলল,

-এ ঘমন্ডী

রঘু জবাব দেয় না। ঝিলিক আবার বলল, আমার সাথে জোরজবরদস্তি করছ কেন? চেঁচাই জোরসে? সুনসান বাগানে একলা পেয়ে খুব সুরৎ বেসাহারা লড়কিকে ছেড়ছাড় করছে কালো ভূত। ডাকি সবাইকে? টের পাবে।

রঘু তিক্ত। বলল,

-মাইক্রোফোন এনে দিই? বোরিং এলিমেন্ট। কোত্থেকে জুটেছে এই আপদ!

এবার ঝিলিকের মিছরিমাখা ডাক,

-রঘুজি, তুম্‌হারা ইস আদা সে মরতি হুঁ মৈঁ।

রঘু বলল,

-বস্তাপচা সব হিন্দি ফিল্‌ম্ তোর মগজে ভাইরাসের মতো খামচে ধরেছে। তুই মরবি।

বলেই উল্টোদিকে হাঁটে রঘু। ঝিলিক একদৌড়ে ফিরে আসে ওর পাশে। রঘুর ডানহাতের কব্জি সজোরে চেপে ধরে। বলল,

-আচ্ছা চলো। আর মজাক করব না। চলো, একসাথে যাই।

-কোথায়?

-বনবাস।

-তোর মাথা।

অজস্র গাছের ছায়ায় ভরদুপুরে পথ হাঁটে দুজনে। একসময় ঝিলিক বলল,

-শোনো।

-কী?

-আমিও খাব তোমার সাথে।

-কী খাবি?

কোনো জড়তা নেই ঝিলিকের গলায়। বলল অতি সহজ,

-তাড়ি। দুজনে খাব। কেমন?

-থাপ্পড় খাবি তুই।

-খাব। তোমার হাতে সব খাব।

অতি সহজ ও কেজো কয়েকটা শব্দ। তবে বলার সময় আপাত গভীরস্বরে ঝিলিক বুঝিয়ে দিল। ওর উদ্দমতার আড়ালে ছদ্মবেশী ধীর কিম্বা অধীর, ঘনীভূত ভিন্ন মর্মার্থ এবং অন্য একজন আছে।

রঘু বুঝল না। বুঝতে চাইল না। কারণ পাত্তা দিল না। বলল সজোরে,

-তুই যা। বিরক্ত করিসনা। আমার মাথার ঠিক নেই।

এবার ভীষণ শান্তকণ্ঠে বলল ঝিলিক,

-কেন তোমার মাথা ঠিক থাকে না রঘুদা? এখন হিন্দি ফিল্মের উল্টো করছি তো।

রঘু বলল,

-কী উল্টো?

-কোথাও দেখেছ এর আগে?

-কী দেখব?

-একটা সুন্দর মেয়ে একটা ছেলের পেছনে ঘুরছে?

-কেন ঘুরছিস, আমি বলেছি?

-বলনি। সে জন্যই তো মুস্কিল।

-মানে?

একটু থেমে ঝিলিক বলল,

-কিছু বলো না, তাকাও না, বলেই বেশি ঘুরছি গো।

রঘু বলল,

-আমি কী করলে আর ঘুরবি না বল?

-বলব?

-হুঁ।

কি যেন চিন্তা করলো ঝিলিক, তারপর স্মিত হেসে বলল,

-আজ না। অন্যদিন বলব।

রঘু বিপন্ন। বলল,

-তার মানে যতদিন বলবি না, ততদিন পেছনে ঘুরবি?

ঝিলিকের সাফ জবাব,

-ইয়েস। শুধু তাই নয়। যতদিন আমার কথা মানবে ততোদিন ছায়ার মতো ঘুরব তোমার পেছনে। ঠিক আছে

রঘু ক্ষিপ্ত। বলল জোরে,

-হার্ড নাট! স্টাবোর্ন ক্র্যাজি গার্ল! ওফ!

কী আর করা! আমবাগানের নিবিড় ঘন ছায়ার তলে বহুদিনের পায়ের চিহ্নে অঙ্কিত আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে বেশরম (রঘুর মতে) ঝিলিক হাঁটছে ঘমন্ডিকে (ঝিলিকের মতে) অনুসরণ করে। মুখে কথার স্রোত আছেই। কখনো হাল্কা চটুল, কখনো ভাসা ভাসা ভারী। যেমন এ মুহূর্তে বলল ঝিলিক, রঘুদা!

কি?

-রামায়ণ!

-কী?

-অজ্ঞাতবাস!

-কী বলছিস তোর মাথা?

ঝিলিক বলল ঝিলিকের মতো,

-সীতাকে ধমকাও কেন? রামসীতা বনের পথে চলেছে। যদি ভয় পায়? আফটার অল মেয়ে তো।

রঘু বলল,

-তাড়ি না খেয়েও তোর নেশা হয়েছে।

ঝিলিক বলল,

-হয়েছে জব্বর নেশা। বনবাসের, অজ্ঞাতবাসের নেশা।

-ভাগ তুই।

ঝিলিকের জেদ, বলল,

-ভাগব না। যাব।

- তবে যা।

-যাচ্ছি তো।

অল্প একটু সময় চুপ থেকে ঝিলিক বলল,

-কিন্তু মুস্কিল!

-কী মুস্কিল? তোর কাছে তো সবই সোজা।

-এটা সোজা নয় রঘুদা।

-কী সোজা নয়?

-কমতি রয়ে গেল যে।

-কী কমতি তোর?

-পেছনে কেউ নেই।

-পেছনে আবার কে থাকবে?

ঝিলিক হাসে, তবে ফাজলামো নয় পুরোপুরি।

বরঞ্চ মোহময়তা স্বরে। বলল,

-তোমার ছোটো ভাই।

-আমার ছোটোভাই? আমার কোনো ভাই নেই।

-থাকবে। থাকতে হবে একজন।

-কে একজন?

-লক্ষ্মণ।

-লক্ষ্মণ!

-হ্যাঁ।

-লক্ষ্মণ থাকে ও টি কলোনি। ও পেছনে আসবে কেন?

-ধূরো। ঐ লালমুলোর কথা কে বলছে? অন্য লক্ষ্মণ।

-আর কোনো লক্ষ্মণ আছে তোর চেনাজানা?

-আছে। তুমিও চেনো।

-আমিও?

ঝিলিক বলল,

-হ্যাঁ রঘুপতি। তিনজনে সম্পূর্ণ রামায়ণ এই আমবাগানে।

আলাপে প্রলাপে একসময় বনবাসের সংক্ষিপ্ত পথ ফুরিয়ে গেল। সামনেই চামার টোলি। টোলির প্রথমঘর পেরিয়ে যায় রঘু। পেছনে নিজে নিজে সেজে যাওয়া লক্ষ্মণ-বিহীন সীতা।

ভাঙ্গাড়ুর ঘর একেবারে দক্ষিণে শুকনো তালাও (পুকুর) এর পাশে। ও আজ নেই টোলিতে। ফরবেসগঞ্জ গেছে কী এক কাজে রঘুকে বলে গেছে।

এলাকার অন্যরা চেনে দুজনকে ওদের মনোভাব, রঘু নিজেদের লোক। কিন্তু ডক্টরসাহিবের (ডাক্তার সাহেবের) ছোটাবেটি এখানে কেন আজ? রঘুভাইয়ার ইয়ারি আছে বোধহয়।

ঝিলিক এই প্রথম এল এমন টোলিতে। অথচ রোজই দেখে তিনতলার ছাদ থেকে দূরে। ওখান থেকে আর কতোটুকু দেখা যায়।

পরপর অনেকগুলো ঘর। মাটির দেয়াল, পোড়ামাটির খাপ্‌রা (দেশজ টাইলস্ পোড়া মাটির)। চাল দেখলে রঘুর মনে হয়-মাটির বড়ো-বড়ো অসংখ্য গ্লাস আধখানা করে পরপর সাজানো।

প্রচণ্ড ঝড়ে উড়ে যায় কোনো কোনো সময় অনেক খাপরা। একহাত মোটা মাটির

দেয়াল। কেবলমাত্র একটা জানালা, একটা দরোজা প্রতিটি ঘরে। দিনের বেলাও ভিতর অন্ধকার।

টেলিতে কয়েকটা কুঁইয়া (কূয়ো)। ইমালির পেড় (গাছ), ইতস্তত ছড়ানো আমগাছ, কিছু জামুন গাছও আছে। তাল খেজুরের গাছ অনেক। গাছের গলায় লটকানো ঘড়া। চুঁইয়ে পড়ছে রস। এই রস-ই এখানকার উপার্জনের প্রধান উৎস, সঙ্গে, শুয়োরও শুয়োরের শাবক।

ঝিলিক দেখছে চারদিক। তেমন নোংরা তো কোথাও নেই-যেমন সবাই বলে। বরঞ্চ অনেক পরিষ্কার, পারিপাটি। রোদে শুকোতেদেয়া পিতল অ্যালুমিনিয়ামের ঝকঝকে বর্তন।

কয়েকটা শান্ত শুয়োর ঘুরছে এধার ওধার। বড়োসড়ো গুবগুবা একটা দেখামাত্র এগিয়ে এলো দ্রুত ওদের দিকে। ঝিলিককে শুঁকল।

'উমাগো' বলে ঝিলিক দুহাতে জাপটে ধরে রঘুকে। রঘু বলল,

-ছাড়, কিচ্ছু হবেনা।

শঙ্কিত গলায় ঝিলিক বলল,

-এমন করছে কেন?

রঘু আশ্বস্ত করল ঝিলিককে

-তোকে দেখছে, চান করেছিস কিনা।

-কী!

ঝিলিকের ঝিলমিলানি এখন স্তিমিত। শরীর ঘেঁষে ভীষণ চেহারার বরাহ কৌতুহলী। ঝিলিককে ওর খুব ভালো লেগেছে-বোঝা যায়।

রঘু শুয়োরকে বলল,

-দারা এ দারা, দূর হট্ ভাই। লৌন্ডিয়া ডরতি হৈ।

অতি পরিচিত, প্রায় আপনজন রঘুর কথা বুঝল দারা। মুখ তুলে একবার তাকাল ঝিলিকের দিকে। নাক নাড়াচাড়া করল। দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি। ঝিলিক বলল,

-এমন করছে কেন? কামড় দেবে না তো!

রঘু বলল,

- না না। তোকে মোটেই কামড়াবে না। ওর মাথা খারাপ নয়।

যদি কামড় দেয়?

রঘু সমাধান দিল,

-তুই ও কামড়ে দিস।

-এই, ফাজলামো না। সরাও এটাকে।

ঝিলিক তখনো খামচে ধরে রেখেছে রঘুর কাঁধ।

দারা বলল,

-ভয় পাচ্ছো কেন নটখাটিয়া (চপল)? তুমি রঘুভাইয়ার ইয়ার তো?

দারার সস্নেহ প্রশ্নের একবর্ণ বুঝল না ঝিলিক। বরাহ গন্ধ শুঁকল আবার। ঝিলিক চোখ বুঁজেছে ভয়ে। বলতে সাহস পাচ্ছে না-ভাগ, ভাগ। যদি কামড়ে দেয়।

সীতা যে রামকে ধরে রেখেছে, সে রামের তেমন কোনো আগ্রহ নেই সীতা উদ্ধারের কারণ দারা তো রাবণ নয়।

দারার মাথায় হাত বুলোয় রঘু।

আরাম।

দারা বলল,

-তোমার দোস্ত তো নেই। এ-কদিন আসেনি কেন? মেয়েটা কে গো? বহুৎ খুবসুরৎ আছে। তবে বড়ো ডরপোক (ভীতু) ভয় পাচ্ছে, না ঘেন্না করছে? আমি শুয়োর, তাই?

-নারে দারা। ঘেন্না নয়। এতো কাছ থেকে কোনোদিন দেখেনি বোধহয় এর আগে। ও তোমার বোনের মতো। আর আমার দোস্ত ফোস্ত নয়। এমনি ঘোরে আমার পেছনে।

-এমনি ঘোরে না। নিশ্চয় কোনো প্রয়োজন আছে ওর।

রঘু বলল,

-জানি না, আমি জানি না এখন যাও। আর ভয় দেখিয়ো না ওকে।

-কোথায় ভয় দেখালাম! আদর করলাম সুন্দর মেয়েটাকে।

-অনেক আদর হয়েছে। এবার যাও।

মানবও জন্তুর নিশ্চুপ বার্তালাপের কিছুই শুনল না ঝিলিক। সুতরাং বুঝল না।

দারা চলে গেলে তালাও-র দিকে, চলে যেতেই ঝিলিক বলল,

-ও তোমার বন্ধু?

-শুধু আমার নয়। ভাঙ্গাড়ুর প্রাণের বন্ধু।

আমরা তিনজন।

-ছিঃ শুয়োর আবার বন্ধু!

রঘু বলল,

-কেন? বন্ধু হতে পারেনা? আজ থেকে তোর সাথে [illegible] হয়ে গেল।

ঝিলিক অবাক। বলল,

-সম্পর্ক আমার সাথে? কী সম্পর্ক?

-ও তোর ভাই হয়ে গেলো। রাখী বাঁধবি ওর [illegible]।

ঝিলিক গর্জায়,

-কী!

রঘু তাতায়,

-ওর রং দেখেছিস? কেমন লালচে শাদা। যে কোনো মেয়ের ওর মতো রং হলে

অহঙ্কারের সীমা থাকত না। তুই অবশ্য ফর্সা আছিস খুব। তবু ওর মতো লালচে নোস্।

-কী! কী বলছে দ্যাখো! ছিঃ!

রঘু বলল,

-দারা রেডিশ হোয়াইট। তুই তো পাকা গমের মতো।

ঝিলিক চেঁচায়,

-ঐ শুয়োরটা আমার চেয়ে সুন্দর! ওমা!

তালাও-র পাশে দাঁড়ানো দারার ভাবনা হয়, কী হল দুটোতে তাই জিজ্ঞেস করে,

-কী হল তোমাদের?

রঘু বলল,

-কিচ্ছু না। তুই যা।

দারার গ্যাঁতগোঁতে ঘাবড়ে গেল ঝিলিক। আস্তে বলল,

-তুমি যাচ্ছেতাই কথা বল। আমার এই মূল্য তোমার কাছে?

রঘু একটু সান্ত্বনা দেয়,

-চেহারায় তোদের দুজনের অনেক ডিফারেন্স আছে তা মানছি। ওর চেহারা ওর মতো, তোর ফেসকাটিং তোর মতো। ঠিক আছে?

ঝিলিক বলল,

-কিয়া মতলব?

-কোনো মতলব নেই। এখন চল।

নিজের মনেই বলে ঝিলিক:

-কী অসভ্য দেখেছ! আমাকে শুয়োরের চেয়ে বিশ্রী বলছে! নিজের চেহারা কখনো দেখেছে আয়নায়? কোডারমার কয়লাখনিতে জন্মেছে। কালো ভূত? ঠোঁট, দাঁত, গলার স্বর আর চোখ ছাড়া কী আছে তোমার ফাজিল ছেলে!

-কী গুজর ফুজুর করছিস বন্দরনি?

-ঝিলিকের এই মূল্য তোমার কাছে? আমার গায়ের রং শুয়োরের চেয়ে খারাপ? কী বাজে বাজে কথা বলে গুণ্ডা কোথাকার!

রঘু শান্ত করে,

-ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুই সবচে সুন্দরী। সাধনা, ববিতা, রাজশ্রী, সায়রা. আশা, ওয়াহিদা, সোফিয়া, জিনা লোলোব্রিজিদা, এরা তোর কাছে বাঁদি। হল তো? এবার যা যেখানে খুশি।

ঝিলিক কিছুটা শঙ্কিত। বলল,

-কোথায় যাব একা-একা এই দুপুরে? বাড়ি অনেকদূর। মাঝখানে বিরাট আমবাগান!

রঘু বলল,

-জাহান্নমে যা।

ঝিলিক অন্য আহ্লাদ ধরল,

-যাব না এখন। খাওয়া তো হল না,

- কী খাবি?

ঝিলিকের নিপাট জবাব,

-তাড়ি।

রঘু বলল,

-ওফ! মেরা শির খায়েগি তু!

একটা চকচকে আটান্নির (পঞ্চাশ পয়সোর মুদ্রার প্রচলিত নাম) মূল্যে ছোটো একঘড়া তাড়িনিল রঘু। বলল,

-হা কর বেকুফ লড়কি।

-কী?

-মুখ খোল। তাড়ি খাবি না?

-এগুলো তাড়ি?

- না না, চরণামৃত! খোল মুখ।

- খাব?

- খা।

ঝিলিক ওর গোলাপি পাতলা ঠোঁঠ দুটো মেলে ধরতেই ধবধবে শাদা দুপাটি দাঁতের ফাঁকে তৈরি হল স্বল্প পরিসর। ভেতরে হাল্কা গোলাপি জিহ্বা। যে জিহ্বা কতো যে প্রলাপ বকে অবিরাম। ঐ পরিসরেও জিহ্বায় রঘু ঢেলে দিল তাড়ি। ঝিলিকের মুখ পরিপূর্ণ হয়ে উপচায় পানীয়। ঠোঁট, থুতনি গলা বেয়ে গড়ায় বুকে। সালোয়ার কামিজের কাপড় ভেজে। ভেজা কাপড়ের অন্তরালে ফুটে ওঠে শুভ্র অর্ন্তবাস ও উড্ডীন জোড়া মাংসপিণ্ডের সুগড়ন।

ঝিলিক মুখ কুঁচকে সবটুকু গিলে ফেলল। বলল,

-কষা! ছিঃ! এসব তুমি খাও। হেঃ!

-আরো খাবিরে ছোরি?

-নাঃ।

-শখ শেষ? আরো খা না বন্দরনি।

-না, আর না, এত বাজে!

হঠাৎ খেয়াল হয় ঝিলিকের, উপচানো পানীয়ে বুক ভিজে উন্মীলিত হয়েছে ভীষণ শরীরী আভাস।

এস্তে উচ্ছল উদ্দাম ঝর্ণার মতো ঝিলিক, লাজুক নিরিবিলি দিঘি হয়ে যায়। মাথায় ঘোমটার মতো জড়ানো বয়েলের দোপাট্টা খুলে ভেজাবুক ঢাকে, আর তখনই এক সলাজ,

সুশীল অপার রহস্যপূর্ণ নারীর গরিমা পেয়ে যায় রঘুর বর্ণিত বন্দরনি। যাকে কখনো 'থার্ডক্লাশ মেয়ে' বলে দেয় মাথা গরম হলে।

ঝিলিক সন্তর্পনে সব আচ্ছাদিত করে। একবার তাকায় রঘুর দিকে। রঘুও ঝিলিককে দেখে নেয় কয়েক পলক।

অবিন্যস্ত এক ঝলক বিপন্ন হাসি ফোটে ঝিলিকের ভীষণ সুশ্রী মুখে কিছুটা কুণ্ঠায়, বাকিটা লজ্জায়।

আর এই কুণ্ঠাও লজ্জার সমন্বয় ঝিলিকেরই নিজস্ব অভূষণ হয়ে যায়।

রঘু দৃষ্টি ফেরায় অন্যদিকে, মুখ হা করে ঢকঢক ঢালে পানীয় গলায়। ঝিলিকের বহুবর্ণ রেশ তখনো আচ্ছন্ন রেখেছে মগজ। রঘু পানীয় গেলে অবিরাম। হাল্কা বাতাস বয়। ভেতরের চিরসমাহিত রঘু শাসন করে বাইরের উদ্বেল রঘুকে। যে উদ্বেলতা সাময়িক। সাময়িক অস্থিরতা ভুল ঘটায়। অবশ্য ঝিলিকের অপাপবিদ্ধ সারল্য বাইরের রঘুকে লক্ষ্মণরেখা পেরুতে দেয়না। রঘু নিজেকে বশে রাখে আর পানীয় ঢালে গলায়। শান্ত বাতাস বয়।

রঘু পানীয় গিলে। ক্ষীণকণ্ঠে ঝিলিক বলল, কেন খাও এসব, বাজে গন্ধ! তেতো-তেতো স্বাদ। আর খেওনা কোনোদিন।

ঝিলিকের এখন ভিন্নমাত্রা। বলল বেশ জোরেই,

-ফেলে দাও বলছি।

রঘুর অবাক লাগে। এতো জোর খাটায় কেন মেয়েটা? কিসের প্রয়োজনে এই জোর?

কী মনে হয় রঘুর হঠাৎ। একবার তাকায় ঝিলিকের দিকে।

ঝিলিকের ভিন্ন চোখে, ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন বাক্য। কিছুই অনুবাদ করে না রঘু। স্পৃহাও হয় না। তবু, দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মাটির ভাণ্ড।

ভঙ্গুর তৈজস খানখান হয়। মাটিতে গড়ায় স্বল্প নেশার পানীয়।

ঝিলিক বলল,

-একদম খাবে না এসব। চলো এখন।

রঘু বলল,

-তুই তোর যা। আমার অন্যপথ। আমি খাব। তোর কীরে?

-ঠিক আছে, আমার কিচ্ছু না। হল তো? এখন চলো।

-কোথায়? তুই তোর পথে যা।

-আমি যাব তোমার সাথে। নিউ কলোনিতে কাজ আছে। বেদীজির বাসায় যাবো মুন্নির কাছে।

রঘু বলল,

-তোর ইচ্ছে। আমি জোরে হাঁটব। তোর মতো নতুন কনের চালে হাঁটতে পারব না।

-আমিও জোরে হাঁটতে পারি।
-আগে হাঁটিসনি কেন?
-ইচ্ছে করেই হাঁটিনি।
কী?
ঝিলিক আবার চমকায়,
-মজা লাগে।
-তোর সবকিছুতেই মজা। দারা যখন শুঁকছিল তখন মজা লেগেছে?
-আবার শুয়োর?
-এই শুয়োর বলবি না। ও দারা। মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। সুন্দরও বেশি।
ঝিলিক বলল,
-তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি তা বুঝলাম। তা বলে সুন্দর?
-হ্যাঁ, সুন্দর। তোর চেয়েও বেশি।
ঝিলিক এবার চেঁচাল না। উৎপাত করল না। বলল,
-শুধু ঘমন্ডি নও, সরফিরা আছ তুমি। দারা মজাদার বন্ধু পেয়েছে।
-ফুসফাস কী বলছিস রে?
প্রায় নীরব স্বরে ঝিলিক বলল,
-এক হাঁদারামকে বুঝিয়ে নিজের মাথা নষ্ট করছি।
তারপর জোরে বলল,
-জিজ্ঞেস করলে না, কী মজা?
রঘু বলল,
-কিসের মজা?
-এই যে, পেছনে আস্তে-আস্তে হাঁটি?
-কেন হাঁটিস তুই জানিস। আমার জানার কাজ নেই।
-আছে। শোনো না।
রঘু শুনতে চায় না ঝিলিক বলতে চায়।
অল্প হাসে। কিছুসময় কোনো কথা বলেনা।
রঘু তাড়া দেয়,
-বললি না?
তেমনি স্মিত হেসে ঝিলিক বলল,
-আমি পেছন পেছনেই যাব।
-আমার পিছনে? কেন?
-নিয়ম।

-কী নিয়ম?

-নিয়ম। এর বেশি জানিনা। জানতে চাই না।

একটু থেমে রঘু বলল,

-জানিস, আমি কে?

-জানি।

-কী জানিস?

ঝিলিকের শব্দে বাক্যে একই শব্দরূপ বলল অকপটে,

-বহুৎ প্যারা কালা কয়লা।

রঘু হাঁটে। বেশ দূরে, পেছনে পড়ে আছে আমবন, চামার টোলি। এ পথে গাছ আছে এদিক ওদিক, আমগাছ একটাও নেই। ঘাস অল্প। বালু-বালু জমিন, অভ্রর দানা। দূরে অন্য এক পাকা সড়ক গেছে এক দেহাতের দিকে। হিন্দি ছবির শুটিং হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে। রাজকাপুর ওয়াহিদা রহমান বয়েল গাড়িতে ওরা দুজন।

এ এলাকার একজন বিখ্যাত লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুর কাহিনি নিয়ে ছবি বানানো হয়েছিল। পরে ঐ ছবি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণকমল পায়। রঘুর মনে আছে ছবিতে খুব ভালোভালো গান ছিল মুকেশের। যেমন গানটা রঘু প্রায়ই গুণগুণ করে-'সজন রে ঝুটমত বোলো খুদাকে পাস জানা হৈ, না হাতি হৈ , না ঘোড়া হৈ/ ওঁহা পয়দল হী জানা হৈ...।

রঘু জানে, বিশুদ্ধ উত্তর বিহারী ফোক্‌সঙের সুর মেশানো আছে ঐ গানে। উত্তরবিহারে ফোক সঙের ছড়াছড়ি। রঘুর অভিরুচি অদ্ভুত। হল্যান্ড টিউন যেমন প্রিয়, আবার বিভিন্ন অঞ্চলের ফোকটিউনে খুব আগ্রহ। ক্ল্যাসিকাল তেমন বোঝে না। গান ভালো লাগে। কোনটা কোন রাগ-এসবের কোনো জ্ঞান নেই।

এখনো হাঁটতে হাঁটতে বেশ জোরে জোরে গুনগুন করছিল একই গান-'সজনরে, ঝুট মত বোলো'।

কয়েক লাইন গাওয়ার পর নরম চেটোর স্পর্শ পায় পিঠে। ঝিলিকের হাত। কখন যে কয়েক ফুট দূরত্ব অতিক্রম করে একেবারে পেছনে চলে এসেছে রঘু খেয়াল করেনি।

ঝিলিকের শরীরী গন্ধ পায় রঘু। এমন সুঘ্রাণ পেত আরো একজনের শরীরে। কোনো কৃত্রিম প্রসাধণীর সুগন্ধ নয়। এ অন্য ঘ্রাণ। মাথা ঝিমঝিম করে কয়েকপলক।

রঘু চুপ। ঝিলিক বলল,

-কী সুন্দর গাও তুমি। গাও না।

-ধুর! হাঁটো তাড়াতাড়ি।

-না না গাও। এত ভালো গলা।

ঝিলিক থমকে দাঁড়ায়। বলল,

-ফাজলামো না। সত্যি বলছি।

-কী?
-গান শিখলে অনেকের ভাত মারবে।
-যাবি তো চল। নাহলে ভাগ।
ঝিলিক বলল,
-চলো। এতো কড়ুয়া, তিখা কেন? মধু খেয়ো সকাল বিকাল।
হাঁটতে হাঁটতে রঘু বলল,
-তুই সুন্দর গাস।
-তুমি শোনো?
-শুনি। আজে-বাজে গান কেন করিস হ্যাংলির মতো?
-কোন গান গাইব তুমি বলো।
কোনো গান খুঁজে পায় না রঘু। বলল,
-ভালো গান, খুঁজে নিস। ফিল্মেও ভালো গান থাকে।
-খুঁজব, তুমি দেখো। আমিও জানি অনেক ভালো-ভালো গান থাকে সিনেমায়।
রঘু বলল,
-জানিস ঝিলিক?
-কী?
-সিনেমার গান যারা লেখেন এরা সব বিখ্যাত লিরিসিস্ট ।
-লিরিসিস্ট কী?
-যারা গান লেখে।
- যেমন?
-আছে অনেকে। তাছাড়া
ঝিলিকের গম্ভীর উৎসুকতা। বলল,
-কী তারপর ?
-মিউজিশিয়ান আছেন অনেক। ভীষণ ট্যালেন্টড্।
ঝিলিক বলল,
-তুমি সিনেমা দেখ?
-দেখি।
-আমাকে দেখাবে একদিন?
-না।
-কেন না?
-আমার সাথে কেন দেখবি?
-তোমার পেছনে হাঁটতে পারি। পাশে বসে সিনেমা দেখলে কী দোষ?

-সেদিন বললি, তোর পিসিমার সাথে ভক্তিমূলক সিনেমা ছাড়া আর কিচ্ছু দেখিস না?

ঝিলিক হাসে। বলল,

-আরে ইয়ার। ইয়েসব রংবাজি থা।

অল্প দূরে খাল দেখা যায়। খাল পেরিয়ে কিছুটা এগোলেই নিউ কলোনির সীমানা। ওরা হাঁটছে। একসময় রঘু ডাকল,

-এই শোন!

-না, শুনব না।

-কেন?

-আমারো একটা নাম আছে। তোমার জানা নেই?

একটু সময় রঘু কিচ্ছু বলল না।

তারপর ডাকল,

-ঝিলিক।

ঝিলিক জবাব দিল,

- হুঁ।

-দুপুরবেলা বনবাদাড়ে ঘুরছিস। তোর বাড়ির কেউ খোঁজ করবে না?

-না।

-কেন?

ঝিলিক জবাব দিল,

-কী একটা অষুধ খেতে হয়, সুতরাং মা ঘুমোচ্ছেন অষুধের দয়ায়। বাবা চেম্বারে। দাদা ফরাক্কা। দিদি কলেজে, সাড়ে চারটের আগে ফিরবেনা। পিসিমা মহাভৃঙ্গরাজ ব্রহ্মতালুতে মেখে বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে নিজের বিছানায় লাশ। বাকি রইলো দুজন কাজের লোক। ওদের কড়্কে দিই- হেই, বেরোচ্ছি দরকারি কাজে। যদি কিছু বলিস গলাটিপে মেরে ফেলবো।

রঘু বলল,

-ওরা কিচ্ছু বলে না?

ঝিলিকের অহং তুঙ্গে। বলল,

-আমার ভয়ে দুজনে বিল্লির মতো মিঁউমিঁউ করে।

রঘু আবার বলল,

-দাদা আছিস।

ঝিলিক সমঝদারের মতো শুধরে দিল,

-দাদা নারে। দাদি আছি। জেন্ডার বোঝ না।

রঘু বলল,

-তবু ধর, দিদি ফিরে এল। মা উঠলেন। পিসিমার ঘুম ভাঙল। তুই নেই তখন। বিকেলে বাড়ি ফিরে গেলি। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, কোথায় ছিলিরে করমঞ্জুলি এতক্ষণ? তখন কি বলবি?

ঝিলিকের প্রবল উৎসাহ রঘুর প্রশ্নে।

বলল জোরে,

-বলব?

-বল।

-বলি?

-আরে ধুর! বল তাড়াতাড়ি।

ঝিলিক বলল কেটে-কেটে,

-ও আমাকে জোর করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ফুসলিয়ে। আমি যেতে চাইনি।

-কে নিয়ে গেল?

ঝিলিক রঘুর চোখে নিজের চোখ রেখে বলল,

-তুমি।

রঘু পাত্তা দিল না। বলল,

-মিথ্যে কেন আমাকে দোষের ভাগী করছিস?

ঝিলিকের স্থির জবাব,

-আমার অনেককিছুর ভাগীদার হতে হবে তোমাকে।

এবারো হাল ছেড়ে দিল রঘু। হাড়ে হাড়ে টের পেলো—এই উচ্ছল ঝর্ণার সাথে কথার পিঠে কথা বলতে হলে আরো অনেক কথা আগে শিখতে হবে। ওর একমাত্র অষুধ-কান-পটরিতে টেনে ঝাপড়। যা মারা যাবে না। কারণ ও মেয়ে। সুন্দর ছিটেল, চঞ্চল, কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা মেয়ে। যাকে মুখে যতোই তুছতাছ করা যাক ওর শরীরে প্রহারের স্পর্শ কোনোমতেই দেয়া যায় না। রঘু ভেতরে ভেতরে অসহায়, হার মানে।

বাকপটিয়সী ঝিলিক আবার ডাকে,

-রঘুদা।

-কী?

-এতো ধমকাও কেন? আচ্ছা থাক। শোনো।

-কী?

-ভবিষ্যতে কী করবে তুমি?

-কী করব?

-চাকরি করবে না?

-চাকরি?

-হ্যাঁ, চাকরি কোরো না। ব্যবসা করো।

-ব্যবসা? কিসের ব্যবসা?

ঝিলিক বলল,

-কয়লার।

-কয়লার!

-হ্যাঁগো। পাহাড়ের মতো কয়লা থাকবে তোমার ডিপোতে। মাহাতোজির ডিপো দেখনি? একটু থেমে ঝিলিক বলল,

-ভালো না কয়লার ব্যবসা?

রঘু বুঝলো ঝিলিক কী করছে। তবু বলল,

-কী ভালো দেখলি কয়লার ব্যবসায়?

ঝিলিকের সাফ জবাব,

-পাহাড়ের মতো কয়লার স্তূপের মাঝখানে ভূতের চেহারায় তুমি বসে আছ। যদি খালি গায়ে বসে থাকো, দেখাই যাবে না কোথায় আছো তুমি। যখন হাসবে, ঝকঝকে দাঁত দেখে মনে হবে ওখানে কী আছে রে!

কথা শেষ করেই এলোপাথাড়ি দৌড় দেয় ঝিলিক। বেশ তফাতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। রঘুর দিকে তাকায়। বলে,

-জানো না ব্যবসাটা? কে ব্যবসা করে তাকে চোখে দেখাই যায় না।

দুটো হাত সামনে জড়াজড়ি করে লতারমতো হিলহিলে শরীর দুদিকে দোলায়। দুষ্টুমি হাসি হাসে।

মনে মনে রঘুও হাসে। ভাবে, কম ফাজিল না। মুখে বলল,

-আয়। চল তাড়াতাড়ি।

ওখান থেকেই জোরে বলে ঝিলিক,

-মারবে না বলো।

-মারব না। তুই ঠিক বলেছিস। কয়লা আর আমি এক। প্রচণ্ড চাপ ও তাপে আমিও কয়লা জন্মাই ঠিক বলেছিস ঝিলিক।

বাক্যের অন্তঃসলিলা অর্থের প্রবাহ বুঝতে পারল না ঝিলিক। এতটুকুই বুঝলো—রাগ নয়, রঘু হঠাৎ অন্যকারণে গম্ভীর হয়ে গেছে।

বলল স্তিমিতস্বরে,

-আমি তোমায় দুঃখ দিয়েছি রঘুদা? ক্ষমা করো।

রঘু বলল,

-ইট ইজ ওকে।

-আমায় মাফ করো রঘুদা। রাগ করলে?

-রাগ না। বিরক্তি হয়।

-কেন?

-জানিনা।

এবার ঝিলিকের পালা। অভিমানে প্রায় বিস্ফোরিত হলো ঝিলিক। বলল,

-আমি তো থার্ডক্লাস্ বন্দরনি!

-তা নয় ঝিলিক।

-কেন এমন বলি জানো?

-কী করে জানব?

-কোনোকিছু শুনতে চাইলে তবে না জানবে, বুঝবে।

ওরা হাঁটে অবিরাম। ঝিলিক ডাকে,

-শোনো।

-বল।

-তখন আমার এতো সুন্দর রঙের চেয়ে দারার রং ভালো বললে কেন? তাই কয়লা কয়লা বলে বদলা নিলাম।

-ঠিক আছে, ঠিক আছে। চল।

-আমার স্কিন দেখেছ। ভেজাপাকা নিম্বুর মতো। ছুঁয়ে দেখবে? কাউকে ছুঁতে দিই না। তুমি ছোঁও। ছোঁও না একবার।

রঘুর সামনে নিজের হাত প্রসারিত করে ঝিলিক। রঘু স্পর্শ করে না। বলল,

-না। চল তাড়াতাড়ি।

ঝিলিক বলল,

-বড়ো অহঙ্কার তোমার।

রঘু বিরক্ত বলল,

-ভালো। এখন চল। আমাকে ওয়েস্ট কলোনি যেতে হবে।

-কি আছে ওখানে?

-তোর মুন্ডু আছে। চল চুপচাপ।

ঝিলিক হাসে। রঘুর পিঠে আবার হাত রাখে। রঘু বলল,

-হাত সরা।

ঝিলিকের চপল জেদ। বলল,

-না।

ঝিলিকের হাত রঘুর পিঠে। রঘু তাড়া দেয়,

-তাড়াতাড়ি চল। তোকে নিউ কলোনি পৌঁছে দিয়ে আমাকে যেতে হবে অনেকদূর।

ঝিলিক বলল

-বললে না কী ওখানে?

রঘু উত্ত্যক্তস্বরে জবাব দেয়,

-তোর মুন্ডু। হাঁট।

কলরব ছাড়া ঝর্ণার জল, পাখি, দামাল বাতাসকে মানায় না। ঝিলিকও তাই। কথা বলে একনাগাড়ে। রঘু জবাব দেয় কোনো কথার, আবার দেয় না।

খাল এসে গেল প্রায়। বহতা জলের শব্দ শোনা যায় এখান থেকে। অনেক পিছনে সান্যালদের আর ঝিলিকদের বাড়ি অস্পষ্ট বিন্দুবৎ। দূরে আমবাগানের আড়ালে চামারটোলির মাথায় নীল ধোঁয়া। গাড়ির বাতিল টায়ার কিম্বা গাছের শেকড়ের গোড়ায় আগুন দিয়েছে হয়তো কেউ।

ঝিলিক এখন আলতো ধরে রেখেছে রঘুর উর্দ্ধবাহু। একসময় বলল ঝিলিক,

-লবকুশ।

রঘু বলল,

-কী বললি?

-লক্ষ্মণ নেই। লবকুশও নেই। হনুমান চলে গেছে ফরবেসগঞ্জ।

-কী?

ঝিলিক বলল,

-বেচারা রামসীতা একা পড়ে গেছে। চলো, দেখি, এখানে সুগ্রীব-টুগ্রীব পাওয়া যায় কিনা।

রঘু বিরক্ত হয় আবার। বলল,

-ছাড় আমার হাত।

-ছাড়ব না।

-ছাড়।

আরো জোরে বাঁ হাতে রঘুর বাহু ধরে রাখে জেদি ঝিলিক। বলল,

-ছাড়ব না। ক্ষমতা হলে ছাড়াও।

-থাপ্পড় মারব।

মার খালুঙ্গি। ফিরভি নেহি ছোড়ুঙ্গি

ছাড়বি না

-না। জিন্দেগিভর নেহী ছোড়ুঙ্গি। তুমি কয়লা বেচবে। আর আমি দুপুরে তোমার রোটি ঔর তড়কা নিয়ে আসবো কয়লার ডিপোয়।

রঘু ব্যঙ্গ করে,

-অন্তত একহাজার সিনেমায় এমন দৃশ্য দেখিয়েছে।

ঝিলিক বলল,

-দেখায়নি। খেতের দৃশ্য দেখায়। গেঁহু ইয়া মকাই খেত। আমাদের তো কয়লার ডিপো।

রঘু মৃদু ধমক দেয়,

-তোকে একদিন রাঁচি পাঠাবেন তোর বাবা।

-ওখানে কী রঘুবাবু?

-পাগলা গারদ।

ঝিলিক নিশ্চিন্ত হয়ে বলল,

-তুমিও যাবে ওখানে।

-আমি কেন?

-দুজনে যাব। একসাথে থাকব। পাগলামো করবো. রঘু এক ঝটকায় ঝিলিকের হাত ছাড়িয়ে দেয় দৌড়। তারপর সোজা লং জাম্প। অবলীলায় পেরিয়ে গেলো প্রশস্ত খাল।

খালের পারে থমকে দাঁড়াল ঝিলিক। এখানে বেশ চৌড়া। ও পারবেনা। যতোই ডানপিটে হোক, এ দূরত্ব লাফিয়ে পেরুনো সম্ভব নয়। খাল বেশ গভীর। তলায় কলকল জলের ধারা।

দুইপারে দুইজন। ঝিলিক একবার দেখছে খালের বিস্তৃতি ও গভীরতা, একবার অন্যপারের রঘুকে। বলল জোরে,

-রঘুদা, আমি?

রঘু বলল,

-জাম্প কর।

-পারব না গো!

-চেস্টা কর।

-ধুর! পারব না বলছি।

-ঠিক আছে। পারবি না তো ফিরে যা।

-কী!

-গো ব্যাক।

পেছনে ফিরে ঝিলিক দেখে নিল একবার। তারপর বলল সরোষে,

-তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?

-কেন?

-ভরদুপুরে সুনসান মাঠ বন পেরিয়ে একলা মেয়ে একা কীভাবে ফিরবে রে কালোভূত?

-এলি কেন?

ঝিলিকের কপটতাহীন জবাবী প্রশ্ন,

-কী করে জানব, মাঝপথে অসহায় সীতাকে ছেড়ে চলে যাবে বেরহেম রাম?

বেরহেম রাম বলল,

-আমি রাম নই, তুই সীতা নোস্। যা, ভাগ।

-এই!

-কী?

-ধমকাও কেন? পারব না ফিরে যেতে একা-একা। এই রাবণ, খাল পার করে দে। একা ফেলে যাবি না বলছি।

রূপান্তরিত রাবণ বলল,

-তবে লাফ দে বন্দরনি।

-পারব না। এতো চৌড়া!

-কী পারবি তুই?

-কিচ্ছু পারব না। আমায় পার করো তুমি।

-যদি না করি কী করবি তুই?

-তুমি বলো।

রঘু বলল,

-আমি জানি না।

-জানতেই হবে।

-আমার জানার দরকার নেই।

ঝিলিকের সরল ও সাবলীল কণ্ঠ। বলল,

-সীতাকে এভাবে অসহায় ফেলে রাম যেতেন কখনো?

-এই মেয়ে, কতবার বলব?

-কী কতবার?

-আমরা রামসীতা নই।

-তা নই এখনো। তবু।

- কী তবু?

একটু চিন্তা করে প্রকৃতই অসহায় উচ্ছল তরুণী বলল,

-তুমি রঘু, আমি ঝিলিক। এই কি যথেষ্ট নয়? আমায় ফেলে যাবে না, আমি জানি। এক কাজ করো।

-কী?

-তুমি ফিরে এসো আবার। দুজনে ফিরে যাই। বনবাস শেষ।

-ঝাপড় খাবি। আমার কাজ আছে বললাম যে।

ঝিলিক বলল,

-আমারো আছে। তবু চলো। আজ ফিরে চলো।

-না।

-ঠিক আছে। একরোখা ভূত। আমায় পার করো।

কী আর করা। ঝিলিকের চোখে কখনো রাম, কখনো রাবণ এ পারে; আর ঐপারে রঘুর বন্দরনি দুপারে দুজনে খোঁজে আরো সংকীর্ন কোনো পরিসর, যা ডিঙোতে পারবে ঝিলিক। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল মোটামুটি।

প্রস্তুতি নিল ঝিলিক। রঘু বলল, দূর থেকে দৌড় লাগা।

ঝিলিক পেসবোলারের মতো বেশ দূর থেকে দৌড় শুরু করে। খালের পারে পৌঁছেই অগোছালো লাফ দেয়। নিচের জলস্রোত ডিঙ্গিয়ে অতিক্রম করে খালের বিস্তৃতি। তবু পড়ে যায় খাল পেরুনোর একটু আগে থকথকে কাদায়। গড়িয়ে না পড়লেও গেঁথে যায় নরম মাটিতে।

রঘু দুহাতে জোরে টেনে ধরে ঝিলিকের দুটো হাত। বেশ জোরে টানতেই প্রায় আছড়ে পড়ে ঝিলিক রঘুর বুকে।

এতটা সময় হাঁটা, দৌড়োনো, ত্রাস, আরো অনেককিছুর অভিঘাতে ঝিলিকের বুক কাঁপে থরথর রঘুর বুক লেপ্টে– ঝিলিকের বুকে অজস্র ডানা ছটফটে পাখিরদল, আর রঘুর বুক জুড়ে দুরন্ত ঘোড়ার তীব্র অশ্বশক্তি।

এবার রঘু আরো স্পষ্ট ঘ্রাণ পায় মেয়েলি শরীরের। মগজের অলিগলি, দেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, ধমনী, শিরা উপশিরায় দাবানল ছুটে যায় এই দেহজ ঘ্রাণের। এ কেবল ঘ্রাণ নয়, বিশেষ এক ইন্দ্রিয়কে তছনছ করে দেয়া দৈহিক তরঙ্গ– যে তরঙ্গের আবর্তনীতে সতেরোর সুশ্রী উদ্দামতা– ঝিলিক। রঘুকে অনুশাসনে বাঁধে ভিতরের নির্লিপ্ত কঠিন রঘু। বহিরঙ্গ অনুশাসিত হয়।

বাইরের রঘু ছেড়ে দেয় ঝিলিকের আবেদনজনিত আবেষ্টনী। ঝিলিক-ও নিজেকে বড়ো কষ্টে তুলে আনে রঘুর বুকের দপদপানি থেকে। এই প্রথমবার ঝিলিক বুঝে নেয় কাঙ্খিত পুরুষবক্ষে কী আছে, কী নেই।

রঘু বলল,

-কাদা লেগেছে তোর স্যান্ডেলে। সালোয়ারের তলায়-ও লেগেছে। আয়। ঐ টিউবওয়েলে সব ধুয়ে নিবি।

রঘুকে ছেড়ে দিয়েছিল ঝিলিক। তখনো কাঁপছে, মৃদু। ভীষণ শান্ত, মিহিন কুয়াশার মতো ম্রিয়মান অথচ গভীর স্বরে বলল ঝিলিক,

-চলো।

-টিউবওয়েলে জল ওঠে। রঘু কল টেপে। ঝিলিক পা ধোয়। কাপড়ও। স্যান্ডেলসহ বাঁ পা কাদায় পুরো মাখামাখি। ঝিলিক সুবিধা করতে পারে না।

রঘু বলল,

-তুই কল পাম্প কর। আমি ধুয়ে দিচ্ছি।

ঝিলিকের দ্বিধা। বলল,

-আমার পা চটি তুমি ধুয়ে দেবে? কী বলছ?

-কিচ্ছু হবে না, দে। দেরি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ধুতে হবে।

ঝিলিক জল তোলে। রঘু ধুয়ে দেয় ঝিলিকের চটি, সালোয়ারের ফ্রিল, আর ধবধবে সুচারু পা। বলল,

-আরো একটু জোরে লাফালে পেরিয়ে যেতিস। বেশ ভালো জাম্পার তুই।

ঝিলিক কথা শোনে। হাসে না বলে না কিছুই। রঘু যখন পা ধুয়ে দেয়, শিরশির করে ওর শরীর। চোখ বোঁজে আবেশে, মুখ একটু লাল হয়। বাঁহাতে বেশ জোরে চেপে ধরে রঘুর চুল। শরীর ও অন্যকিছুর ভারসাম্য সামলায়।

একসময় সব ধোয়া হয়ে যায়।

ঝিলিকের পরিচর্যা শেষ করে রঘু উঠে দাঁড়ায়। ধুয়ে নেয় নিজের হাত।

ঝিলিক বলে,

-তোমার পা আমি ধুয়ে দেব এবার।

-কেন?

-দেব।

-আমার পায়ে কাদা নেই।

ঝিলিক বলল,

-বালু তো আছে। পা দাও তোমার।

প্রায় জোর করে রঘুর পায়ে জল দেয় ঝিলিক।

এবার রঘু জল তোলে। ঝিলিক আনমনে ধুয়ে দেয় রঘুর পা।

ঝিলিক তাকায় উপরের দিকে। রঘুকে দেখে। দুজনে চোখাচোখি কথা বলে নিঃশব্দে।

একসময় ঝিলিক বলল,

-আমার কাঁধে হাত রাখো।

-কেন?

-রাখো না।

রঘু রাখে। ঝিলিক বলে,

-যাক, বাঁচলাম।

-কী বাঁচলি?

-পাপ হতো আমার।

-কী পাপ!

-তুমি আমার পা ধুয়ে দিলে যে।

-তাতে কী?

-হয়। পাপ হয়। এবার আমি ধুয়ে দিলাম তো। কাটাকুটি হয়ে গেল। তাই না?

ঝিলিক আবার তাকায় রঘুর দিকে।

মুখে হাসি। এ হাসিতে অন্য একেবারে আলাদা কেউ, যাকে তেমন দেখা যায় না সব সময়। রঘুও দেখেনি।

ধোয়ামোছা সব শেষ করে ওরা দাঁড়াল লেনের মাথায়। রঘু বলল,

-এবার যা

ঝিলিক বলল,

-কোথায়?

-কোথায় মানে!

- কোথায় যাব আমি?

-কেন? নিউ কলোনি? মুন্নির বাসায়?

আবার একই নমুনা ঝিলিকের। দুহাত সামনে জড়ো করে টান টান। দুদিকে মৃদু শরীর দোলায়। কয়েকটা চুল পড়েছে বাঁ চোখে। ডান চোখ খোলা।

ঝিলিকের মুখে ঝিলিকের মতো ফাজিল হাসি। বলল,

-মুন্নি কে?

-মুন্নি তোর বন্ধু বললি যে!

-ওর বাসা কী নিউ কলোনি?

রঘু বলল,

-আমি জানি না।

ঝিলিকের চটপট জবাব,

-আমিও জানি না।

রঘু অবাক। বলল,

-আর বেদীজি?

ঝিলিকের কপট বিস্ময়। বলল,

-উনি কে? তোমার পরিচিত? কোথায় থাকেন?

রঘু রেগে যায়। বলল,

-কী!

ঝিলিক তেমন পাত্তা দেয় না। বলল,

-কী আবার?

-তুই যে বললি মুন্নির কাছে যাবি?

ঝিলিকের স্পষ্ট জবাব,

-আরে ইয়ার, বেদী-ফেদি, মুন্নি-টুন্নি কাউকে চিনি না। এ নামে কেউ আছে কি নেই, জানি না। থাকলে থাকতে পারে। আমার কী?

এমন এক তাচ্ছিল্য ঝিলিকের চোখে মুখে, বাক্যে, দেখে ভীষণ রেগে গেল রঘু। বলল,

-কেন এলি তবে রে বদমাশ মেয়ে?

-কই এলাম!

-মানে!

-আমি তো আসিনি।

-কে এসেছে? তোর প্রেতাত্মা?

-তুমি নিয়ে এসেছ আমাকে।

-আমি!

-ইয়েস বস্।

রঘুর মাথা গরম হয় খুব। কিন্তু কী করবে। কার উপর রাগ চরিতার্থ করবে বুঝতে পারে না। সামনেই সতেরোর অবাধ্য এক বিশৃঙ্খল।

রঘু বলল,

-ফিরে যা তুই।

-এঃ! বললেই হলো।

-মার খাবি

-যা যা, কিনা দাদাগিরি রে!

-চুল ছিঁড়ব তোর।

ঝিলিক বলল,

-ছিঁড়তে দেব না। শুঁকতে পারো। শ্যাম্পুর গন্ধ পাবে।

-তোর চামড়া খুলে নেব।

ঝিলিক চ্যালেঞ্জ ছুঁয়ে দেয়,

-দেখি ক্ষমতা।

রঘু এগোয় আক্রোশে ঝিলিকের দিকে। মুখে যতো বকবক করুক, ঝিলিক এক-পা এক পা পেছনে হাঁটে। বলে অনুনয়ে,

-কী করে যাই বলো? একা একা অসম্ভব সুন্দরী একটা মেয়ের এতদূর ওপথে যাওয়া কি সম্ভব, না উচিত? তুমি ছাড়া পেরুতে পারব কি ঐ খাল, মাঠ, আমবন? তুমি-ই বলো।

যেন বিরাট এক সমস্যা আকাশ ফুঁড়ে টপকে পড়েছে ঝিলিকের অনিচ্ছায়। সমাধান

সে নিজেই দিল। বলল,

-ফিরে যাই চলো দুজনে।

-আমার কাজ আছেরে পেত্নি।

-ঘণ্টার কাজ।

-কী ?

-সব জানি। ওয়েস্টকলোনির গুদামের পাশে জুলিয়াদের কোয়ার্টারের পেছনে মাঠের শেষ মাথায় ট্রেনলাইনের পাশে তোমার আড্ডা যতো বাজে লোকের সাথে।

রঘু অবাক। বলল,

-তুই জানিস ?

-হুঁ।

-কী করে জানলি ?

-জুলিয়া বলেছে। তোমাকে দেখেছে কয়েকবার ওদের সাথে গুদামের চত্বরে।

-আমি তো দেখিনি।

-জুলিয়াদের জানালা থেকে সব দেখা যায়।

-জুলিয়া কে ?

-দেখার ইচ্ছে হয়েছে? নো চান্স জুলিয়া ইজ বুক্ড্। রঘুর আবার মাথা চড়ে । বলল,

-কেটে তোকে কোশিতে ফেলে দেবে ভ্যাম্প কোথাকার ?

ঝিলিক বলল,

-এই, ভ্যাম্প শব্দের অর্থ কী ? কোনো গালাগাল ?

-না।

-তো কী ?

রঘু বিদ্রুপ করে,

-আদর।

ঝিলিক মজা পায়। দুহাত উপরে তুলে জোরে চেঁচায়,

-ওঃ ইয়াহ !

-এই চোপ।

ঝিলিক কথা মানে না। দুহাতে তালি বাজায়। বলে,

-ওহো ফাইন ! একটু করো না, প্লিজ !

রঘু এগোয় সামনে। ঝিলিক যথারীতি পেছনে। বলল

-কোথায় ? ঐ গুদামে যাব আমরা ?

-জাহান্নমে যাচ্ছি।

ঝিলিক তাকায়,

-আমাকে নিয়ে?

-হুঁ।

ঝিলিক নিশ্চিন্ত। বলল,

-খুব ভালো জায়গা। দুজনে থাকব। ওখানে স্বর্গ বানাব। লবকুশের জন্ম হবে।

-তোর দাঁত ভাঙবো, অসভ্য মেয়ে।

-এতো বকো কেন বলো তো? মুখে তো এক ফোঁটা হাসি নেই। দেখে মনে হয়, চ্যুইংগাম না, উচ্ছে চিবোচ্ছে। একেই তো রেল ইঞ্জিনের চেহারা। ছিঃ!

বিধ্বস্ত রঘু বলল,

-তাড়াতাড়ি আয় পেত্নি। তোর মুন্ডু ভাঙবো।

-এই লোক শোনছে। গালাগাল না।

রিকশা নিল রঘু। ঝিলিক লাফ দিয়ে উঠল। সিটে বসেই ডাকল ত্রাসে,

-কাম অন, কাম-অন। তাড়াতাড়ি এসো। রিকশায় ঘুরবো। সঙ্গে কোডারমার কয়লা। মজা হবে!

তারপর রিকশাওয়ালাকে বলল,

-ভাইয়া চলো জলদি।

রিকশাওয়ালার প্রশ্ন,

-কাঁহা?

ঝিলিক বলে সোজাসুজি,

-বহুৎ দূর। ভাগ রহেঁ হ্যাঁয় হম দোনো।

রঘু জোরে ধমকায়,

-ঝিলিক!

ঝিলিক বলে,

-চোপ! এসো তাড়াতাড়ি পালাই। এ ভাইয়া, চলো জলদি।

গন্তব্য না জেনেই সুন্দরী মেয়ের পলায়নে প্রবল উৎসাহী ও সাহায্যকারী রিকশাওয়ালা জোরে চালায়।

রঘু বলল,

-কাঁহা যাতে হো?

-ভাগনা হ্যাঁয় আপদোনো কে।

-কাঁহা?

-মালুম নেহি।

-রিকশা ওয়াপস লে চল।

-কাঁহা?

-মিরচাইবাড়ি।

-বহুৎ আচ্ছা। দশ রুপিয়া দেনা। পৌঁছা দুঙ্গা।

এক টাকার ভাড়ায় দশ টাকা চায় মহা উদ্যমী চালক। বলল,

-কিসিসে কুছ নেহি বোলুঙ্গা, গঙ্গাজি কি কসম!

রঘু রাগ, বিরক্তি, বিপন্নতার চরমসীমা অতিক্রম করে এখন থেঁতলে গেছে। বলল আস্তে-আস্তে।

-অবে বেকুফ, ধিমা চালা ।

-জী নেহি।

-কিয়া জি নেহি!

-ভাগনা হ্যাঁয়।

-অবে, রুক রুক জলদি

ধমক খেয়ে রিকশা থামায়। মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে,

-কিয়া হুয়া? ভাগ্‌না নেহি হে ক্যা?

নিজে নিজে রূপান্তরিত সীতা রঘুর পেত্নি কিম্বা ভ্যাম্প, চালককে তাড়া দিল,

-ভাগনা হ্যাঁয়, ভাগনা হ্যাঁয়!

রঘু চিমটে ধরলো ঝিলিকের ফর্সা গাল। বলল,

-টেনে চামড়া তুলে নেব সসুরি!

ঝিলিক বলল,

-আহা! ছাড়ো। লাগছে! লোক দেখছে তো।

রিকশা চালক উপদেশ দিল,

-ছোড় দেও বাবুজি। অভিসে ইতনা ঝগড়া-লড়াই করেঙ্গে তো বাকি জিন্দগি কিয়া করেঙ্গে?

রঘু বেসামাল। মগজে বারুদ। জোরে চেঁচাল,

-চোপ্‌বে উল্লুকা পাঠা।

ইমারজেন্সি কলোনি পেরিয়ে গদাই লস্করি চালে রিকশা চালাচ্ছে চালক। বয়স বড়োজোর পঁচিশ ছাব্বিশ। বেচারা চুপসে গেছে। উদ্দীপনা উদ্যম কিচ্ছু নেই। চেহারা এমন বানিয়েছে—এতো হতাশ কোনোদিন হয়নি। এখন ভাড়া পাবে একটাকা। এর চেয়ে বড়ো 'নুকসান' (ক্ষতি)-পুরা ফিল্মি দৃশ্য জ্যান্ত হতে হতে-ও হল না।

মনে মনে ভাবল—এ কেমনরে! মেয়েটা ভাগে। ছেলেটা ভাগে না। আসলে ছৌকরিটা খুব ভালো। ছোকরা বুরবক। এমন খুবসুরৎ মেয়ে সহ ভাগতে চায় না, বুদ্ধু ছাড়া আর কী?

একটা বাঁক নিয়ে রিকশা এগোয়। ঝিলিকের ঠোঁটে পাতলা হাসি। দুষ্টুমিভরা সুশ্রী মুখে শেষবিকেলের রোদ। একসময় বলল নরমস্বরে,

-ওকি ভালো, তাই না?

রঘু বলল,

-কে?

-ও।

-ভালো কেন?

-আমাদের সাহায্য করছিল।

-কী সাহায্য?

-কী আবার?

রঘু কথা বলে না। ঝিলিক রঘুর হাতে হাত রাখে। বলল,

-আমায় ওখানে নিয়ে গেলে না কেন?

-ওখানে যেতে নেই।

-কেন? কী ওখানে?

-চুপচাপ বোস। যেতে নেই ব্যস।

-ঠিক আছে, যাব না আমি। তুমি কেন যাও?

-আমি আমার যাই।

-আমি গেলে কী দোষ?

- তুই মেয়ে।

-মেয়েরা যায় না?

-না।

-কেন?

-ওফ্! থাম তুই।

একটু পরে ঝিলিক আবার বলল,

-আমি জানি, কারা ওখানে আসে।

-কারা?

-লুটেরা সব। ওয়াগন ব্রেকার। ছোরা চালায়। তমঞ্চা ফায়ার করে।

-তুই জানিস?

- জানি তো। জুলিয়া, অসিত বলেছে। তোমাকে ওদের সাথে দেখেছে সবাই।

আবার চুপ। চালক রিকশা টানে।

ঝিলিক আবার ডাকে,

-শোনো।

-হুঁ।

-একটা কথা বলি?

-আর কত কথা বলবি?

-শুধু একটা কথা খুব জরুরি।

-কী কথা আবার?

-ভালো কথা। মজাক না।

-তুই ভালো কথা জানিস?

এবার রঘুর খোঁচা ঝিলিকের মতো চপলকে বিদ্ধ করল। হাল্কা ছায়া নেমে এলো ওর ঈর্ষণীয়ভাবে সুন্দর মুখাবয়বে। শান্ত হয়ে গেল হঠাৎ। ম্লান হলো, দীর্ঘটানা টানা চোখ।

আবার কেটে গেলো ছায়ার মালিন্য। পাত্তা দিল না রঘুর হাল্কা প্রহারের। উদাম আকাশ তছনছ করা প্রগলভ অস্থির এক পাখির নাম ঝিলিক। তবু স্বরে অন্য, ভীষণ অন্য ঝিলিক। বলল প্রায় ফিসফিসিয়ে,

-তুমি খুব ভালো আমি জানি। ওখানে যেয়ো না আর প্লিজ! আমার কথা রেখো।

ঝিলিকের এ মুহূর্তে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ রঘুর ভেতরের গোপন বিন্যাস চুরমার করে দেয়। রঘু সব গোছাতে চায়। পারেনা। ঝিলিকই যেন সব গুছিয়ে দেয় আবার,

-তোমাকে চোখে-চোখে রাখি কেন জান?

রঘু অবাক। বলল,

-চোখে চোখে?

-হ্যাঁ।

-তুই আমার গার্জেন?

-না। কেউ নই। তবু রাখি। কেন জানো?

-কেন?

-জানি না।

ঝিলিকের চোখেমুখে সব ঋতু খেলা করে অবিরাম। রঘু বোঝেনা কোনটা কোন ঋতু এবং কেন? বোঝার ইচ্ছেও নেই। সব ঋতুর খবর না নিলে ও চলে রঘুর।

রিকশা কালভার্ট পেরিয়ে নেমে যায় সোজা। পাশে খোলা মাঠ। বাঁদিকে শিবমন্দির ও আমবাগান।

রিকশা যেখানে থামল খুব বেশি হলে দুশগজ দূরে ঝিলিকের বাড়ি। থামতেই ঝিলিক বলল,

-থামল কেন?

-তুই নেমে যা।

-কেন নামব?

-ঐ তো তোদের বাড়ি। চিনিস না? নাম তাড়াতাড়ি।

-তুমিও চলো।

-কোথায়?

-আমাদের বাসায়। কফি খাওয়াব।

-কফি খাই না।

- খুব ভালো বানাই।

এইসময় চালক বলল,

-এ বাবু।

-কিয়া হ্যাঁয়

-আপলোগ ভাগেঙ্গো নেহি?

-কিঁউ ভাগুঙ্গা? কাঁহা ভাগুঙ্গা?

ঝিলিক বলল,

-ভাগনা যা। ইয়েনেহি মানা। ডর গয়া সসুরা।

চালক সাহস দিল,

-ডরনা কাহেকা? মৈ ভি শোভারাণী কো ভাগাকর লায়া থা খাগারিয়া সে। এ,বাবু ডরো মত, ডটে রহো মজাসে।

ঝিলিকের আবার একই প্রলাপ,

-আমিও তাই বোঝাচ্ছি এতোক্ষণ। তুমি বোঝাও না ভাইয়া। বিস রুপিয়া দুঙ্গি তুম্হে।

রঘু কোনো কথা না বলে নামলো রাস্তায়। তারপর জোর টান দিল ঝিলিকের হাতে। ঝিলিক নামেনা। কাতরায় বলল,

-ছাড়ো। লাগছে।

-নাম আগে।

-না।

-না কেন?

-ভাগব।

এবার দুহাতে ঝিলিকের কোমর ধরে জোর করে। ঝিলিক বলে,

-ছাড়ো। গুন্ডা কাঁহিকা!

এমন দৃশ্য চালক দেখেনি এর আগে। বিলকুল উল্টো ছবি। বলল,

-কাঁহা ভেজ রহেঁ হৈঁ উনকো অকেলি? কাঁহা যায়েগি বেচারি?

রঘুর ধৈর্য্যের বাঁধ খান খান। বলল,

-চুপ কর তু। ও দেখ উস্‌কি তিনমঞ্জিলা হাভেলি। মজাক কর রহি থি ইয়ে লৌন্ডি।

চালক বলল,

-হাভেলি? কাঁহা?

-আঁখে নেহি হৈ কিয়া? সামনে ইতনি বড়ি হাভেলি নজর নেহি আতা?

-উ তিনমাঞ্জিলা কৌঠি?

-ঔর নেহি তো কিয়া?

চালক তখনো ঝিলিকের উকিল। বলল,

-কীভাবে আবার ফিরে যাবে বেচারি? মজাক কেন করবে?

-কিয়া মতলব?

-যখন ওর ঘর থেকে একবার উঠিয়ে এনেছ, ওকে রাখো নিজের কাছে বাবুজি। কোন মুখে বেচারি যাবে ওখানে?

চালক ঝিলিকের নাম জেনে নিয়েছে কথায়-কথায়। বলল,

-এ ঝিলিকরানি আর ফিরে যেওনা।

ঝিলিক বলল,

-ঠিক বলেছ ভাইয়া। যাব না আমি। কোনমুখে যাব। ওর কথায় বাড়িঘর, মা-বাপ, পিসিমাকে ছেড়ে চলে এসেছি। পিসিমা কি জানো?

চালক বলল,

-পিসিমা! উ ক্যা?

ঝিলিক বলল,

-বুঝবে না। এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই। হে ভগবান, কার সাথে ঘর ছেড়েছিলাম! কয়েকঘণ্টা আটকে রেখে ছেড়ে দিচ্ছে।

চালক বলল,

-বহুৎ দুখি হো তুম।

ঝিলিকের একই সুর,

-তুমি তো বুঝলে ভাইয়া। সে তো বোঝে না। পত্থর দিল। চালক আবার বলল,

-শোভারানি শুনলে কষ্ট পাবে।

-শোভারানি কে?

ওদের কথা কেটে অধৈর্য্য রঘু ধমকায়,

-এ, তেরে কো কুছ নেহি মালুম, কিসসে বাত করা রহা হে-তু। ইয়ে লে পয়সা ঔর আপনা রাস্তা নাপ।

তারপর ডানহাতে জোরে টানল ঝিলিককে। বলল,

-নেমে আয়। তোর হাড়গোড় ভাঙব আজ।

ঝিলিক খিলখিল হাসে। বলল,

-নামছি গো। একটু মজা করতে দাও প্লিজ।

মজা শব্দটা বুঝল চালক। বলল,

-মজাক কর রহে তো ক্যা? ভাগে নেহি?

ঝিলিক নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে।

রঘু বলল,

-দে।

-কি?

-বললি যে, ওকে কুড়ি টাকা দিবি?

-টাকা কোথায় আমার কাছে? বাড়ি গেলে দিতে পারব। কিন্তু কুড়ি টাকা কেন দেব?

-কেন দিবি না? তখন বলিসনি ওকে?

ঝিলিক বলল,

-বলেছি। কিন্তু এখন দেব না।

-কেন?

ঝিলিকের জেরা। বলল,

-পালালাম কোথায়?

দুটো টাকা দিতে চালক নিতে চাইলনা। জোর করল রঘু, তবু নিলনা। রিকশা ঘুরিয়ে ওদের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

আর আনমনে বলতে থাকল,

-ইয়ে কিয়া রে বাবা! শোভরানিকে বলতে হবে। বহুৎ মজা পাবে।

ও চলে যেতেই রঘু এই প্রথমবার অনুনয়ের স্বরে ডাকল,

-ঝিলিক।

-বলো।

-প্লিজ, এবার যা তুই।

-না,

-না কেন?

-আজ থেকে আমাকে তুমি-তুমি করে বলবে। না হলে মানায় না।

-আচ্ছা বলব। এখন যা।

-যাব না।

-কী করবি এখানে দাঁড়িয়ে?

-দাঁড়াব কেন? তোমার পেছনে আবার যাব।

-থেঁতলি!

-কি?

-কিচ্ছুনা। আবার যাবি?

-জি হ্যাঁ।

-দ্যাখ তোর খুঁজে কেউ আসতে পারে।

-আসুক।

-মারবে তোকে।

-মারুক?

-তোর বাবা যদি আসেন হঠাৎ?

-এলে ভালো হয়

-কী ভালো হয়?

-বাবাকে বলব সব।

-কী সব?

ঝিলিক বলল,

-বলব, তোমার ছোটো জামাই কেমন পাজি দ্যাখো।

-কী !

-হ্যাঁ। বলব, আমাকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে এখন বলছে আর পারবে না। বাবা গো, ছোটোমেয়ের বরকে বোঝাও। জামাইষষ্ঠীতে ভালো উপহার দেবে, তবু যদি মানে।

রঘু হাল ছেড়ে দেয়। দুর্গতি। যাকে হাতে মারা যাবে না, আর ধমকানো যাবে না, বোঝানো যাবে না-তার কাছে পরাস্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো সুগম পথই থাকেনা। রঘুর-ও নেই এখন। বলল হতাশ শ্রান্তিতে,

-দয়া করে চল।

-কাঁহা?

-জাহান্নম।

ঝিলিকের এখন প্রত্যয় বেশি। বলল,

-জাহান্নমের পথ এদিকে নয়। অন্যদিকে।

-তবে তাই চল।

-যাবে?

-তোর মুন্ডু খাবো গুন্ডি মেয়ে!

-খেও গো গুন্ডা ছেলে!

-বাড়ি চল।

-যাবে?

-আমি না। তুই যাবি।

ঝিলিকের প্রশ্ন,

-আর তুমি?

-হোস্টেল যাব। কাউকে পাব না এখন। চলে গেছে বোধ হয়।

ঝিলিকের উল্লাস। বলল,

-ভেরি গুড! অব আয়া ট্রেন পর্ট্রিমে!

ঝা-স্যার বললেন,

-আয়, ভেতরে আয়।

সদর দরোজায় থমকে দাঁড়িয়েছে রঘু।

এ বাড়িতে কোনোদিন আসেনি এর আগে। আজ স্যার নিয়ে এলেন জোর করে। বলেছেন,

-চল আমার গরিবখানা দেখে আসবি। ওঁকে তোর কথা বলেছি।

-কাকে স্যার?

স্যার বললেন,

-তোর চাচিজিকে।

-কৌন চাচিজ?

-হিমানী ঝা। চিনবিনা। আগে চল। আলাপ - টালাপ হবে। তোর কথা বলেছি। তোকে দেখতে চান।

রঘু ভেবে পায় না, ওর সম্বন্ধে

কী এমন বলার আছে? ক্লাস ফাকি দেয়া, ক্লাসে বসলেও কোনোকিছুতে মনোযোগ নেই, চামার-টোলিতে তাড়ি খাওয়া ওর সম্পর্কে এমনকি গল্প করলেন হিমানীর কাছে? এ মহিলা কে?

জিজ্ঞেস করেছে,

-স্যার।

-ইয়েস?

-হু ইজ শি?

-কার কথা বলছিস তুই?

-হিমানী ঝা কৌন?

-তেরা চাচিজি।

-আমার চাচিজি! ওখানে আমার তো কেউ নেই!

স্যার হেসেছেন। মোটর বাইকের পেছনে বসা রঘুকে বলেছেন,

-দর্শন তো করে নে। বড়ো কঠিন মেজাজ ওঁর। কিন্তু অন্দরমে পিঘলতা বরফ।

রঘু ভাবল-দেখা যাক।

আঙ্গ্‌নায় (প্রাঙ্গণ) পা রাখতেই সুরেলা, মিহিন অথচ খর-স্বরে পিঘলতা বরফ রৌরকেল্লার ইস্পাত। কঠিন হলেন। বললেন,

-চপ্পল বাইরে রেখে আসবে দুজনে।

তারপর রঘুর দিকে তাকিয়ে বললেন,

-তুম উনকা বিদ্যার্থী হো?

-জি।

-আগে কোথাও শেখনি নোংরা চপ্পল পরে ভিতরে আসা উচিত নয়?

-জি!

-সোজা কুয়োতলায় যাও। দ্বারিকা জল তুলে দেবে।

হাত পা মুখ ভালো করে ধুয়ে তবেই বারান্দায় উঠবে, কেমন?

স্যার অল্প অল্প হাসছেন। রঘু লক্ষ করছে বুঝতে পারছে না,-হাসছেন কেন?

প্যান্টের তলা গুটিয়ে স্যার পা ধুয়েছেন।

রঘু তাই করলো।

স্যারের বর্ণিত বেতালা বরফ ভেতরে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এলেন।

বললেন,

-এ ছোড়া (ছেলে)

রঘু প্রথমে বুঝতে পারেনি, কাকে বলছেন, আজ অবধি ওকে 'ছোড়া' কেউ বলেনি। এদিক-ওদিক তাকাল। উনি আবার বললেন,

- এ লড়্‌কা

রঘু বলল,

-মুঝে বুলা রহি হৈঁ আপ?

- তুম্‌সে নেহি তো ঔর কিসকো?

-কহিয়ে?

-মাছ-মাংস খাও তুমি?

-কী?

-সুনা নেহি? মাঁস -মছলি খাতে হো তুম?

রঘু গাড়লের মতো বলল,

-খাই। আজ খাব না। যা দেবেন, তা-ই খাব।

হিমানী বললেন,

-তোকে কে খাবার দিচ্ছে রে পেটুক?

রঘু বিপন্ন। বলল,

-জি?

স্যার হাসছেন তখনো। অনুনয়ের স্বরে বললেন ধীর গলায়,

-পহেলা দিন। ছোড় দিজিয়ে। প্লিজ।

হিমানী তাকালেন রঘুর দিকে।

রঘু হাত পা ধুচ্ছে। জল ঢালছে বালতি পর বালতি । উনি ধমকালেন,

-এ ছোড়া, আঙ্গানামে সৈলাব(বন্যা) লায়েগা তু? বন্ধ কর জল ঢালা। কুয়ো খালি করে ফেলবি। কাঁহা সে আয়া ইয়ে অজিব চিজ্ !

জল ঢালা বন্ধ করে ভেজা শরীরে রঘু দাঁড়িয়ে রইল হতাশ ভ্যাবলার মতো। কী বলবে? স্যার গেছেন বারান্দার দিকে। এবার বারান্দা ছেড়ে আরো কোনোখানে চলে গেলেন জাঁদরেল বরফের সামনে একলা ফেলে।

হিমানী ঝা, দীর্ঘ লতার মতো শরীর। তীক্ষ্ণ নাক, লম্বাটে মুখ, খোলা লম্বা চুলের কালোঢল। কপালে লাল বিন্দি। গলায় মঙ্গালসূত্র। পায়ে রুপোর নথ্। হাতে কয়েকটা কাচের সবুজ চুড়ি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হলেও টানাটানা চোখে খরতা নেই। সুশ্রী সুন্দর চোখমুখে ভোরের আকাশের পবিত্র স্নিগ্ধতা। রঘু ভেবে পায় না-এত সুন্দর মানুষটার ব্যবহার কর্কশ কেন? ধূর! ফিরে যাব এখান থেকে। খালি বকে, ধমকায়। হঠাৎ যদি মাথা গরম হয় আমার?

হিমানীর পরনে সুতির শাড়ি-হাল্কা সবুজ জমিতে ছোটোছোটো শাদাফুলের ছাপ। কপালের বাঁ-দিকে এলিয়ে পড়েছে কয়েকগাছি চুল। বাঁ-হাতে সরালেন। আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন রঘুকে। রঘু এখন সিনেমার ফ্রিজশট। কিছু করার নেই। কি করবে। ধমক খাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজ নেই।

হিমানী বললেন শাণিত গলায়,

-এ।

-জি?

প্রশ্ন করলেন আরো কর্কশ স্বরে,

-তেরা নাম কিয়া রে ছোড়া?

'ছোড়া'র হাত পা তখন কিছুটা শুকিয়েছে। চুল ভেজা। জমাট রঘু তরল হল। একটু নড়ে-চড়ে বলল,

-রঘু।

উনি প্রশ্ন করলেন,

-রঘুবীর?

-জি নেহি, রঘু।

-রঘুপতি?

-জি নেহি। রঘু।

-শুধু রঘু? পুরো নাম কী? শুভনাম বল।

-শুভনাম কী?

হিমানী বললেন,

-তোর নামের পেছনে কোনো লেজ নেই? যেমন সবাইর থাকে?

-হোয়াট!

-এই চোপ! অংরেজি মত ঝাড়। পুরা নাম বাতা।

-রঘু পুরকায়স্থ।

-তাই বল। এখন বুঝেছিস শুভনাম কী?

-জি ম্যাডাম।

-চোপ। ফির অংরেজি?

হাল্কা ভেংচালেন এবার। বললেন।

-রঘু পুরকায়স্থ! কোন ক্লাসে পড়িস তুই?

-জি টুয়েলভে।

-তবু জানিস না, পুরো নাম বলতে হয় কেউ জিজ্ঞেস করলে?

-আয়াম সরি ম্যাম।

-চোপ!

রঘু আবার মেরুর বরফ। সবকিছু তোলপাড় তছনছ করা রঘু এ মানুষটার সামনে জমে যায় কেন নিজেই বোঝে না।

হিমানী নামলেন বারান্দা ছেড়ে আঙ্গিনায়। কাচের চুড়িতে রিনির ঝিনির শব্দ হল এমন, যেন কোনো দূর মন্দিরে নিরিবিলি মঞ্জিরা একা একা বাজে। হিমানীর পায়ের নুপুরেও হাল্কা রিনরিন।

গলা সুরেলা, তবু আবার ধমক,

-তুই মাছ মাংস খাস বলছিলি না?

-জি।

-খবরদার। আমাদের ঘরের ভিতর বারান্দায় একদম আসবি না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি যতক্ষণ আমি অনুমতি দিচ্ছিনা। বুঝেছিস? ছুঁবি না কোনো কিছু।

রঘু বাধ্য অপমানিত, অসহায় বালক এখন। বলল অস্পষ্ট স্বরে,

-জি আচ্ছা।

বললেও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এমন নাজেহাল কোনোদিন হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অন্য কেউ এমন করলে কিযে করতো রঘু। কিন্তু এখানে, এমন হচ্ছে কেন? পা দুটো গাঁথনি হয়ে গেছে কুয়োতলায়।

হিমানী বললেন,

-দাঁড়িয়ে আছিস কেন পাথরের মতো? ঐ দ্যাখ, তোয়ালে আছে। হাতমুখ মুছে নে।

বলেই আবার চলে গেলেন অন্য কোথাও বা অন্দরমহলে।

হাতমুখ মুছতে মুছতে রঘু ভাবছে এই ভিসুবিয়াসটি কে? এত সুন্দর, কিন্তু এত তাপ? কী ব্যবহার করছেন? বাড়িতে লোক এলে কেউ এমন আচরণ করে? ধুরো ফিরে যাই।

হিমানী আবার এলেন বাইরে। কয়েক পলক দেখলেন রঘুকে। তারপর বললেন,

-বৈঠ যা।

রঘু চারধারে তাকালো। বসবার কিছুই নেই। না পেয়ে বলল,

-কোথায় বসব ম্যাডাম?

-মাটিতে বসে যা।

-জি!

-জি কিয়া? বৈঠ।

প্রবল অনিচ্ছায় হিমানীর আদেশমতো উবু হয়ে বসে পড়ল রঘু। উনি বললেন

-পুরোপুরি বোস মাটিতে।

নাজেহাল উত্যক্ত রঘু বসে পড়ল মাটিতে। ঠিক মাটিতে নয়, পাকা চত্বরে। ভাবল, -স্যার যে কোথায় গেলেন?

আগ্নেয়গিরি যদি ফাটে, এই পাম্পেই-তে কি এভাবেই বসে থাকতে হবে? ভদ্রমহিলা এতো হইহল্লা গরমাগরমি করেন কেন? মাঁস মছলিতে কি এমন দোষ?

কিছুক্ষণ আগে রঘুর ক্ষিধে পেয়েছিল। এখন সব উধাও। মাথা গরম হচ্ছে, তবু তেমন জোর পাচ্ছেনা মেজাজে।

স্যার এলেন বারান্দায়। পাজামা কুর্তা পরেছেন। এবার জোরে হাসলেন। বললেন,

-এখানে বসে-বসে কী করছিস? হিমানীজী দিস ইজ টু মাচ্। তুমি জাননা তো, কাকে এমন বসিয়ে রেখেছ।

রঘু ভাবছে, এই নাকি স্যারের পিঘলতা বরফ, হিমানী! এই যদি গলানো বরফ হয়, তবে উত্তপ্ত লাভা কাকে বলে রে বাবা!

ভর্ৎসনার স্বরে হিমানী বললেন,

-কিঁউ? কৌনসা সুবে বা সুবাদার হৈ ইয়ে ছোড়া?

স্যার বললেন,

-প্লিজ স্টপ! বেচারা কাহিল হয়ে গেছে। রঘু উঠে আয়। কিচ্ছু নারে। সব মজাক!

রঘুর একটু অভিমান হয়। বসেই রইল যেমন ছিল। ড্রেনপাইপ প্যান্ট পরে এভাবে বসতে অসুবিধে হচ্ছে, তবু। স্যার বললেন,

-কাম অন রঘু। ওঠ। এক ঝটকায় তুই কাত্। বাইরে তোর এত ফড়ফড়ানি। এখানে

কী হল?

রঘু তবু বসে রইল ঘাড়মুখ গুঁজে।

ভিতরে সবকিছু জ্বলছে।

হঠাৎ টের পেল মাথার উপর নরম হাতের চোটে। লম্বাটে আঙুল চলছে চুলের ফাঁক ফোঁকরে। রঘু চোখ তুলে তাকায় উপরে। সামনে জলজ্যান্ত রঘুর আগ্নেয়গিরি-যার নাম হিমানী। জ্বালামুখীর অগ্ন্যুৎপাত নেই। মুখে স্মিত হাসি। কেবল হাসছেন। শাদামুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত। বললেন,

-এই ওঠ।

রঘু অপমান ও অভিমানে টইটুম্বুর।

বলল, দৃঢ়স্বরে,

-ডোন্ট টাচ্ মি ম্যাম। আয়াম মিট এন্ড ফিশ ইটার।

রঘু তবু বসে রইল। উনি কপালে গালে, ঘাড়ে হাত বুলোলেন। আরো হাসলেন শব্দহীন।

বললেন নরমস্বরে,

-খারাপ পেয়েছিস তুই? ওঠ বেটা।

রঘুর উর্দ্ধবাহু ধরে টানলেন হিমানী। রঘু দাঁড়ালো। দেখলো হিমানীকে। হিমানী পরিপূর্ণ হাসছেন। বললেন,

-আমায় যে কেউ ভয় পাবে, ভাবতেই পারিনি। আমাকে কেউ ভয় পায় না। আর পেল তো এমন এক ছেলে, যে কিনা,

কথা শেষ না করে টানলেন রঘুর হাত, বললেন,

-অন্দর আজা

রঘু বলল,

-না।

- কেন?

- আমি মাছ-মাংস খাই। আমি কিচ্ছু ছুঁতে পারব না।

কাঁচের চুড়ির শব্দে রিনরিনে হাসলেন হিমানী। স্যারও হাসছেন। হিমানী বললেন,

-মাস্টারজি, আপনার বিদ্যার্থীকে ভেতর নিয়ে যান, অভিমান হয়েছে। হবেই তো। মৈ খানা লাগাতী হুঁ। মুখ শুকনো। খিদে পেয়েছে বোধহয়।

হিমানী একটু এগোতেই রঘু ডাকল,

-সুনিয়ে ম্যাডাম

উনি থমকে গেলেন। বললেন,

-কিয়া হৈ ?

-একটু থামুন।

হিমানী দাঁড়ালেন। রঘু এগিয়ে গেল হিমানীর কাছে। একপলক থমকে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে হিমানীর পায়ের পাতা ছুঁল। তারপর একই হাত স্পর্শ করাল নিজের কপালে।

পলকে আরো বদলে গেল হিমানীর চোখ, মুখ, ঠোঁট, কপাল সবকিছু। এখন গাঢ় জ্যোৎস্না শীতের মৃদু হাওয়া, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুহিন প্রপাত দামাল হাওয়া, শান্ত দিঘি, সবই যেন হিমানীর মুখাবয়বের নিবিড়তায় সমাহিত।

বললেন ফিসফিসস্বরে,

-সুস্থ সবল থাক বাবা। আমার সম্পূর্ণ আয়ু তুই নে।

বলেই চলে গেলেন রসুই ঘরের দিকে।

বারান্দায় দাঁড়ানো স্যার বললেন কপট অভিযোগে,

-বাঃ বেটা। আমাকে গুডমর্নিং গুড্ডে ছাড়া কিছুই বলিসনা। ইউ আর চ্যাম্পিয়ন অব ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং

-হোয়াট স্যার!

-নাথিং। আয়।

তারপর বললেন জোরে,

-হিমানীজি খানা উনা কুছ দিজিয়ে।

হিমানীর গলা শোনা গেল,

-দুজনে এসো রান্নাঘরে।

রঘু রসুইঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মাছ মাংস খাওয়া শরীর নিয়ে কীভাবে ভেতরে যাই—এসব ভাবছে। বিহারের বংশজ কুশীল ব্রাহ্মণ কেউ মাছমাংস স্পর্শ করেননা। এরা দুজনও নিশ্চয়ই না। কী করা যায় এখন?

তপ্ত তাওয়ায় কয়েকটা বেলানো রুটি সেঁকা হচ্ছে। উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন হিমানী। একবার দেখলেন রঘুকে। বললেন,

-ভেতরে আয়।

তারপর স্যারকে বললেন,

-গুরুশিষ্য কোথায় বসবে? এখানে গরম। বসতে পারবেনা। বারান্দায় পাখা চলছে।

স্যার বসেছিলেন মোড়ায়। বললেন,

—একখানে বসলেই হল। খাবার দাও। অড়হরের ডাল করেছ?

হিমানী বললেন,

—জি।

এখন চাপাটি সেঁকছেন।

আবার বললেন,

– সুরজ কা ব্রত কর রহা হৈ রঘুনাথ। দাঁড়িয়েই আছে। থাকুক দাঁড়িয়ে। আজব ছেলে।

স্যার বললেন,

– ওর কী দোষ। কী করবে বুঝতে পারছেনা। এমন দিচ্ছ লাগাতার।

হিমানী হাসলেন। বললেন,

–গুরুশিষ্য পাখার তলায় বসো। খাবার দিচ্ছি।

রঘুকে বললেন,

– এই ফিশইটার আজ পুরোপুরি ভেজেটেরিয়ান হতে হবে তোকে। পারবি তো?

রঘু কিচ্ছু বললনা। স্যার বললেন,

–তোমার কাছে ও সবই পারবে। খেতে দাও।

– পাশের অন্য মোড়ায় বসল রঘু। একটু দ্বিধা ছিল, স্যার সামনে বসে আছেন। এর চেয়ে বড়ো চিন্তা-হিমানী নামক রহস্যময়ী ঠিকই কি মজা করছিলেন? ওঁকে দেখলে তো মনে হয় না- কারো সাথে তামাশা-টামাশা করেন। স্যারের সাথে এঁর কি সম্পর্ক? স্ত্রী হবেন বোধহয়। এছাড়া আর কী হতে পারেন? তবুনিশ্চিত হওয়ার সঙ্কল্প নিলো রঘু। স্যারকে আস্তে ডাকল,

–স্যার।

– কীরে?

-হু ইজ শি?

– কে?

রঘু চোখের ইশারায় দেখলো হিমানীকে। উনি তখন বড়ো দুটো থালায় গরম-গরম চাপাটি ভাঁজ করে রাখছেন। তৈজসের ঢাকনা সরিয়ে ছোটো ছোটো কটোরিতে (বাটিতে) সবজি (রান্নাকরা ব্যঞ্জন) বেড়ে দিচ্ছিলেন যত্নে। বললেন,

– খানা পরোস দিয়া। অন্দর-আইয়ে স্যার তাকালেন রঘুর দিকে, একবার হিমানীর দিকে। বললেন,

– কী বলছিলি?

– ইজ শি ইওর ওয়াইফ?

– তোর কী মনে হয়?

– আই ডোন্ট থিংক।

– কী?

– শি ইজ নট ইওর ওয়াইফ।

– তো কে?

স্যার উচ্চগ্রামে হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতেই বললেন,

– হিমানীজি, সুনিয়ে-সুনিয়ে

উনুনের আগুনে অল্প ধোঁয়া। হিমানীর কোঁচাকানো, দিঘল চোখ ছলছল। বললেন,

– এত হাসি কেন? কী হয়েছে?

– শোনো, রঘু কী বলছে

– কী?

– ওকে জিগ্যেস করো।

হিমানী বললেন রঘুকে,

– কীরে, কী হয়েছে?

রঘু তটস্থ। বলল,

– নাথিং নাথিং ম্যাম।

– চুপ মাঁস মছলি অংরেজি। পুরো ম্লেচ্ছ তুই। কী বলেছিস তোর স্যারকে?

তারপর স্যারকে বললেন,

– কী বলেছে তোমার উটপটাং চ্যালা?

– বলছে, তুমি আমার কে হও?

কথা শুনে প্রখর দৃষ্টিতে তাকালেন হিমানী রঘুর দিকে। সুন্দর দুটো চোখে খরতা নেই। কৌতুক ও আস্কারা বেশি। বললেন দৃঢ় কণ্ঠে,

– কী মনে হয় তোর? আমি কে?

রঘু মনে-মনে বলল,

– তুমি কি তুমিই জান। তবে আগ্নেয়গিরি মোটেও নও। আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু যতোই ঠান্ডা ঠান্ডা, মায়া-মায়া, মা-মা চেহারা হোক তোমার, এত গরম হয়ে যাও কেন? আমার ধুলো মাখা চপ্পল, মাংস-মাছ-অংরেজিতে কী এমন দোষ পেলে যে ধুড়ুম-ধাড়ুম শুরু করে দিয়েছিলে? তখন ললিতা পাওয়ার হয়ে গিয়েছিলে কেন?

হিমানীর গলায় ধমকের আভাস,

-গুঙ্গা হৈ রে তু?

এবার অনিচ্ছায় আবোল তাবোল বলল রঘু,

– বহুৎ অচ্ছি হৈঁ আপ।

স্যার আবার হাসলেন জোরে।

হিমানীর মুখে হাসির বিন্দুতম ছটা নেই। বরঞ্চ সহসা ঋতু বদল হয়। মুখ চোখ ভার ভার।

পর মুহূর্তে মুখাবয়ব নির্ভার করে স্মিত হাসলেন। বললেন,

– আর ম্যাডাম ম্যাডাম করলে লাঠিপেটা করবো। চাচি বলবি, কেমন? খেতে আয় এখন। জুড়িয়ে যাচ্ছে। অড়হর ডাল খাস তো? সব সব্জি মিলিয়ে ব্যঞ্জন আছে। চলবে?

রঘু বলল,

– জী ম্যাডাম।

– আবার ?

– ওহো । আর হবেনা, চাচীজী !

হিমানী কুয়োতলায়। সঙ্গে লছমতীয়া কাজের মেয়ে। দুজনে বাসনমাজা চলছে।

রঘু স্যারের কক্ষে বসেছে ডিভানে, স্যার কাত্ শুয়েছেন বিছানায়। হাতে পাটনা এডিশন সার্চলাইট। উনি পড়ছেন ভেতরের পাতা। রঘুর হাতে প্রথম পাতা। পাতায় বড়ো বড়ো হেডিং- ভোলারাম নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

ডানদিকের কোণায় বেশ বড়ো হরফে হেনলাইন- Police nabbed four gunman at Thama Bihpuria

কাগজের তলায় বড়ো অক্ষরে ছবিসহ ভিন্ন এক হেডলাইন- Rajkapurs galar Production MERA NAAM JOKER IS FLOPPED

স্যার একসময় নিজের মনেই বললেন,

প্রদেশ রাজনীতিতে এতো অস্থিরতা কেন বুঝতে পারছিস ?

রঘু আনমনা ছিল কিছুটা। বলল,

-প্যারডন স্যার ?

-ফ্রিকোয়েন্টালি সি এম পাল্টাচ্ছে। এর মানে কি হলো ?

রাষ্ট্র ও প্রদেশ রাজনীতিতে রঘুর বোধ এখনো তেমন স্পষ্ট নয়। তবু বলল,

-কুর্সি কে লিয়ে ডামাডোল স্যার। ঔর কিয়া ?

-দ্যাট্স্ রাইট। একটা ব্যাপার কি জানিস ?

-কি স্যার ?

-টিচার্স কম্বাইন্ড ফোরাম স্ট্রাইকে যাচ্ছে। এটাকেও মুদ্দা বনাবে সিয়াসতী দল।

রঘু বলল,

-এর মানে, সামনে লম্বা ছুটি।

স্যার বললেন,

-হোস্টেল বন্ধ হবেনা।

-বন্ধ হলেও আমি থেকে যাবো যেখানে খুশি।

-এখানে ও থাকতে পারিস।

-এখানে ?

-কেন ? হিমানীঝার তত্ত্বাবধানে আরামসে থাকবি।

রঘু আপত্তি করে,

- নো স্যার।

-কেন রে? কোনো সমস্যা?

- তা নয়।

-তো?

রঘু কথা বলছে না দেখে হেসে বললেন,

হিমানীজির ঝটকা সহ্য করতে পারিসনি?

-তা নয় স্যার।

-কী সমস্যা তোর?

-আপনাদের অসুবিধে হবে।

স্যার বললেন,

-কতটা রুম দেখেছিস? উপরমঞ্জিলা (উপরতলা) এখনো দেখিসনি। ফাঁকা পড়ে থাকে সবসময়। কত স্টুডেন্ট এখানে একসময় থেকে গেছে।

রঘু বলল অকপট,

-তখন ঐ ম্যাডাম ছিলেন না।

স্যার অবাক হলেন। বললেন,

-কী!

কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পেরে জোরে হাসতে শুরু করলেন। তারপর ডাকলেন,

-সুন্‌তি হ্যাঁয় আপ? এদিকে আসুন। রঘু কী বলছে নিজের কানে শুনে নিন।

হিমানী শুনতে পাননি। এখনো ঘষামাজা চলছে কুয়োতলায়। হয়তো শেষ হয়েছে এতসময়ে। কী যেন নির্দেশ দিচ্ছিলেন জোরে জোরে অস্পষ্ট শব্দ আসছে এই কক্ষে।

রঘু বলল বিপন্ন স্বরে,

-স্যার!

-ইয়েস?

-আই ডোন্ট মিন ইট।

-হোয়াট?

-আই নো, শি ইজ এ নাইস লেডি। ডোন্ট কল হার প্লিজ। শী উইল রিবিউক মি এগেন। প্লীজ স্যার।

- রাখ, রাখ। আসতে দে ওঁকে। যা বলার তাঁর সামনেই বলিস। মজা শোন, তোর কথা অনেক বলেছি তো। শুনতে শুনতে সেদিন বললেন, নিয়ে এসো তো একবার। দেখব কিস খেত কা মুলি হ্যাঁয়-ও।

রঘু বলল,

-আপনি কী বললেন স্যার তখন?
-কী বলব আর? তখনই ভেবেছি একটু ঝড়তুফান হবে। কিন্তু একটা ব্যাপার কী জানিস?
-কী স্যার?
- কারো সাথে একদম কথা বলেন না এই ভদ্রমহিলা। তোর সাথেই আজ এত কথা বললেন, তামাশা করলেন।
- আমার সাথে? কেন?
-বললেন, ওকে এনো তো একদিন। ঝাঁকানি দেব।
-কেন স্যার এমন করলেন?
-উনিই জানেন। একটা কথা কী জানিস?
-কী স্যার?
-ধনী বাবা-মার একমাত্র সন্তান তোর চাচিজি। উচ্চ কুলীন বংশে অনেক সংস্কার থাকে জানিস তো। এই ভদ্রমহিলারও সংস্কার আছে প্রবল, কিন্তু কোনো কুসংস্কার নেই। ভিখিরিরা কী করে জানিস?
-কী?
-বাড়ির অন্য কেউ ভিক্ষে দিলে নেয়না। বলে, হামারা মাইজি কাঁহা?
-কেন?
- তোর নাইস লেডি যে পরিমাণ ভিক্ষে দেন একজনের হেসে-খেলে একহপ্তা চলে যাবে। তাই বাবা দ্বারিকাকে বসিয়েছিলেন সদরে। ভিখিরি দেখলে পাঁচ দশ পয়সা দিয়ে যেন তাড়ায়। একদিন হিমানীজিকে বাবা বলেছিলেন, স্যার থামলেন। রঘু বলল,
-কী বলেছিলেন?
-বলেছিলেন, ঘরে বাটি-উটি থাকলে কয়েকটা রেখো। হিমানীজি তো অবাক। জিগ্যেস করেছিলেন,
-কেন বাবা?
- দরকার হোগি বেটি।
-কেন?
-এমন দান যদি জারি রাখিস , আমাদের সবাইকে ওভারব্রিজের ফুটপাথে কটোরা নিয়ে বসতে হবে।
-স্যার বললেন,
-হিমানীজি খুব সেন্টিমেন্টাল। বাবার মজাক শুনে ওঁর খুব অভিমান হয়। বাবা খুব স্নেহ করেন ওকে। অন্নপূর্ণা বলেন।

রঘু বলল,

-ম্যাডাম কী করলেন তখন?

- কী আর করবেন। চাবির গোছা বাবাকে সমঝে দিয়ে রাগত গলায় বলছিলেন, ঠিক আছে সদরে পাহেরেদার বসিয়ে দিন। ভান্ডারের চাবিচুবি আপনার কাছে থাকুক।

একটু থেমে স্যার বললেন,

-বাবা তখন কাবু। বললেন মুঝে মাফ করদে মেরে মারি। তেরি সব কুছ তুহি সমাল, অথবা বিলিয়ে দে, সব তোর ইচ্ছে।

সব শুনে রঘু রসকষহীন গলায় বলল,

-গরিবের জন্যে একটু দয়ামায়া আছে আর কি। সবারই থাকে।

-তা থাকে। আরো একটা ব্যাপার।

-কী স্যার?

-ওকে ইমোশন্যালি ব্ল্যাকমেল করা খুব সহজ।

-মানে?

-বুঝতে পারিসনি?

- না স্যার।

-কেউ নরম নরম দুটো কথা বললে উনি পিঘলতা বরফ।

রঘুর এবার আবেগহীন প্রতিবাদ,

-পিঘলতা কেন ভলক্যানো হয়ে গিয়েছিলেন উইথ হাই ট্রেমর? হোয়াই? মাছ মাংসে কী দোষ?

স্যারের ভর্ৎসনা,

-ইডিয়ট! হিমানী মজা করছিলেন। এত সময়ে কী বুঝলি, কোথায় মন তোর?

কখন যে হিমানী কক্ষে এসেছেন,

রঘু টের পায়নি।

ডানদিকে দেয়ালঘেষা বিশাল ড্রেসিংটেবিলের লাইফসাইজ বেলজিয়াম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছোটো টারকিশ তোয়ালের হাতে মুখ ঘাড় মুছতে মুছতে বললেন,

- কী ফিসফাস প্রলাপ হচ্ছে দুজনে, আমিও শুনি।

রঘু বলল,

-নাথিং ম্যাডাম।

হিমানীর তীক্ষ্ণ স্বর,

-আবার অংরেজি?

- সরি ম্যাম।

-উফ! বাহর যা তু!

-অ্যাজ ইউ উইশ ম্যাম।

রঘু তবু বসে আছে। হিমানী বললেন,

-আপনি বাইরে যান রবার্ট ক্লাইভ।

রঘু উঠতেই স্যার হাল্কা হাসলেন।

বললেন,

-তুই বোস রে। হিমানীজি প্লীজ! আগের ডোজের ঘোর এখনো কাটেনি। বেচারা সামলাতে পারেনি।

হিমানী বললেন,

-কৌন বেচারা?

-তুমহারি রবার্ট ক্লাইভ।

- ও বেচারা নাকি?

-অবস্থা তো এরকমই।

একটু থেমে হিমানী বললেন,

- ওর চোখ দেখেছেন আপনি মাষ্টারজি?

রঘু তটস্থ। এখানেও আবার চোখ!

কী আছে রে- বাবা চোখে?

স্যার বললেন,

-চোখ? কেন কী হয়েছে ওর চোখে? কৌঈ তকলিফ?

হিমানী এবার উল্টোদিকের অন্য সোফায়

বসলেন রঘুর মুখোমুখি। বললেন,

-এ ছোড়া।

-জি?

-মুহ উঠা।

রঘু মুখ তুলল। হিমানী বললেন,

-কী খুঁজিস রে তুই?

রঘু অবাক। বলল,

-কী?

-কিস্ চিজ কা তালাশ তেরেকো?

-জি!

-কী খুঁজিস? এত আনমনা কেন তোর চোখদুটো?

-জি!

-বাইরে ফিটফাট। ভেতরে ভেতরে এতো অগোছালো কেন তুই?

-হোয়াট ডু ইউ মিন ম্যাম?

সব শুনছেন স্যার। বললেন,

-ঠিকই। পেনসিভ আইজ।

রঘু বুঝল না। বলল,

-হোয়াট স্যার:

জবাব দিলেন হিমানী। বললেন,

-এত শ্রান্তি, এতো অন্বেষণ কেন তোর সুন্দর দুটো চোখে?

এবার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল রঘু।

অনেক কিছুর সাথে সম্মিলিত হল পুরুষালী কুণ্ঠা।

সোফা ছেড়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

হিমানী বললেন,

-বোস। আর কিচ্ছু বলবো না।

রঘু বলল বিরক্তিতে,

-ডোন্ট পুল মাই লেগ্‌স ম্যাম। মন চাহে তো থাপ্পড় মার দিজিয়ে। লেকিন,

কথা শেষ হতে দিলেন না হিমানী।

মায়ার অস্পষ্ট মেঘ উড়ে এল মেয়েলি স্বরের নির্মল আকাশে। বললেন,

-একদিন খুব জোরে থাপ্পড় মারবো তোকে। বোস চুপচাপ।

রঘু তবু দাঁড়িয়ে থাকে। হিমানী শান্ত কণ্ঠে বললেন,

এখনি থাপ্পড় খেতে মন করছে? বলছি যে, বোস এখানে। কথা শুনিসনি?

রঘু টের পায় পিঘলতা বরফের স্বরে

কী এক অপ্রতিরোধ্য মহাকর্ষ-যা এক পা নড়তে দেয়না।

রঘু বসল সোফায়। হিমানী দেখলেন ওকে।

গলির শেষ মাথায় চৌমাথার মোড়ে ছোটোপান দোকানের রেডিওতে পঞ্চরঙ্গি কার্যক্রম বাজে। এখন ভেসে আসছে খুবই পরিচিত ভোজপুরি, গান 'ও গঙ্গা মাঈয়া তোহে পিয়ারি চরাইবে।'

গানের সুর ভাসে কক্ষ জুড়ে। স্যারের চোখ লেগেছে। পাশেই পত্রিকার খোলা পাতা।

হিমানী বললেন,

-ডিভান পেতে দিচ্ছি। শুয়ে পড়।

রঘু তবু বসে রইল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সব চুল ঝাড়তে ঝাড়তে হিমানী বললেন,

- ওকে বলুন, ওর যেখানে খুশি শুয়ে পড়ুক। আমার কথা শুনছে না। থাপ্পড় না খেলে শুনবে না মনে হয়। এখনো রাগ করে বসে আছে আমার ওপর। তামাশা বোঝে না। এত বেকুফ ছাত্র তোমার!

হিমানী লক্ষ্য করেননি স্যারের চোখে অনেক আগেই ঘুম। একবার দেখলেন। মৃদু হেসে বললেন,

-ঐ দ্যাখ তোর গুরুর মাঝরাত। ঘুমোবি না একটু? আমি উঠোনে যাব। লছমতিয়ার ওপর ভরসা করা যায় না। বাতাস সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বেকুফ বিদ্যার্থী কখন কী করে নিজেই জানেনা। হঠাৎ উঠে ঘুমন্ত স্যারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। হিমানী বললেন,

-ইয়ে কিয়া?

রঘু বোঝাল,

-কোনোদিন করা হয়নি। স্যারের খারাপ লাগতে পারে। তখন আপনাকে করেছি, ওঁকে করিনি তো।

হিমানী টুলে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। শুনছেন, দেখছেন সব। বললেন,

-রাঁচি যাবি?

- কী?

-রাঁচি। সরকারি পয়সায় তোকে পাঠানো হবে।

- হঠাৎ রাঁচি কেন যাব?

-হঠাৎ এমন করলি কেন?

- কী করেছি?

- কথা নেই, বার্তা নেই। প্রণাম?

- বললাম তো।

- কী?

- তখন স্যার বারান্দায় ছিলেন। মাছ মাংস খেয়ে আপনার পারমিশন ছাড়া বারান্দায় উঠি কী করে?

হিমানীর বাঁ-হাত চলে বেশি। একই হাতের তর্জনীতে লাল বিন্দি নিয়ে তাকালেন একবার রঘুর দিকে। তারপর আয়নায় লক্ষ্য রেখে কপালে আলতো বসিয়ে দিলেন।

লাল বিন্দি শুভ্র প্রশস্ত কপালে অন্য মহিমায় উদ্ভাসিত হল। বললেন,

-স্যারেরা তোকে কী করে পড়ান। আরো তো বিদ্যার্থী আসে। তোর মতো কেউ নয়। এমন কেন তুই?

- কী ম্যাডাম?

- বেকুফ, সিরফিরা

মুখের পরিপাটি শেষ করে হিমানী

আবার বললেন,

-যেখানে ইচ্ছে শুয়ে থাক। এ রোদে বেরিয়ে কাজ নেই, বুঝেছিস?

- না, আমি যাব।
-বাইরে কি রোদ দেখেছিস?
-কিচ্ছু হবেনা। এসময় আমি ঘুরি।
- কোন যজ্ঞ করিস তুই?
- কত কাজ থাকে।
- তুই কাজ করিস?
- করি।
- কী কাজ? পড়াশুনা করিস না শুনেছি।

রঘু বলল,

- করি, যখন সময় পাই।
- মানে! সময়ে পেলে পড়িস?
-জি।
-আর কীভাবে সময় ব্যয় করিস তুই?
- কত কাজে। এই তো সেদিন নেপাল গেলাম। জরুরি কাজ ছিল।
-নেপালে তোর জরুরি কাজ? চোরাকারবারি যায় ওখানে। তুই গেলি কেন?

রঘু বলল না কেন গিয়েছিল। হিমানী আলনার কাপড় গোছাচ্ছেন। ভীষণ পরিপাটি। বললেন,

-আবার বোবা হয়ে গেলি?

রঘু জানাল,

-না।
- বল, কেন গিয়েছিলি?

একটু সময় ব্যয় করে রঘু বলল,

-ইয়ে, ঝামেলার কাজ।
-কি?
-আপনি বুঝবেননা।
-কী এমন কঠিন কর্ম করালি যে আমি বুঝব না?
-আছে। বুঝবেন না।
-হেই বুড়বক, মূর্খ পেয়েছিস আমাকে?
-হ্যাঁ।
-কী!
-জি নেহি! মুখ ফসকে গেছে। আনমাইগন্ডফুল ছিলাম।
-সবসময় থাকিস, তাই না?

-জানি না

হিমানী বললেন,

-যারা থাকে তারা জানে না। জানলে অন্যমনস্ক হবে কেন?

-কী?

-তোর মাথায় ভুষা ছাড়া কিচ্ছু নেই। বুঝবিনা। আচ্ছা বল, নেপালে তোর কোনও কুটুম্ব আছে?

-কুটুম্ব? মানে?

- তোর ইংরেজিতে রিলোটিভস।

- কেউ নেই।

- কেউ নেই তো ওখানে কার ঘাস কাটতে গিয়েছিলি?

- ঘাস! কেন ঘাস কাটব? কে খাবে?

হিমানীর অর্ন্তভেদী দৃষ্টি নিরীক্ষণ করল রঘুর আদ্যোপান্ত। নিশ্চিত হলেন, কোনো ছল, রঙ্গ নেই ' কে খাবে' দুটো শব্দে। বরঞ্চ রঘু বিষণ্নচোখে তাকিয়ে আছে।

হিমানী বললেন অবর্ণনীয় স্বরে ও আবেগে,

- তোর কাটাঘাস যে কেউ খেয়ে নেবে রে শিরফিরা!

- জি!

- শোন।

- বলুন?

এখন হিমানী রঘুর ডিভানে বসেছেন। দূরত্ব ফুট তিনেক। রঘুর চোখে এবার আরো স্পষ্ট দীপ্যমান, হিমানী।

বাঁ-দিকে জানালার বাইরে নিম্বুয়া গাছের পাতার ফাঁকে শেষবিকেলের রোদের ছটার স্পর্শ হিমানীর মুখে। কঠিন অথচ কোমল দৃষ্টি ক্রমাগত ভেদ করে রঘুকে। রঘু এত তীব্র দৃষ্টির অভিঘাতে কিছুটা অবনত হল।

কায়িক দূরত্ব একটু সংক্ষেপ করলেন হিমানী। তারপর বললেন স্তিমিত স্বরে;

- তোর স্যারের কাছে শুনেছি সব।

- কী শুনেছেন?

- সব

- কী?

- স্মাগলারদের সাথে বিরাটনগর গিয়েছিলি একবার। কেনরে ভূত? তোর কি খুব টাকার প্রয়োজন?

এবার মুখ তোলে রঘু। হিমানীর চোখে চোখ রেখে বলল,

- টাকার জন্যে নয়। ট্রাস্ট মি।

-তো যাস কেন? এরা কারা জানিস না?
-জানি।
-কেন যাস তবে?

একটু চিন্তা করে রঘু বলল,

-স্যার আপনাকে বলেছেন?
-যেখানে যা করিস সব নাকি তোর স্যারকে বলিস?
-বলি। তবে সব কথা না।
-কোন কথা বলিস না?

কথার জবাব না দিয়ে বাঁ-হাতের চোটোতে ঠোঁট মুছলো রঘু। দুহাতে মাথার কালো কুচকুচে থাক থাক অবিন্যস্ত চুলে হাত বোলাল। ডান তর্জনী দিয়ে কান চুলকাল।

হিমানী ক্ষীণ ধমকালেন,

-এই।
-কী?
-কোন কথা তোর স্যারকে বলিস না?

আবার ইতস্তত করে রঘু। হিমানী এগিয়ে আসেন আরো পাশে। ঘরে পাখাসহ ঘুমন্ত স্যারের শ্বাসের শব্দ। দূরের দোকানে রেডিয়ো হাল্কা কিন্তু স্পষ্ট গান ফিল্মের, 'সজনোয়া বৈরি হো গাঈ হামার'

গান ভাসে ঘরের আপাত নৈঃশব্দ বাতাসে।

রঘু গানে মন দিল। ছবিটা বেশ কিছুদিন আগে দেখেছে বসন্ত টকিজে। রাজকাপুর বয়েলগাড়ি চালায়। ওয়াহিদা রহমান বাঈজি।

প্লে ব্যাকে মুকেশ।

মৃদু ধাক্কা দিলেন হিমানী রঘুর কাঁধে বললেন,

-কথার জবার না দিয়ে গান শুনছিস?
-জি?
- তোর কান ওদিকে আমি টের পাচ্ছি। ফিল্মি গান খুব করিস কমনরুমে বেঞ্চ চাপড়ে, তাই না?
-কী?
-তোর স্যার বলেছেন। প্রিন্সিপাল তোর উপর ভীষণ চটা। অবশ্য মেয়েগুলো খুব খুশি। কিরে?
- জি নেহী। নেহি মালুম।
-ঘাবড়ে গেলি কেন? ওরা খুশি হলে ভালোই তো। শেয়ালের মতো চেঁচাচ্ছিস শুনে মেয়েগুলো যদি আনন্দ পায় এতে প্রিন্সিপালের কী অসুবিধে? আরো চেঁচাবি কেমন?

রঘু কী বলবে ভেবে পায় না। হিমানী আবার বললেন,

- কোন কথা স্যারকে বলিস না?

- আপনাকে বলা যাবে না।

- মারব কিন্তু। বল তাড়াতাড়ি।

- কী হবে শুনে ফালতু ব্যাপার?

- বল, বলছি। খাবি মার।

রঘু তবু চুপ। হিমানী অনুনয় করেন,

- বলনরে, কী হয়েছিল ফালতু ব্যাপার।

সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রঘু বলল,

-আমি যেখানে যাই ও আমার পেছনে পেছনে যেতে চায়।

-কোথায় যেতে চায়?

-যেখানেই যাই। একা পেলেই পিছু নেয়।

-কেন যেতে চায়?

-জানিনা।

-জিজ্ঞেস করিস না কেন?

-করি। স্পষ্ট বলে না। খালি হাসে। গুণগুণ গান গায়। উল্টোপাল্টা কথা বলে।

হিমানী বললেন,

-কিচ্ছু বলেনা, তবু যায়?

-হ্যাঁ ধমকাই। একদিন মারব ভেবেছিলাম। মারিনি। গায়ে হাত দেয়া যায় না। মেয়ে তো।

-মেয়ে যে, তুই না-বললেও বুঝেছি। কে সে? তোর বন্ধু?

-একদম না। কেউ না আমার। বন্ধু কেন হবে?

-কী নাম ওর?

-বাজে নাম।

-বাজে নাম? কী বাজে নাম?

-ঝিলিক।

-বাঃ সুন্দর নাম? মেয়েটা দেখতে নিশ্চয় খুব মিষ্টি।

-মিষ্টি না কষ্টি জানিনা।

হিমানী হাসলেন একটু। বললেন,

-কে সে? কার মেয়ে?

- ডা. মৈত্রর ছোটোমেয়ে। নাইনে দুবার ফেল। পড়াশোনা নেই। রঘুর দৃষ্টি অন্যদিকে। হিমানী বাঁহাতের চেটোয় গাল রেখে মাথা কাত করে শুনছেন ঝিলিকজনিত রঘুর বিরক্তি ও অসহায়ত্ব।

স্মিত হেসে বললেন,
-পেছনে এলে তোর কী অসুবিধে এমন? যাক না। ওর পড়া নেই। তোর পড়া নেই। দুটোতে মিলবে ভালো।
রঘুর তীব্র প্রতিবাদ,
-নো ম্যাম। আই ডোন্ট লাইক হার।
-বেশ কিছু সময় এমনি কাটে। স্যার পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছেন।
দূর রেডিয়োর খবর আসছে-কোলকাতার দুই যুবক ছোট্ট নৌকোয় আন্দামান পৌঁছেছে। ভারত থুম্বা থেকে রোহিণী উৎক্ষেপণ করেছে।
হিমানী বললেন,
-একটা কথা মানবি আমার?
-বলুন ম্যাম।
-তোর স্যারের সব কথা তো মানিস?
-জি হাঁ।
-আর কোনোদিন যাবি না।
-কোথায়?
-বিরাটনগর। যদি শুনি আবার ওখানে গেছিস খুব মার খাবি। দুহাতে না, দশহাতে মারব। এমন করে সবাইকে উত্যক্ত করিস কেন রে!
-জি!
-জি আবার কী? এত উদভ্রান্তি কেন তোর? আমার কথার এদিক ওদিক করতে পারবি না আজ থেকে। তোর স্যার বলতেন তোর কথা। শুনে শুনে ভাবতাম কেন এমন সে? এত অস্থিরতা আনমনা ভালো নয় রে রঘু।
-কী!
-বল, আর কোনোদিন চিন্তায় ফেলবি না?
রঘু বলল,
-চিন্তা? কে চিন্তা করে আমার জন্যে?
-তোর স্যার আর,
বলেই থামলেন হিমানী। রঘু বলল,
-আর কে ম্যাডাম?
হিমানী ধমকালেন,
-আবার ম্যাডাম!
-আচ্ছা বলবনা। আর কে চিন্তা করে?
হিমানী দেখলেন রঘুকে। রঘু দেখছে ওঁকে। চোখমুখ উদগ্রীব।

হিমানী বললেন,

-তোর জন্যে আমার চিন্তা হবে আজ থেকে, এও বুঝলি না এতসময়ে? ঝিলিক মেয়েটা কেন যেন তোর পেছনে ঘুরে মরছে বেচারি। কারো মনের খবরে তোর কোনো মাথাব্যথা নেই। আচ্ছা ঘুমো এখন। এ রোদে কোথাও বেরুবি তো ঠ্যাং ভেঙে ফেলব। আমি ঝিলিক নই যে তোর গাল খাব উল্লুক!

খোপা বাঁধতে বাঁধতে হিমানী চলে গেলেন কক্ষ ছেড়ে।

ভিতরে যা-ও দু একটা ইমারত খাড়া করেছিলো রঘু প্রাণপণে, বেশ কিছুদিনের প্রচেষ্টায়, ধড়ধড় শব্দে সব গুড়িয়ে গেল আবার। এ শব্দ রঘু ছাড়া কেউ শুনল না। আনমনা হয়েও একেবারে স্থির মনস্ক হল হিমানীর স্থিতিশীল এক বাক্যে "কারো মনের খবরে তোর কোনো মাথা ব্যথা নেই।

ভুল হিমানীজি, মহাভুল। অন্যের মনের খবর নিতেই নিজের জন পুরোপুরি উদভ্রান্ত হয়ে গেছে, এ বৃত্তান্ত কাকে শোনাই?

হিমানীর কথায় বুকের ভেতর কালকা মেল ছোটে কেন? একেই কি আবেগ বলে?ভাষাহীন শব্দহীন, শীতল বৃষ্টির মতো। মৃদুবাতাসে গাছের পাতার থরথর কাঁপনের মতো, ঝিলমিল ঢেউয়ের মতো!

এ আবেগ কি একজন অন্যজনকে উপহার দেয়? যেমন দিয়ে গেলেন একটু আগে হিমানীজি? রঘু ভেবে পায় না।

কিন্তু আবেগই তো একদিন বিষণ্ণ করে দেয় সব। রঘু বোঝে না, অস্পষ্ট লাগে। কেউ কাউকে নিজের গচ্ছিত আবেগ এমন উদারভাবে বিলিয়ে দেয় কেন, রঘু তা-ও বোঝে না।

শুধু এতটাই বোঝে,সামনেই এক অলৌকিক মরুদ্যান উঁকি দিয়েছে। ওখানে পিপাসার জল আছে বোধহয়। নির্মল শীতল পেয়, যে পানীয় এক আপাত অগ্ন্যুৎপাতের গহ্বর থেকে উত্থিত-আর এই অগ্নুৎপাতের পোশাকি নাম-হিমানী ঝা।

সুন্দর অনেক লৌকিক-অলৌকিক, বস্তু ও বস্তুনিরপেক্ষতায় সমাহিত পার্থিব ব্যক্তিত্ব-যাঁকে কেউ বলে পিঘলতা বরফ, ভিখিরির অন্নপূর্ণা, ফুলমতি-লছমতিয়ার মাঈজি, দ্বারিকা-বজরঙ্গির ঠাকরাইন, স্যারের 'শুনিয়ে জি' আর আজ থেকে ওর নিজের কে হন উনি? কেউ তো নন। তবু কেন বলে গেলেন 'একহাতে নয়, দশহাতে মারব'। কী জানি রে বাবা! জীবনে চলতে চলতে কত যে ঝাপসা জনপদ, ঘাট-বেঘাট, অলিগলি? সব বুঝে কাজ নেই।

সেই অনেক আগের, পশ্চিমভারতের জনবহুল বিশালনগরীর উপান্তে ছায়ানিবিড় পরিবেশ, উপলবিস্তীর্ণ নদীর পারে যে মাঠ, মাঠের পর ঝকঝকে ছিমছাম এক নিবাসের বাসিনী,এক মহিলা, চাড্ডাআন্টি। কে হতেন ওর?

সেই মহিলা বলতেন,

-হেঁটে ফিরিস কে রে স্কুল থেকে? ইচ্ছে করে বাস ছেড়ে দিস। কেন এমন করিস?

রঘু বলত,

-এমনি. দেখতে দেখতে হাঁটি। মজা লাগে।

-এই রোদে? দুপুর বেলা?

পশ্চিমভারতের ওই নগরীতে বেলা চারটে মানে দুপুর। ভারতের বরাদ্দের প্রায় শেষ দ্রাঘিমা রেখা গেছে নগরী ছুঁয়ে। সাড়ে সাতটার আগে সন্ধে হয়না।

রঘুর জবাব,

-রোদ কোথায় আন্টি? রাস্তার দুদিকে ইম্‌লির গাছ আছে কতো!

চড্ডাআন্টি বলতেন,

-সবাই ফেরে স্কুলবাসে। তুই একা একা। এত কি দেখার আছেরে ভবঘুরে?

সে তখন বলত,

-বাদ দাও তোমার বকর বকর। মাঠে যাব। ম্যাচ আছে। সেদিন ওরা নাস্তানাবুদ করেছিল। আজ বদলা নেব আমরা। সেদিন সবাই মিলে করেছিলাম মাত্র একত্রিশ রান। আসলে ওদের সব বোলার চাকার। ঢিল ছোঁড়ে। অ্যাম্পায়ার ওদের পক্ষে। আজ পাল্টানো হবে।

আন্টির ধমক,

-খুব হয়েছে। সন্ধেবেলা আসবি তো? মনে আছে?

রঘু ভুলে গিয়েছিল। বলল,

-মনে নেই। কেন?

-বাঃ। আজ মঙ্গলবার না?

-ওহো ঠিক আছে। তুমি তৈরি করে রেখো।

চাড্ডাআন্টি প্রতি মঙ্গলবার বেসনের বরফি বানাতেন। কীভাবে বানাতেন রঘু দেখেছিল।

চকচকে পেতলের কড়ায় বিশুদ্ধ ঘি সহ বেসন ভেজে ওতে দিতেন চিনি, পেস্তা, কিসমিস, অল্প কেশরের গুড়ো , একটু জল। তারপর থালিতে ঢেলে দিতেন সব। একটু জুড়িয়ে গেলে আন্টি কিচেন নাইফে এমনভাবে কাটতেন-মনে হতে সাঁঝের বরফি। আন্টিও বাঁ-হাতে কাজ করতেন বেশি। সুডৌল ফর্সা লম্বা লম্বা আঙ্গুল।

মঙ্গালবার সন্ধের একটু পর পূজো সেরে ডাকতেন,

-সুন্ রে রঘু বেটা।

রঘু বলত,

-পুজো শেষ তোমার?

-হুঁ। এখন যা, কম্‌প্লেক্সের সব বাচ্চাদের মধ্যে বিলিয়েদে।

একদিন রঘু জিজ্ঞেস করেছিল,
-এত ছেলেমেয়ে থাকতে এ কাজ প্রতি সপ্তায় আমাকে দিয়ে করাও কেন?
আন্টি ম্লান হাসতেন। বলতেন,
-তুই যে আমার নিজের।
-নিজের?
-হ্যাঁ যা এখন। খালি জেরা।
তখন হয়তো সন্ধে আটটা। পশ্চিম ভারতে আটটা অর্থাৎ পুরোপুরি রাত হয়নি।
প্রতি মঙ্গলবার একই সময়ে রঘু ঘুরে বেড়াত বরফিভরা রেকাবি হাতে। বিলিয়ে দিত প্রত্যেককে। পেছনে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে। চুন্নি নামে একটা মেয়ে বলত,
-এ রঘু, আরো একটা দে না, প্লিজ।
রঘু আশ্বাস দিত,
-দাঁড়া। সবাইকে বিলিয়ে দিই আগে, যদি থাকে পাবি।
-না, দে এখনই।
-এখন না।
-দে, দে।
ছোঁ মেরে নিজেই রেকাবি থেকে তুলে নিয়ে ছুটে যেত চপল চুন্নি। সবাই চেঁচাত হেই, হেই।
এমনভাবে,লুটেরা, লুটে নিয়ে গেল মূল্যবান সামগ্রী সহসা।
রঘু জোরে বলত,
-রাক্ষসনি, তোর সব দাঁত ভাঙবো।
'রাক্ষসনি' চুন্নীর দাঁত কোনোদিন ভাঙা হয় না রঘুর। চুন্নি মিলমিশ করে নিত পরদিন, ওদের ফ্রিজের এক থোকা আঙুর কিম্বা লোনাভেলার চিকু দিয়ে। রঘু চিকু খেতনা। বলত,
-সো সুইট! আই ডোন্ট লাইক ইট।
দাঁত ভাঙা হবে না জেনেও চুন্নির কপট ভয়। বলত,
-প্লিজ খেয়ে নাও। পাপাজি দেওলালি গিয়েছিলেন। ফেরার পথে খোদ লোনাভেলা থেকে এনেছেন।
রঘু বলত,
-নেহি চাহিয়ে মুঝে। তু খা লে।
-রঘু সুনো।
-কী বল?
-আমার দাঁত ভাঙবে না তো?

কিছুটা রেগে রঘু বলত,

-কেড়ে কেন বরফি নিয়ে গিয়েছিলি ভুখ্‌কি?

-এ, মৈঁ ভুখকি নেহি হুঁ। এমনি মজা করছিলাম।

-এমন মজা করিস না আর। প্রসাদ সবাই খাবে।

চুন্নিও মেজাজ দেখায়,

-করব। তুমি কী করবে?

রঘুর জবাব,

-খিঁচ্‌কে মারুঙ্গা কান পটরিমে।

-মারো। ইয়ে তুমহারা খেল কা মৈদান নেহী। মারো। হিম্মত। কাম অন। হিট মি। উসদিন রজার কো মারা তুম।

কান বাড়িয়ে দেয়া চুন্নিকে মারার 'হিম্মত' হতনা রঘুর। মেয়ে তো। শুধু বলত,

-রজার কো কিঁউ মারা মালুম?

-কিঁউ?

-সেদিন চিবানো চ্যুইংগাম লাগিয়ে দিয়েছিল নেহার চুলে।

-তারপর?

- সেজন্যেই মেরেছি। নেহা কাঁদছিল। রজার বদমাশ!

-ঠিক হৈ। আর এমন করব না, তুমি দেখে নিয়ো।

চুন্নি কথা রেখেছে। পরের মঙ্গলবারে আর ছোঁ মারল না।

সব বরফি বিলিয়ে দিয়ে যখন শূন্য রেকাবি হাতে ফিরত রঘু, তখন আন্টি দাঁড়িয়ে আছেন কোয়ার্টারের বারান্দায়। বারান্দায় আলো, বাহারি ফুলের ঝুলন্ত টব। নানান গাছ। পিঞ্জরায় টিয়ার ক্যাকাস ক্যাকাস ডাক।

সবকিছুর মাঝখানে মিলিমিশে দাঁড়িয়ে-থাকা দীর্ঘাঙ্গী লালচে টানটান চেহারা ছবির আন্টিকে মানবীর চেয়েও অন্যকিছু মনে হত রঘুর। কেমন মনে হত তখন বুঝতনা। মুখে হাল্কা বিষণ্ন হাসি আন্টির।কেন যে এমন হাসি, বুঝত না কোনোমতেই।

গেট খুলে সুরকি বিছানো পথে যখন এগোত বারান্দার দিকে, ম্রিয়মাণ আন্টি বলতেন,

সারাদিন উপোস করা ক্ষীণ গলায়,

-এলি?

-ইয়াহ্‌।

- তুই খেয়েছিস?

-নো ম্যাম।

-কেন রে?

-থাকলে তো খাব।

-তোর জন্যে রাখিসনি?

-সব ফুরিয়ে গেল তো। সবাই বেশি বেশি চায়। আসছে মঙ্গলবারে বেশি করে দিয়ো। একটা দিলে কেউ মানে না। চুন্নিটা স্ন্যাচ করে নেয়।

আন্টি স্মিত হেসে বলতেন,

-নিক। সামনের সপ্তায় আরো বেশি বানাব। ভেতরে আয়।

-না গো।

-কেনরে?

-পড়তে বসব। তুমিই আবার চেঁচাবে, পড়া নেই শোনা নেই। পাথর ভেঙে খাবি ভবিষ্যতে।

রেকাবি আন্টির হাতে দিয়ে রঘু এগোয় নিজেদের শূন্য কোয়ার্টারে। ওখানে কাজের একজন লোক ছাড়া কেউ নেই। বাবা ট্যুরে। মা আর নেই কয়েকমাস হল। পাহাড়ি নদীর পারে, নিরিবিলি অনেক অজস্র জ্বলন্ত চাঁপাফুল মাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে সেই কবে। চিতার আগুনকে জ্বলজ্বলে চাঁপাফুল মনে হয়েছিল সেদিন রঘুর।

রঘু ফিরে যাচ্ছে। আন্টি বললেন,

-রঘু।

-কী বলছ?

-বইপত্র সব নিয়ে আয়। এখানে পড়বি। আবার বানাবো বরফি তোর জন্যে। তাড়াতাড়ি যা।

একটু চিন্তা করে রঘু বলল,

-তুমি পড়াবে?

-কেন জিজ্ঞেস করছিস?

- তুমি অঙ্ক ভালো পারো না গো।

- তা পারি না। ইংলিশ হিন্দি পড়াব।

রঘু চটায়। বলল,

-পারবে?

আন্টি বললেন,

-মার খাবি। বাঁদর ছেলে। তাড়াতাড়ি যা।

রঘু জানত, আন্টি শ্রীনগরের মেয়ে। আসলে উনি কাশ্মিরি। আঙ্কল পাঞ্জাবি। দুজনে একসাথে পড়তেন শ্রীনগর কলেজে। আন্টি ইন্টার করেছিলেন ওখানে। তারপর বিয়ে হয়। ফিরোজপুরে ওঁর সসুরাল, বিয়ে হয়েছে দশবছর। এখনো কোল শূন্য।

মাঝেমাঝে রঘু এমনি চটায়,

-তুমি পারবে না গো।

-ক পারব না রে ছুচুন্দর?

-আমাদের লেসন্‌স্‌।
-কেন?
-ভেরি টাফ্‌, ইউনো?
-উল্লুক! দুএকটা কালা অক্ষর আমার পেটেও আছে।
-তা আছে। কিন্তু সব ডাইজেস্ট করে ফেলেছ এতোদিনে। সেদিন আঙ্কল পাশেই ছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছেন,
- ওয়েল সেইড রঘুনাথ।
-থ্যাঙ্কু স্যার। থ্যাঙ্কু ম্যাডাম।

আন্টি চটতেন ভীষণ। লাল বেলুনে দুধভরলে যেমন রং তেমন গাত্রবর্ণ ওঁর। তেতে উঠলে আরো লাল। বলতেন জোরে,

-এই বেয়াদপ, আমাকে থ্যাঙ্কু কেনরে ফাজিল?
-কাকে বলবো আর?
-মারুঙ্গি থাপ্পড়, বদমাশ!
-মেরো। আগে বলো, সত্যি বলিনি?
- কী সত্যি?
-অ্যারিথমেটিক্সের প্লেস ভ্যালু এখনো জাননা তুমি। এককোটিতে ক-টা শূন্য বসাতে হয়, চট্‌পট্‌ বলতে পারবে?

রুটি বেলার বেলান্‌ তুলতেন আন্টি। রঘু হাত জোড় করে সুলাহ করতে চাইত। হয়তো বলত,

-কুল ডাউন ম্যাম। মজা বোঝো না কেন?

আন্টি বলতেন,

-যে নিজের মাদার টাং জানেনা, সে আবার বড়ো বড়ো কথা বলে কোন মুখে? আমি কি তোর মতো? কাশ্মীরিপুরো জানি। পাঞ্জাবি হিন্দি, উর্দু, ইংলিশ জানি। তুই কী জানিসরে?

আন্টি লক্ষ করেননি। রঘু আনমনা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

রঘুর চোখে মুখে একটু আগের চাপল্য ও সরল দুস্টুমির বিন্দুমাত্র নেই। মাথা নিচু করে বসে আছে একমনে।

আন্টি বললেন,

-কী হয়েছে রে রঘুরাজ?

ওর গলায় অপার মায়া। আবার বললেন,

রঘু বেটা কী ভাবছিস?

রঘু মাথা নাড়ে নিঃশব্দে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। এমন দীর্ঘশ্বাস,যা রঘুর বয়সের পক্ষে একটু ভার, তেমনি মনে হয় অন্টির। রঘুর পাশে বসে ওর পিঠে হাত রাখেন। বলেন,

- বলনা, হঠাৎ কী হল?

রঘু মুখ তোলে। চোখ ছলছল। বলল,

-আন্টি।

গলা বসে যায়। তবু বলল,

-মা শেখাতেন।

-কী?

- মাদার টাং। নাউ শি ইজ নো মোর।

রঘুর দুচোখে জল গড়ায়। আন্টি জোরে ডাকেন,

-রঘু বেটা!

তারপর প্রবল আকর্ষণে টেনে নেন রঘুর কৃষ্ণবর্ণ মুখ নিজের বুকে।

চাড্ডা আন্টির বুকে মুখ রেখে নিঃশব্দে ফোঁপানো রঘু বুঝিয়ে দেয়, কেন মাদার টাং পুরোপুরি শেখা হল না আজো।

আন্টি বললেন,

-কে বলে তোর মা নেই। আমি আছি না? আমি আছি বেটা। কাঁদিস না। তুই কাঁদলে আমারো কান্না পায় রে!

যেন বহুপরিচিত বিশাল প্রান্তর, এক শান্ত পাহাড়ের কোলে মোহময় আলোয় ভরা চাড্ডা আন্টির মানবীয় বক্ষ। যার উষ্ণতায় রঘুর বিষাদতপ্ত মুখ। উনি হাত বুলোন ওর চুলে। সুতরাং রঘুর চোখের জলে আন্টির গলাও বুক ভেজে। রঘুর মাথা ভেজে ওঁর চোখের জলে।

দুহাতে চোটেয় রঘুর মুখ তুলে উনি দেখেন রঘুর মুখ চোখ। অবর্ণনীয় মায়া ও ওথলায়।

বলেন স্তিমিত স্বরে,

-হিন্দুস্থানকার হর ভাষা তেরা মাতৃভাষা হৈ আজ সে। তু রোতা কিঁউ রে!

তারপর দোপাট্টায় চোখ মুছে দিতেন রঘুর। নিজেও মোছেন। বলেন,

-যা। বইপত্র নিয়ে বোস। আমি বরফি বানাব আবার। রাতে এখানেই থাকবি আমার কাছে।

এভাবেই চলত দিনের পর দিন। প্রতি মঙ্গলবার ওঁর ব্রত। রঘুর হাতে সব বাচ্চাদের প্রসাদ বিলানো শূন্য, রেকাবি হাতে বিরসমুখে রঘুর যথারীতি ফিরে আসা। উনি আবার বানাতেন রঘুর বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি, কেবল ওর জন্যেই।

রঘু হয়তো হিন্দি কবিতা পড়ত জোরে জোরে—আন্টি পড়াতেন।

কোনোদিন পড়াতেন মুন্সি প্রেমচন্দ। পড়াতেন 'কাপ্তান সাহাব' ফাতিহা, কিম্বা প্রেমচন্দ্রের বিখ্যাত গল্প 'মন্ত্র'।

গল্পটা যখন আন্টি পড়াতেন বড়ো কষ্ট হত রঘুর। ঐ গল্পে ছিল-এক বৃদ্ধ বৃদ্ধা

বিনিদ্র শীতের রাত কাটায়। ওদের একমাত্র সন্তান মারা গেছে অনেক আগে। টাকা পয়সা নেই বলে এক ডাক্তার চিকিৎসা করেনি।

একদিন সেই ডাক্তারের ছেলেকে কামড়াল বিষধর সাপ। সেই বৃদ্ধ গেল নির্মম ডাক্তারের বাড়ি। বৃদ্ধ নিজের মৃত ছেলেকে যেন খুঁজে পেল সর্পদংশানো ডাক্তারের ছেলের মধ্যে। ঝাঁড়ফুঁক করল। মন্ত্র-টন্ত্র তুকতাক জানত সে।

ভোর ভোর সময়ে যখন ছেলের জ্ঞান ফিরে আসছে, তখন কাউকে কিছু না বলে একা বেরিয়ে গেল বৃদ্ধ, অন্ধকারে।

ডাক্তার ছেলেকে বাঁচানোর মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা দিতে চায়। কিন্তু কাকে দেবে? মন্ত্রসিদ্ধ সন্তানহারা বৃদ্ধ তখন লাপাতা।

এমনই গল্পটা। আন্টি বলতেন এমনভাবে যেন চোখের সামনে ভাসছে সব দৃশ্য। তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিত রঘু, বড়ো হয়ে এই গল্পটা নিয়ে ফিল্ম বানাবো। মাত্র একটা গান দেবে এত গানটা গাইবেন মুকেশ। আর বৃদ্ধের চরিত্রে নেব বলরাজ সাহনিকে।

পড়াতে পড়াতে আন্টির চোখ চিকাচিক করত। বলতেন,

-জানিস রঘু?

- বলো।

- এ গল্প কতবার পড়লাম জানিস?

- কতবার।

- অনেকবার। আরো একটা গল্প অনেকবার পড়েছি। কোনটা জানিস?

-কোনটা?

- মহেশ। শরৎচন্দ্রের। হিন্দি অনুবাদ পড়েছিলাম। পড়ে মনে হতো-হৈ রব্বা, আমাকে আমিনা করে দাও। খেতের সব পোয়াল মহেশকে দিয়ে দিতাম। মহেশকে অভুক্ত রাখতাম না কোনোদিন।

রঘু বলত,

-আমি পড়িনি গো। কোথায় পাওয়া যাবে। কাশ্মীরি গল্প?

-নারে। বাংলা। শরৎচন্দ্র। মহান লেখক আমাদের দেশের।

- কোথায় থাকেন?

- এখন তো বেঁচে নেই উনি। কলকতায় থাকতেন বোধহয়। বড়ো হয়ে তুইও পড়বি।

রাতে আন্টির কাছে ঘুমোত রঘু। আন্টি ওকে শুতে দিতেন দেয়ালের পাশে। নিজে বিছানার খোলা দিকে। রঘু বলত,

- আমি এদিকে কেন?

উনি বলতেন,

- রাতে ঘুমের ঘোরে গড়াগড়ি দিস তো। পড়ে যাবি। ঘুমো তাড়াতাড়ি। সকালে স্কুল আছে

না? তোর যোশি ম্যাডাম আবার ক্যানিং করবেন। নিলডাউন করাবেন।
-নো আন্টি। ডোন্ট ওরি। কালকের সব টাস্ক্ রেডি।

আন্টি বলতেন,

- তা বলছি না। এখন না ঘুমোলে কাল ক্লাসে ঝিমোবি।
- না গো। কম ঘুমোলে আমার কিচ্ছু হয় না, কতোরাত আমি ঘুমোই না।

রঘুর কোমরে আন্টি দিঘল হাতের বেড় এলিয়ে দিয়ে বলতেন,

-ঠিক আছে। ঠিক আছে। ঘুমো এবার।
-ঘুম আসে না গো।
-কেন? ক-টা বাজে দেখেছিস?

রঘু বলত,

-আমার বয়স যতো ঠিক তত। বারোটা

আন্টি বলতেন,

-তোর আঙ্কলের নাক কেমন মেশিন গানের মতো ডাকছে শোন।

একটু হেসে রঘু বলত,

- তোমারো হয় একটু একটু।

আন্টির সলজ্জ জবাব,

-ধুর । আমার নাক ডাকে না কখনো।
-ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী করে বোঝ তোমার নাক ডাকে না?

আন্টি জোর দিয়ে বলেন,

-আমি জানি।
- না গো, কদিন আগে একটু একটু শব্দ হচ্ছিল।
-কোনদিন রে?
-ঐ তো ,আঙ্কল যেদিন আহমদনগর গেলেন ট্যুরে। সেদিন আমি ছিলাম তো তোমার কাছে। শুনেছি।
- ওহো। সেদিন জুকাম ছিলো দেখিসনি? নাক বন্ধ। ডাকবেই তো।

রঘু বলল,

- তা ঠিক। একটা অজুহাত তোমার আছেই। আসলে এমনি নাক ডাকে তোমার।
- ডাকুক। তোর কী? ফাজিল ছেলে।

রঘুর কোমরে এলানো আন্টির নরম হাত। হাতের সব আঙুল রঘু অলস নাড়াচাড়া করতে করতে আবার ডাকে,

- ওগো মিসেস চাড্ডা।
- কী হল আবার? ডাকছিস কেন?

- একটা কথা জিজ্ঞেস করি?
-এত রাতে আবার কী কথা?
-অ্যা সিম্পল কোশ্চেন মাই ডিয়ার।
আন্টি বললেন,
- পড়ার প্রশ্ন হলে এখন না। সকালে।
-পড়ার প্রশ্ন তোমাকে করে লাভ নেই।
- কেন?
- তুমি পারবে না।

হাল্কা থাপ্পড় মারলেন আন্টি রঘুর পিঠে। বললেন,

- আমি তো তোর কাছে মূর্খ। ভালো।

রঘু আন্টির কপট অভিমান তরল করতে চায়। ওঁর কটা আঙুল জোরে জড়িয়ে ধরে বলল,

ইউ আর গ্রেট!

আন্টির তখনো অভিমান। বললেন,

- না আমিতো গন্ডমূর্খ। বই কি বস্তু জানিই না।
- শোনো না গো।
- কী শুনব? বল তাড়াতাড়ি। পড়ার হলে এখন না।
- বললাম তো, পড়ার না, মাইডিয়ার সুইট লেডি।
- তো কী?

একটু দম নিল রঘু। বাইরে, দূরের পাকা পথে, তখন একলা টাঙ্গা ছুটে যাচ্ছে, সাংলিগাঁওর দিকে, এই মাঝরাতে। ঘোড়ার গলায় ঘুংগুর ও খুরের শব্দ স্পষ্ট ভেসে আসছে এখানে ঝনর্-ঝনর্ টপক্ টপক্। কে যায় এই রাতে কে জানে।

এমন শব্দ মুখ দিয়ে প্রায়ই তোলে রঘু। বিট্ ও রিদ্‌ম্ খুঁজে পায়। ভাবে, ফিল্ম বানালে এমন এক দৃশ্য রাখবই। দূরের এক পথ ধরে মাত্র দুজন সোয়ারি নিয়ে টাঙ্গা ছুটে যায় ধুলো উড়িয়ে। সূর্য ডুবছে। যে কোনো একটা ভালো গান ব্যাকগ্রাইন্ডে ফিট্ করতে হবে এই দৃশ্যে-হেমন্ত কুমারের। হাল্কা ভাসা-ভাসা।

তারপর খুরের শব্দসহ ঘোড়াও টাঙ্গা মিলিয়ে যাবে দূর, অনেক দূর। দূর ও দূরত্ব বড়ো টানে, কষ্ট ও দেয়, মন কেমন করে। তবু এমন দৃশ্য ফিল্মে থাকবেই। কোন ফিল্মে কেন এবং কীভাবে দৃশ্যটা বসাবে, এখনই সিদ্ধান্ত নেয় না রঘু।

আন্টি বললেন,

-আবার কী ভাবছিস রে মনমৌজি? কী প্রশ্ন তোর?

খণ্ডিত ফিল্ম বানানো শেষ। রঘু পাশ ফেরে। এবার আন্টি রঘু মুখোমুখি। রঘুর

চোখ খোলা। ওর বন্ধ। মুখের ক্রিম এখন চকচকে মসৃণ ত্বকে। হাল্কা মিষ্টি গন্ধ।

বেশ কয়েকটা চুল আন্টির কপালে। রঘু সরিয়ে দিলো কানের পাশে।

উনি বললেন,

- কী কথা, বলবি তো? আমার ঘুম পাচ্ছেরে। তোর মতো উল্লু নই যে সারারাত জেগে থাকব।

কিছুসময় নৈঃশব্দ। একসময় রঘু ডাকে,

-আন্টি।

-বল না রে বাবা।

-তুমি তো কাশ্মীরি, তাই না?

-হ্যাঁ।

-আর আঙ্কল পাঞ্জাবি?

এবার চোখ খুললেন আন্টি। এই বালকের সান্নিধ্যে ও প্রশ্নে রক্তিম হওয়ার কোনো অবকাশ নেই, তবু, আরো একটু রক্তবর্ণ হলেন। হাসলেন স্মিত। বললেন,

-তাতে কী হল, মেরে বাপ?

রঘু আবার পাশ ফেরে। বলল,

-না, কিচ্ছু না। ঠিক আছে।

আন্টি ডাকলেন,

-রঘু।

-জি আন্টি?

-তোরও হবে।

-কী?

-কী আবার। যা হবার , তা হবে।

রঘু বলল,

-কী যা হবার?

আরো হাসলেন আন্টি। যেন নিজের বিগত দিনের কথা বলছেন, তেমনই সলাজ কণ্ঠে প্রায় ফিসফিস স্বরে বললেন,

-নেহা তো ইউপি-র, তুই বঙ্গালের।

-কী বলছ গো মিসেস চাড্ডা?

আবার হাল্কা থাপ্পড় মারলেন রঘুর পিঠে। বললেন নিজের মনেই যেন,

-কখন যে মাথায় কী আসে দ্যাখো! এক আকাশ চিন্তা নিয়ে দিক-বিদিক ঘোরে। মাঝরাতে হিসেব করছে কে কাশ্মীরি কে পাঞ্জাবি। তুই এমন কেন রে? বাঁদর কোথাকার। ঘুমো।

কোনো কথা বলেনা রঘু। আন্টি ডাকেন,

-রঘু।
-কী হল? ঘুমোও। এত বকবক কেন?
-বাপরে। এখন আমাকে ধমকায়!
-বলো কী বলবে?
আন্টি বললেন,
-আমি করাব।
-কী করাবে?
-ইউপি-র সাথে বঙ্গালের।
-কী বলছ?
-যখন করাব, তখন বুঝবি। আমি তোর মা নই?

রঘু তেমন কিছু বুঝল না। কিন্তু অনেক কিছু যেন বোঝা হয়ে গেছে তেমনি বিজ্ঞের মতো বলল,

-ঠিক আছে, ঠিক আছে। সময় হলে করাবে। তুমিও আমার মা, সে আমি জানি।
-আমি তো তাই বললাম রে।
-কী বললে?
-লেখাপড়া মন দিয়ে কর বাবা। বইপত্র খুলিসই না।

রঘু চটে যায়। বলল,

-আর কত করব? বইগুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলব নাকি? পড়ছি তবু তোমার নজরে পড়ে না।

আন্টি বললেন,

-একদম না। একটা ঘণ্টা পুরো পড়িসনা। সারাদিন সাইকেল, খেলা, ঘোরাঘুরি। স্কুলে যাস শয়তানি করতে। ভবিষ্যতে পাথর ভাঙবি।

রঘুর উৎসাহ। বলল,

-ভালো হবে।
- আমার যে ভালো লাগবে না রে।
-কেন লাগবে না ম্যাম?
-কী করে লাগবে বল?

রঘু বলল,

-সবাই শিক্ষিত হলে কী চলে?

আন্টি অবাক। বললেন,

-মানে?
-মুর্খরা মজাসে আছে, জান?

-কী বলে রে? মূর্খের কী মজা দেখলি?
এবার বেশ জোরেই হাসলো রঘু।
বলল,
-ভুলটুল করো মজাসে। কেউ কিছু বললে সোজা বলে দাও-মাফ করনা, মৈঁ মুরখ্ হুঁ!
এবার জোরে থাপ্পড় মারলেন আন্টি রঘুর গালে। ও বলল,
-উফ! এত জোরে মারো কেন? লোহার গাল পেয়েছ?
-আরো মারব।
-মারবে?
-একশোবার মারব। তুই মূর্খ হলে আমার কী হবে?
রঘু বলল,
-আমি মূর্খ হলে তোমার কি হবে?
-মা শিক্ষিতা। ছেলে লেখাপড়া জানেনা। লোকে বলবে এসব। শুনে কার ভালো লাগবে?
রঘু দিকভ্রান্ত হয়। বলল,
-তখন মার কথা কেউ মনেই রাখবে না। এখনো বছর হয়নি। আমি ছাড়া অনেকেই ওঁর কথা ভুলে গেছে।
রঘুর গলারস্বর সিসার মতো ভার সহসা।
রঘুর দিকভ্রান্তি টের পান আন্টি। ওকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেন নিজের উষ্ণ বুকে। বললেন,
-হাজার মায়ের মধ্যেই নিজের মাকেও খুঁজে পাওয়া যায়রে রঘু।
রঘু বলল,
-জি?
-ঘুমো। অন্যদিন বুঝিয়ে বলব। কত রাত হল দেখেছিস? একটুপরই কাক ডাকবে।
আর এভাবেই , সেই নদীর পারের তপ্ত শিখার জ্বলন থেকে এক ছন্নছাড়া বালককে উদ্ধার করে শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিতে সচেষ্ট হন, অনেকদূর কাশ্মীর ভ্যালির রক্ষা কার্লোপিয়া-যাঁর বিবাহোত্তর নাম রক্ষা চাড্ডা। যাঁর প্রসারিত ডানার তলায় পাখির বিপন্ন ছানার মতো, দাবানলে পালক পুড়ে যাওয়া রঘু এক অমূল্য উষ্ণতা খুঁজে পায়। যে উষ্ণতা কোনো আগুন থেকে উত্থিত নয়। এ উষ্ণতা এমন নিরিবিলি মানবিক যজ্ঞের আগুন, যে যজ্ঞ হয় এক নারীর গোপন অন্তরে মমতায়, বাৎসল্যে। অত ত্রব এই আগুনে দহনের তাপ নেই, কবোষ্ণ মায়া ছাড়া। আর এই উত্তাপ জনিত মায়ার ভীষণ প্রয়োজন আপামর মানুষের। রঘুও মানুষ, সংবেদনশীল এক বালক। তার বড়ো প্রয়োজন আন্টিকে।
একসময় শ্রান্ত, স্মৃতিতাড়িত রঘু ভেজা চোখেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয় আন্টির কোমল শরীর আঁকড়ে, এমনভাবে যেন শিশু তার শেষ অবলম্বন কোনোমতেই আর না

হারায়, এ আশঙ্কায়।

তবু হারায় সে। হারাতে হারাতেই জীবনের কিছু মহার্ঘ সঞ্চয় সঞ্চিত করে এক বেতালা বালক। যে সঞ্চয় পড়ে থাকে সংগোপনে আনাচে-কানাচে সবার অলক্ষ্যে।

বালক লক্ষ্যভেদী নয় মোটেই। প্রয়াসও নেই কোনো লক্ষ্যের। তবু লক্ষ্যে পৌঁছে যায় আবার কোনোদিন অন্যকোনোখানে, কোনো-কোনো মানুষের মনের উপান্তে।

এভাবেই অমোঘ এক নদী বয়ে যায় অনেক জনপদ, প্রান্তর, পেরিয়ে, আবর্তিত হয়ে আরো দূর বহুদূর ছুটে যায়, আর এই ছুটে যাওয়াই জীবন। মানুষের জীবনই যার ভিন্ন এক প্রতিশব্দ নিজে নিজে পড়ে নেয় বালক, নদী! উদাস উদাম, স্মৃতিজর্জর কলকল নদী।

হাল্কা ভাসা-ভাসা অবোধ অবুঝ, অথচ তীব্র সংবেদনশীল রঘু টের পায় একটা জীবন অতিক্রান্ত করতে হলে ছোটো বড়ো অনেক নদী পেরিয়ে যেতে হয়। সকল নদীর জল প্রভাবিত করে মানুষের জীবন। যেমন শরীরের রক্তমজ্জা প্রভাবিত করে এই দেহ। এতসব তৎক্ষণাৎ বোঝেনা বালক রঘু। বুঝে নেয় পরপর, যত বড়ো হয়, তত।

যখন প্রকৃতই বড়ো হয়, তখন সেই চাড্ডা আন্টি অনেকদূর। নেহা অনেকদূর। কোথায়? রানিখেত। আঙ্কল বদলি হয়ে গেছেন। আর নেহা ওর মাকে নিয়ে এটাওয়া। আর কোনোদিন কারো সাথে দেখা হয়নি এরপর।

নেহার বাবা হরিয়ে গিয়েছিলেন বাষট্টির সেই হৃদয়মোচড়ানো অসম যুদ্ধে। যে যুদ্ধে বিপন্ন ভারতীয় সেনা আপ্রাণ লড়েছিল ভীষণ ধড়িবাজ চিনা সৈন্যের বিরুদ্ধে নেফা আর লাদাখের বুকের রক্ত বরফ করে দেয়া ঠান্ডায়, সোয়েটার গায়ে। অস্ত্র বলতে কাঠের বাঁট থ্রি নট থ্রি। যার কারণ ক্ষেত্রে মাত্র তিনশগজ। আর চিনারা দুমাইল দূর, উপর থেকে চালায় স্বয়ংক্রিয় এস এল আর।

কী করবেন নেহার বাবার মতো অসহায় ভারতীয় ফৌজ?

নেহার বাবা, রঘুর প্রিয় রিতমজি, একজন দক্ষ গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, হারিয়ে যান লাদাখের বরফের মরুভূমিতে। আর ফেরেনি কোনোদিন।

কিন্তু রিতমজির বন্টিত কিছু ধন সঞ্চয় করে রেখেছে রঘু। মাঝেমাঝে উল্টেপাল্টে দেখে। এ এমন ধন,যে ধন চুরি হয় না। খোয়া যায় না। কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

কেবল বুকের গভীরে নিজস্ব অধিকোষে সঞ্চিত হয়, বর্দ্ধিত হয় পাহাড়প্রমাণ অনাবিল সুদসহ। যে সঞ্চয় নিঃস্ব রঘুকে কাঙাল হতে দেয়না, বরঞ্চ ধনী করে।

স্মৃতির ধন, স্মৃতিরই ধন-যতোই বেদনা ও বিয়োগ খণ্ড-বিখণ্ড করুক। রিতমজি এমনি এক মহামূল্যবান স্মৃতি রঘুর কাছে।

এইসব অপার্থিব ধন নিয়ে বছরের পর বছর ভারতবর্ষ নামক এক পেনিনসুলার কোথায় কোথায় ছিটকে যায়, অথবা ওকে ছিটকে দেয়া হয়। যেমন, এখানে এখন।

আবার এখানেও সব হারাতে হবে, জানে রঘু। এখন তো আর নিছক বালক নয়।

যৌবনে পা দিয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। উনিশ বছর এখন। বোধ বেড়েছে। অনেক মোহের ভিড়ে নিজের সম্পর্কে নির্মোহ হয়েছে। কিম্বা নিজের প্রতি অন্তর্লীন মোহ এত বেড়েছে বলেই বহিরঙ্গের নির্লিপ্তি বেড়েছে।

সেই রিতমজির মেয়ে নেহা। একই বয়স, একই ক্লাস, একই স্কুল। শান্তসুন্দর ধীরস্থির মেয়ে। কথা বলে আস্তে, প্রায় শোনাই যায় না।
বারো বছর বয়সেই মুখে যত কথা বলে, এর চেয়ে অনেক বেশি কথা চোখের ভাষায়।

টিফিনে একই আইসক্রিম ভাগাভাগি করে খায় দুজনে।

আইসক্রিম কিনে ডাকত নেহা জোরে ,

-রঘু কাম হিয়ার।

রঘু হয়তো বাদাম চিবোচ্ছে ,বলত,

-হোয়াট হ্যাপেন্ড?

-মধুকর-স মিল্ক আইসক্রিম। কাম। কুইক।

রঘু এগিয়ে যেত। বলত,

-ওনলি ওয়ান?

- নো মোর পৈসা টু-ডে। সো ওনালি ওয়ান। লেট আস্ শেয়ার। কুইক। ইট ইজ মেল্টিং। কামঅন।

বলেই নেহা কাঠিতে ধরা আইসক্রিম এগিয়ে দিত রঘুর দিকে। রঘু এক চোষা দিতেই নেহা নিত নিজের মুখে। এক চোষা সে-ও দিত। আবার এগিয়ে দিত রঘুর মুখে।

রঘু বলত,

-নো।

-হোয়াট হ্যাপেন্ড?

সংবেদনশীল বালিকা বুঝত-কী হয়েছে। দাঁত দেখিয়ে বলত,

-লুক। মাই টিথ্ আর ক্লিন। কাম-অন। টেকইট।

নেহার ঠোঁটের ফাঁকে শাদা ঝকঝকে মুক্তো দেখেও রঘুর দ্বিধা। তখন নেহা বলত,

-ঠিক আছে। আগে তুমি খাও। পরে বাকিটা আমি খাব।

আইসক্রিম গলে গলে কাঠি তখন খুলে গেছে। একে তো গ্রীষ্মকাল এর উপর পুনার শুকনো লু-সদৃশ হাওয়া।

নেহার ডানহাতের চেটোয় তখন দুধ-দুধ আইসক্রিম। নেহার তাড়া

-কী হল? খাও আগে। সব গলে যাচ্ছে যে!

আইসক্রিমসহ নেহার চেটো রঘুর মুখের সামনে। রঘু চাটছে ধরে রাখা আইসক্রিম। নেহা দেখছে। কিছুটা খাওয়ার পর রঘু বলল,

-তুমি খেয়ে নাও বাকিটা।

নেহা নির্দ্বিধায় খায়। বলে, -দ্যাখো, আমি তো ঘেন্না করি না তোমার মতো।

রঘু বলত,

- করবে কেন? আমার দাঁত পরিষ্কার।

খেতে খেতে নেহা বলত,

- আমারো। দিনে তিনবার মাজি।

একসময় ওর ফর্সা চেটো শূন্য হয়ে যেত। নেহা হাত ধুতে ছুটে যেত কলে।

আর এভাবেই বারো-সাড়ে বারোর দুই বালক -বালিকা গাঁথুনি দিচ্ছিল এমন এক মানবিক সম্পর্কের, যে বাঁধনকে কেউ কেউ বলে– এভাবেই তো রচিত হয় জন্ম জন্মান্তরের টান, সান্নিধ্য।

কিন্তু একদিন সব ভুল প্রমাণিত হয়। জীবন নামক এক অমোঘ কম্পাস সব স্থিতিহীন করে দেয়। প্রীতমজি হারিয়ে যান লাদাখের জমাট তুষারে। নেহাকে চলে যেতে হয় অনেক দূর এটাওয়ায় ওর মা-সহ একদিন। রঘুর অনেককিছু পূর্ণ হয়েও শূন্য হয়ে যায়।

রঘুর আজো মনে পড়ে-পুনা রেলস্টেশনের নেহা আর ভার্গব আন্টিকে তুলে দিতে গিয়েছিল সে। সঙ্গে আরো অনেকজন ছিলেন। নেহার মা ওকে জড়িয়ে ধরে হা হা শব্দে বড়ো কেঁদেছিলেন লোকারণ্য প্ল্যাটফর্মে। শাদা ফ্রকপরা বিষণ্ণ নেহা দাঁড়িয়েছিল কামরার দরজায়।

বেল পড়ল ট্রেন ছাড়ার। ইলেকট্রিক লোকামেটিভ সব কামরা টেনে ছুটল দাদরের দিকে।

নেহা তখন জানালায়। ট্রেন এগিয়ে গেছে বেশ দূর।

তবু সেই বালিকার দিঘির মতো সজল চোখের কিছু শব্দাবলি পড়ে নেয় রঘু ভিড় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। নেহার দুটো চোখ রঘুকে স্পষ্ট বলে দেয়,

- কোনোদিন একা একা আইসক্রিম খেয়োনা রঘু। তুমি ছাড়া আমিও আর খাবনা। যদি আমায় লুকিয়ে খাও, আমি ঠিক বুঝে নেব। তখন আমার কষ্ট হবে। মনে রেখো।

ট্রেন, নেহাসহ অনেকদূর সরে যায়। নেহার বিলিয়ে দেওয়া দাবিসহ পুনার জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে রঘু আরো একা হয়। এক বালক, স্মৃতি ও বিষণ্ণতার ভাষা আরো গভীরভাবে বুঝে নেয়।

নদী আবার অন্য নদীর আশায় বইতে থাকে। দিন যায়। বছর যায়।

এরপর থেকে রঘু আজ অবধি কোনোদিন আইসক্রিম খায়নি। এখনো খায় না। কোনোদিন খাবে না। পিপাসায় বুক চৌচির হলেও শুধু তাকায় ঐ জমাট বরফখণ্ডের দিকে। কী ভাবে খাবে? খাওয়া কি যায় আর?

নেহার চেটোবিহীন পৃথিবীর কোনো আইসক্রিম মানায়-ই না, খাওয়া তো দূর।

এমন করেই রঘুর রিক্ততার সঞ্চয় বাড়ে দিনদিন। যে সঞ্চয় কাউকে বিলানো যায়

না। গুছিয়ে বলা যায়না। একা একা বুকে বয়ে বেড়াতে হয় কেবল। আর বইতে হয় বলেই অস্থির হয়ে যায় একেকসময় ।এদিক-ওদিক ছোটে, ঘুরে বেড়ায় লক্ষ্যবিহীন। তাই, বোধহয় এই চাচিজি বলেন,

-এ সরফিরা, তেরা দিমাক কাঁহা

কেন বলেন হিমানী এমন, রঘু জানে। কিন্তু বলেনা কিছুই।

ফিয়র্ডের আনাচে কানাচে সাগরের নোনাজল যেমন পড়েথাকে, তেমনি বুকের অলিতে গলিতে বারবার চাড্ডা আন্টিও নেহার ছিটানো জলোচ্ছ্বাস তিরতির ঢেউ প্রতিপালিত হয় দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

আর এই জলের প্রবাহ ধরে নতুন এক তরণীর মতো আবার ভেসে আসে অন্য কেউ, হিমানীজি।

এই হিমানীজি খরস্রোতা নদীর তীরের পনঘট (জল ভরার ঘাট) না মরুদ্যান? রঘুর মনে হয় হয়তো একসাথে দুটোই।

তাই আজ বা এখন, কেবল দুহাতে নয়, দশহাতে হিমানীজির মার খেতে আপত্তি নেই রঘুর।

আলনা পরিপাটি করছেন হিমানী এখনো। উঠোনে মেলে দেয়া সব লংকা হাওয়ায় উড়ে গেল কিনা এখনো দেখা হল না ওঁর।

রঘু ডিভানে কাত। সামনে খোলা ম্যাগ্‌জিন, ধর্মযুগ। এতোক্ষণ কিছুই পড়েনি স্বভাবতই।

অনেকদূরের পেছনের-কিছুটা পথ হেঁটে আবার ফিরে এলো রঘু এইমাত্র হিমানী ঝার কক্ষে।

রঘু টের পায়নি—হিমানীর তীক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে কিছুই এড়ায়না। বললেন,

- কোথায় হারিয়ে গেছিস তুই?

- কোথাও না।

- না না। আমি জানি কোথায় ছিলি তুই এতোক্ষণ।

- কোথায়?

- পেছনের দিনগুলোর কথা ভাবছিলি তুই।

- কী! আপনি কী করে বুঝলেন?

-ঠিক বলছি তো? তোর দুটো চোখ বলে দিচ্ছে।

রঘু বলল,

-থটরিডার।

হিমানী বললেন,

-স্বীকার করছিস?

- কী?
- তোর এ টি মেল পেছনে দৌড়াচ্ছে।

হাসল রঘু। কিছুই বললনা। স্যার এখনো ঘুমে। ঘর শান্ত, পাখার বাতাস ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। হিমানী বললেন,
- একটু আসছি। দেখি উঠোনে লছমতিয়া কী করছে। তুই বিশ্রাম কর। তোর স্যার জাগলে দুজনকে একসাথে চা দেব। বোস তুই।

রঘু বলল
- চা খাব না।

হিমানী বললেন,
ভালো চারে। দার্জিলিং টি।
- না, খাবোনা।

হিমানী ক্ষুণ্ণ হলেন,
- কী খাবি তবে?
- কিচ্ছু না।
- তাড়ি খাবি?
- কী?
- তোর স্যার এ-ও বলেছেন।
- কী বলেছেন?
- চামার বস্তিতে রোজ সন্ধেয় যাস তুই তাড়ি গিলতে। নোংরা ছেলে। ছিঃ!

বলেই চলে গেলেন করিডোরে। রঘু ভেবে কুলকিনারা পেলনা স্যার কী করে জানলেন ওখানে মাঝে মাঝে যায় তাড়ি খেতে।

ওই বস্তিতে বড়ো প্যারা এক 'দোস্ত' আছে। প্রায় সমবয়স্ক। চৌথিবর্গ (ক্লাশ ফোর) ফেল, ওরই মতো কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়া চুল, ফৌলাদি শরীর, থ্যাবড়া মুখ। অন্তর গঙ্গাজলের মতো সাফ এক চামার যুবক-ভাঙ্গাড়ু। রঘুর আরো এক সবুজ দ্বীপ।

যে ভাঙ্গাড়ুর মনের ঔদার্য আকাশের ব্যপ্তিকেও লজ্জিত করে।

যে, বড়ো কষ্টে সঞ্চিত নিজের সাড়ে তিনটাকা দিয়ে বলতে পারে,
- আপকে সঙ্গা সিলিমা দেখ সক্‌তা হুঁ ক্যা?

যে ভাঙ্গুড়ু প্রচণ্ড আশঙ্কা ও আশায় বলতে পারে,
- আমার মাঈ তন্দুরি রোটি ঔর সরোসোঁ কা শাগ্ বানাচ্ছেন। খাইবে হ ক্যা রঘুভাইয়া?
- খাবো। কই, দে।
- হম চামার হৈঁ।
- তাতে কী হল?

-তোহর ঘিন্ লগি ক্যা

যে যুবক বলিষ্ঠ সহযোদ্ধার মতো অকৃত্রিম বলে দেয়,

-এ রঘু ভাইয়া, যদি প্রয়োজন হয় তো বলো, হামার কলিজাভি খোল দেই তোহর খাতির।

এতই যার হৃদয়ের ঐশ্বর্য, পার্থিব ধন বলতে তার জায়দাদ কেবল দুটো বরাহ একটা গাভী, দোচালা একখানা ঘর, কয়েকটা তাড় কা পেঢ় (তালগাছ) আর একজন বিধবা জননী-সুরতিয়া।

এক চিলতে উঠোনের পাশে ছোট্ট কুঁইয়া (কুয়ো)। দড়িবাঁধা ছোট বালতিতে জালে তুলে প্রচণ্ড দ্বিধায়, তৃষ্ণার্ত রঘুর প্রসারিত দুই চেটোয় জল ঢেলে দিয়েছিলেন এই অন্ত্যজ মহিলা।

রঘুর শুকনো জিহ্বা , ঠোঁঠ ও কণ্ট যখন পান করে নেয় কুয়োর শীতল জল, তখন মেঘহীন আকাশে আষাঢ়ের বাবুদছড়ানো রৌদ্র। প্রচণ্ড গরম ও লু হাওয়া।

জল খাওয়া শেষ করে চোখেমুখে ছিটায় রঘু। এমন দৃশ্য দেখতে আশপাশে আরো কয়েকজন ওদেরই বিরাদরি -নারী, পুরুষ, শিশু বিস্ফারিত চোখে রঘুকে দেখে। অবাক লাগে। এক লিখাপড়া, উঁচে লোগের ছেলে জল খেল চামারের হাতে! বিরল লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে ওরা বলাবলি করে, ক্যা দেখতোয়ে! (কী দেখছি!)

ভাঙ্গাড্ডুর জননী বলেন,

- সাহিব।

- কিয়া? কৌন সাহিব? মৈ?

- তোমার ঘেন্না করেনি?

রঘু বলল,

- কেন মাঈজি?

অবিশ্বাস্য! নিজেদের শ্রবণকে অবিশ্বাস করে সম্মিলিত কয়েকজন। চামারকে মাঈজি বলছে শাদা পোশাকের ফিটফাট এক উঁচেলোগ', যাকে চতুর নেতা মনে হয় না, কিম্বা শৌখিন কোনো সমাজসুধারক। এ কেরে?

রঘু আবার বলল,

-কেন, কী হয়েছে মাঈ?

অকল্পনীয় মুহূর্তে, কারণ আছে বলেই সুরতিয়ার চোখে ছলাৎ-ছলাৎ । বলল, আবেগে, আর তীব্র শঙ্কায়,

-হম চামার হৈঁন। নীচা জাত। উঁচেলোগ মারেঙ্গো হম সবকো।

রঘুর ভিতর অন্য এক রঘু তখন উঁকি দেয়, যেমন প্রতিটি সাধারণ মানুষের অভ্যন্তরে আরো এক অসাধারণের অবস্থান। যে কিনা পাথর হয়ে পড়ে থাকে অনড়। কোনো স্পর্শ বা ঘটনায় সুসময়ে জেগে ওঠে। যেমন রামায়ণের আখ্যানে বর্ণিত জমাট বাঁধা এক মানব সত্তার

প্রতীকী পুনরুত্থান।

তেমনি অসাধারণ বা প্রকৃত স্বাভাবিক, এমন এক সত্তার জাগরণ হয় এই চামার বস্তিতে যে ঘটনায় রঘুর কোনো মহিমা নেই। আবাল্য ইংরেজিপাঠ নেয়া, ভিন্ন শালীন পরিবেশে জন্ম নেয়া, বর্ধিত ও প্রতিপালিত হওয়া রঘু বলল নিতান্ত কেজো গলায়, নির্মেদস্বরে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে,

বড়ো পিপাসা পেয়েছিল তো। তোমার দেয়া জল খেয়ে প্রাণ বাঁচল। বুক ফেটে যাচ্ছিল গরমে। তোমার হাতে জল খেলে কোন শালা কী বলবে? চামড়া তুলে নেব।

তুমি ভেবো না মাঈজি।

সুরতিয়া বলল,

- ঘেন্না লাগেনি তোমার?

কেবলই হাসে সেই উত্থিত অন্তর্লীন রঘু। অমোঘ শব্দে অত্যন্ত সহজ কথায় বলে দেয় জীবনের মর্মমূল,

-মায়ের হাতে দেয়া জলে যে ঘেন্না করে সে মানুষ নয়। জল দাও। আরো একটু খাব। তৃষ্ণা মেটেনি।

আতিশয্যে হুল্লোড় তোলে ভাঙ্গাড়ু,

-হেই মাঈয়া, আমি কী বলেছিলাম? হামার দেস্তকা ঘিনউন কুছ নেইখে বা। রোটি দে, অব হম দোনো কো। খাইবে করি।

সেদিন দাওয়ায় বসে রঘুও ভাঙ্গাড়ু কাঁচা পেঁয়াজ পড়ওল (পটলের) ব্যঞ্জনসহ আধজ্বালা রোটি খায়। পরিবেশন করেন এক 'চামার' অন্নপূর্ণা পরমযত্নে, যাঁর সহজবোধে এটাই স্পষ্ট,অতিথি মানেই একসঙ্গো যুগলে লক্ষীনারায়ণ।

এভাবেই চৌথাবর্গাফেল, এক সরল, মহাধনী, ভাণ্ডড়ু নামক অন্ত্যজের কাছে অবর্ননীয় মানবিক ঋণে আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায় রঘুর অন্দর বাহির।

রঘু রোটি চিবোয় প্রকৃত ক্ষুধায়। যে রোটির প্রতিটি কণায় ভাঙ্গাড়ুর মেহনতী ঘাম আর এক দলিত জননীর দাবিদাওয়াহীন অপার স্নেহ।

ক্ষুৎকাতর রঘু রোটি খায়, ক্ষুধা মেটায়। তারপর জল খায়, সঞ্চিত অনেক পিপাসা মেটায়।

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে অবাক দেখে যায় কয়েকজন 'বিরাদরি'- যাদের বর্ণ কালো, রক্তের রং লাল আর অন্তর জ্যোৎস্নার মতো সফেদ।

সুতরাং, এইখানেই রঘুর কিছুটা শেকড় প্রোথিত হয়ে যায়। মাটি খুঁড়ে দেয়, ভাঙ্গাড় আর শেকড়ের গোড়া সিঞ্চন করেন ভাঙ্গাড়ুর মা।

অন্নপূর্ণা নামক এক বস্তুনিরপেক্ষ শব্দকে বস্তুনিষ্ঠ করে নেয় রঘু আবার সুরতিয়ার মধ্যে। মনে মনে বলে,

এমন সহজ সরল মা আছেন তোর। তোর মতো ধনবান কেউ নেই কোথাও। আমারও মা ছিলেন। আজ নেই। চাঁপাফুলের তপ্ত শিখায় হারিয়ে গেছেন সেই কবে। তোর মার একটু অংশ আমায় ভিক্ষে দিবি?

রঘু মুখে না চাইলেও ভাজ্ঞাড্ডু নিজেই বিলিয়ে দেয়। কারণ, যতই খণ্ডিত হোক-জননী জননীই। যতোই বণ্টিত হোক দ্বিগুণ হারে বাড়ে।

আর এরই ভগ্নাংশ নিয়ে তুস্ট হয়ে যায় বিভিন্ন দহনে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাওয়া উনিশ বছরের রঘু।

হিমানী ঝা ও সুরতিয়ার মধ্যে কোথায় যেন ভাসা ভাসা যোগসূত্র খুঁজে পায় রঘু। অদৃশ্য এই যোগসূত্রের রেখাধরে মেরুর অরোরার মতো ঝলসে ওঠেন দূর, অনেক অনেকদূর পাহাড়ি জনপদ রানিখেতে চলে যাওয়া চাড্ডা আন্টি। সেই তেষট্টি সাল, যখন সমস্ত দেশ জুড়ে যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি। আন্টি এখন কোথায়ও কেমন আছেন, কে জানে।

ফিকে জ্যোৎস্নার আলোয় যখন খণ্ডিত চাঁদ ভাসে ভাজ্ঞাড্ডুর তালগাছের পাতার ফাঁকে, যখন বরাহেরা ঘুমের ঘোরে ঘোঁত ঘোঁত্ করে, যখন দূর বি জি স্টেশনের কোনো ব্যস্ত ট্রেন ছুটে যায় রাতের পথে, শব্দ হয় হুইস্‌লের , যখন একমনে গুনগুন করে রঘু,

'নাতা ছোড়া, বন্ধন তোড়া
টুটা দিলকা জোড়,
আঁখিনয়ন মে সে বরষে পানি,
দর্দ ন জানে কোঈ... .

যখন, গান শুনতে শুনতে তন্ময় ভাজ্ঞাড্ডু হাতরাখে রঘুর হাঁটুতে, যখন ভাজ্ঞাড্ডুর স্তন্যদায়িনী রোটি সেঁকেন চুল্লার আগুনে, আর সেঁকার গন্ধ ভাসে হাওয়ায়। যখন পেছনে আমবাগানের ঝিঁঝি ডাকে ক্রমাগত, যখন জুগনু-র (জোনাকির) ওড়াউড়ি শেষে শান্ত হয়ে যায় সব।

তখন সহসা গান বন্ধ করে থমকে যায় রঘু। ভাবে অবশ বিষন্নতায়, নেহার-ও বুঝি উনিশ হল এতোদিনে। ওর নিখোঁজ বাবা প্রীতমজি ফিরে এলেন কি? নেহা কি আর কোনোদিন আইসক্রিম খেয়েছিল?

পাহাড়ি নদীর পারে ঐ শ্মশানে আরো কতজনকে সমর্পণ করা হল সর্বশেষ আগুনে? এমন সব মনে হতেই রঘু থমকে যায় স্বভাবতই। বুক ভার হয়। ওথ্‌লায়। ভিতরের অন্যজন ভিতরেই কাঁদে। কতো কিছুই হয়। তারপর সব নিথর হয়ে যায়।

থমকে, যাওয়া ভীষণ অন্যমনস্ক রঘুকে সন্তর্পণে তাড়া দেয় ভাজ্ঞাড্ডু,
-কিয়া হুয়া ভাইয়া? বুখ কিঁউ গায়ে? গাওনা।
স্তিমিত গলায় রঘু বলে,
-কিয়া গাঁউ?

- যো গা রহে হো অভি।

ছোট্ট শ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকায় রঘু। চাঁদের পাশে এখন কয়েকপুঞ্জ জলকণাহীন মেঘ। এক রাতচরা পাখির উড়ে যাওয়া পশ্চিম আকাশে। ট্রেনের হুইস্‌ল মিলিয়ে গেছে অনেকদূর।

ভাঙ্গাড্ডু আবার ডাকে,

- কী হল রঘুভাইয়া? কী ভাবছ?

- কুছ নেহি।

- ফির গানা বুখ্‌ কিউ দিয়ে?

রঘু বলল,

- মুঝে গানাউনা নেহি আতা।

- নেহি নেহি। বহুৎ মিঠাস বা তোহর গলে মে। কৌঈ সিলিমা কা গানা হৈ ক্যা?

রঘু দুদিকে মাথা নাড়ে। বলে,

- মণিহারীঘাটে বাজারে শুনেছিলাম কিছুদিন আগে। এক বৃদ্ধ গাইছিল এমনি বসে-বসে, গাছের ছায়ায়।

ভাঙ্গাড্ডু বলল,

- কোনো ভিখিরি:

রঘু ক্ষীণ ধমকায়,

-নেহি বে বুরবক! অ্যা ফোক্‌সিঙার অব নর্থবিহার।

ড্যু ইউ আন্ডার স্ট্যান্ড?

- ক্যা বড় বড়াতে হো ভাইয়া অংরেজি মে?

রঘু বলল,

-মিট্টি, পানি, হাওয়া, পেড় পৌধে, আকাশ, বাদল ঔর ইনসান কা জিগর নিচোড়কর বনতে হৈঁ ইয়ে গানে। অংরেজিমে ফোকসঙ্‌ কহা যাতা হৈ।

ভাঙ্গাড্ডুর প্রশ্ন,

-তুম জানতে হো ফুকসঙ্গুয়া?

রঘু হাসে। বলে,

নেহি বে। ঐসা হি গুণগুণাতা হুঁ।

হঠাৎ উঠে যায় রঘু। ভাঙ্গাড্ডু তটস্থ।

বলল,

-ক্যা ভাইয়া? কাঁহা যাতে হো?

রঘু বলল,

- রাত অনেক হল। হোস্টেলে ফিরতে হবে।

বলেই উঠোন পেরিয়ে যায়।

ভাঙ্গাড়ু জোরে ডাকে,

-এ মাঈ। রঘু ভাইয়া চল্ গইলে।

উনোনের সামনেবসা রসুইয়ের আগুনে ব্যস্ত জননী বলেন,

-তিনজনের রোটি বানিয়েছি। রঘুর প্রিয় অড়হর আছে। ডেকে আন ওকে।

ভাঙ্গাড়ু পেছনে ছোটে। ধরে ফেলে রঘুকে। বলে,

-মাঈ ডাকছে। ফিরে চলো। খাব সবাই মিলে।

-আজ না ভাঙড়ু। প্রায়ই তো খাই। আজ যেতে দে।

ভাঙড়ু বলে,

-না ভাইয়া। মায়ের মন দুখাতে নেই। ফিরে চলো।

চৌথিবর্গা অনুত্তীর্ণ ভাঙ্গাড়ুর সহজপাঠে সাড়া দেয় রঘু। ফিরে আসে। মায়ের মনে দুঃখ দিতে নেই- সংসারের অতিসহজ শব্দের কঠিনতম পাঠ।

মায়ের হাতে গড়া আটার রোটির টানে রঘু ফিরে আসে আবার এই দোচালা ঘরে, যেখানে চোরা অপরিচিত ফুলের মতো মানবিক ওম্ নিরালায়, নিতান্ত অবহেলায় ওৎ পেতে থাকে। রঘু ধরা দেয় ওখানে।

লম্ফের ও জ্যোৎস্নার আলোয় মেশামেশি এক অদ্ভুত বিচিত্র আলোয় সদ্যসেঁকা তপ্ত রোটি ছিঁড়ে দুইবন্ধু, আর পাশে বসে বসে দেখেন সেই একই দাত্রী যিনি একসময় বলেন দুজনকে,

-ইম্‌লি পাইনি। অড়হরে একটু ইম্‌লি দিলে আরো ভালো হত, তাই না?

খেতে খেতে রঘু বলে,

-মাইজি, তোমার জন্যে রেখেছ, না দিয়ে দিয়েছ সব আমাদের দুজনকে?

-না,না। আছে, আছে।

- দেখাও।

-আছে। বিশ্বাস করো। তোমরা খাও তো।

রঘু মানে না। উঠে গেল ভেতরে। খোলা তাওয়ায় আধপোঁড়া কেবল দুখানা রোটি। মাটি লেপানো কড়ার তলানিতে অবশিষ্ট একটু ডাল, তাও শুকিয়ে গেছে। কটোরায় (বাটিতে) ভাজি নেই।

সুরতিয়ার মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। স্বর্গীয় মিথ্যারও কী অপূর্ব গরিমা, যে মিথ্যা কেবল সংসারের সব মায়েরা বলেন কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই।

রঘু আপ্লুত হয়ে যায়। দু-চোখে জল আসে। বাইরে বেরিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায়

ধমকায় জোরে,

- ইয়ে কিয়া মাঈ?
দাত্রী বলেন,
- কেন রে বাবা? কী হয়েছে?
- তোমার কই?
জননী আশ্বস্ত করেন,
- আছে তো।
- এটুকু?
- ওতেই হবে।
- জ্বলা দুটো রোটি ছাড়া কিচ্ছু নেই।

অন্নপূর্ণা শান্ত করেন রঘুকে,

- হবে। আর কতো লাগে এই বুড়ো শরীরে?

রঘু বলল,

- এ ভাঙড্ডু মত্ খা।

তারপর সুরতিয়াকে বলল,

- তোমার খাবার নিয়ে এসো।

ভাঙ্গাড্ডুর মা বলেন,

- খিদে নেই রে এখন। পরে খাব।
- জলদি আনো। কতরাত হল!

ভাঙড্ডু জোর দেয়,

- লে আ মাঈ। এক সঙ্গ্ খাইবে করি হম।

পীড়াপীড়িতে ভেতরে চলে গেলো সুরতিয়া। নিয়ে এল বিলিয়ে দেয়ার পর যা ছিলো অবশিষ্ট হেঁসেলে। বসলো ওদের পাশে।

রোটি আর ডাল দিলো রঘু। ভাঙ্গাড্ডু দিলো ভাজি। তারপর দুজনেই বলল,
এ মাঈ, রোটি খা লে।

এবার তীব্র জলোচ্ছ্বাস জননীর চোখে। জল গড়ায়। নোনা জল গড়ায় গালে। রঘু রোটি ছিঁড়ে ডালে চুবোয়। সুরতিয়ার মুখের সামনে ধরে বলে,
- হা করো মাঈ।

চেয়ে থাকে ভাঙ্গাড্ডু ও সুরতিয়া। ভাঙ্গাড্ডুর খাওয়া থেমে গেছে। বলল,
- লে না মাঁ। রঘু ভাইয়া দিচ্ছে। খেয়ে নে।

একটু খুলে যায় সুরতিয়ার মুখ। আর এই পরিসরেই ডালে ভেজানো রোটির টুকরো গুঁজে দেয় রঘু।

জননীর চোখের জল তখন জ্যোৎস্নার মতো ঝরে। বলেন অবশ কণ্ঠে,

- তু হামার কৌন হৈরে রঘু?

স্মিত হাসে রঘুবেশী মানুষের ভিতর অন্যমানুষ। অকপট বলে যায় রক্তমাংসধারী রঘুর গমগমে কণ্ঠ ধার করে,

- তেরা বেটা হুঁ। জৈসে ভাঙ্গাড়ু। চল, অভ খানা খা।

তিনজন মানুষের বিকিরিত জ্যোৎস্না ও আকাশের নিকটতম কুটুম্ব জ্যোতিষ্ক -চাঁদের আলো মিলিমিশে একাকার হয়ে যায় চামার বস্তির এই উঠোনে।

ওরা খানা খায়। এদিকে রাত আরো বাড়ে। সমস্ত দিনের তাপ বিকিরণ করে ভূ-ত্বক আরো শীতল হতে থাকে। এই শীতলতায় ভক্ষণরত দুই যুবকের মধ্যখানে স্থিরবসে থাকা এক বিনীত জননী গর্ববোধ করেন এ মুহূর্তে, কারণ, তাঁর দুপাশে দুই দামাল সন্তানের একজন নিজের গর্ভজাত, অন্যজন মানবিক ধর্মজাত।

খেতে খেতে আজো আবার আনমনা ভাবে রঘু, আর কতো ঋণ?

কত জনপদ জুড়ে কতো যে ঋণ জমে আছে! কীভাবে এসবের পরিশোধ হবে?

আবার ভাবে, কি দরকার পরিশোধের? সব ঋণের পরিশোধ না হলেও চলে এই সান্ত্বনায় আনমনে রোটি ছিঁড়ে রঘু।

চাঁদের ফালি তালগাছের মাথা পেরিয়ে অনেক ওপরে। ভাঙ্গাড়ুর জল খাওয়ার শব্দ। রঘুও জল খায়।

দূরের স্টেশনে হুইসেল সহ আরো এক ট্রেনের শব্দ এখানে আসে।

জল খাওয়া শেষ হলে ভাঙ্গাড়ু বলল,

- আজ লেট্ হ গইল।

- কী লেট?

- ফোরডাউন আসাম মেল।

রঘু শুধরে দিল,

-নারে। ওটা গৌহাটি -লখ্নৌ। একঘণ্টা লেট। বারসই কিম্বা কিষাণগঞ্জে ক্রসিং ছিল বোধহয়।

সুরতিয়া বাসন ধুতে চলে গেল কুয়োতলায়। এতোই ফটফটে চাঁদের আলো এখন তাই জ্বলন্ত লম্ফ নিলনা।

উঠোন পেরিয়ে রঘু বলল, আমি যাই। হোস্টেলের চৌকিদারকে পটাতে হবে।

সদর দরজা পেরিয়ে আঙ্গ্নায় দাঁড়ায় রঘু। জিজ্ঞেস করল,

- চাচী আছেন?

লছমতিয়া অন্দরের কুয়োতলায় কাপড় কাচছিল। মাথায় ঘুংঘট টেনে বলল,

- জি হাঁ।

- কাঁহা? রসুই মে?

- নেহি, নেহি। সোতে রহিন

- কিঁউ কিয়া হুয়া?

- তবিয়ত ঠিক নৈইখে বা ।

রঘু জানে স্যার পাটনা গেছেন গত সপ্তায়। ফিরবেন আরো চার পাঁচদিন পর। সব সময়ের কাজের লোক, পহেরেদার দ্বারিকা এই সময় পেছনের মাঠের পিপ্পলতলায় টেনে ঘুম দিচ্ছে হয়তো।

অন্যলোক বজরঙ্গী, পণ্ডিতজির অর্থাৎ স্যারের বাবার সাথে বেরোয় রোজ। গ্যারেজে গাড়ি নেই। কালো ল্যান্ড্‌মাস্টার গ্যারেজে মানে,পণ্ডিতজি হাভেলিতে আছেন। কিম্বা বাইরে 'দৌরা'-য় গেছেন। ট্যুরে পার্টির গাড়ি।

এখন আঙ্‌না ফাঁকা। ঝাকড়া লিচুগাছের তলায় চারপাই পড়ে আছে। তাকিয়াও আছে চারপাইতে। পাশে ছোট্ট সেঁঝ (টেবিল)। সেঁঝে একটা গ্লাস, শূন্য। চারপাইয়ে গোটানো রেশমি শোলাপুরি। কেউ রোদে শুয়েছিল বোঝা যায়।

লছমতিয়া বলল,

-অন্দর আইয়ে জি

- থাক। চাচিজিকে বলো, আমি এসেছিলাম।

-একটু অপেক্ষা করুন তো।

বলেই আধকাচা কাপড় চোপড় ফেলে রেখে চলে গেল অন্দরমহলের দিকে।

অনেকবার দেখা আঙ্গানায় খুঁটিনাটি লক্ষ করছে রঘু। ডানদিকের কোণ ঘেঁষে উঁচু তুলসী বেদী। গাছের গোড়ায় কিছু বেলিফুল। একটা আলোহীন দীয়া। মূল সদর দরজার বাঁদিকে, কিছুটা তফাতে আড়াআড়ি খুঁটিতে রস্সি বাঁধা। মেলেদেয়া হয়েছে কুর্তা, বালিশের ওয়াড়, দুটো শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, টুকটাক মেয়েলি পরিধেয় কাপড়। শুকিয়ে গেছে কবে, এখনো উড়ছে হাল্কা বাতাসে। আঙ্গানার শেষপ্রান্তে মূল দালানের বারান্দায় স্যারের মোটর সাইকেল নেই। রঘু জানে,ওটা এখন যশোবন্তের ওয়র্কশপে। ইঞ্জিনে কাজ করানো হচ্ছে।

সেদিন দ্বারিকা ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল বিকল বাইক ওয়র্কশপ অব্দি। নিজেও সঙ্গে ছিল। স্যার বলেছিলেন,

-দেখিস তো, কিকি পার্টস বদলাতে হবে।

রঘু বলছিল

-জ স্যার।

স্যার বলছিলেন,

-ওয়ান থিং মোর।

-হোয়াট স্যার?

- ফ্রন্ট টায়ার পাল্টে রিয়ার হুইলে ফিট করতে বলবি। হ্যাঁরে রঘু, তোর সময় হবে তো?

-অফ্‌কোর্স স্যার।
- ঠিক আছে। একটু সঙ্গে যা প্লিজ। তুই ফিরে এলে চা খাব দুজনে। আজ হিমানীজির মেজাজ ভালো আছে। এর মানে চা হবে তৌফা ঔর বড়িয়া।

একটু হেসে বলেছিল রঘু,

- দ্যাট্‌স্ রাইট স্যার।

তখন উঠোনে কাপড় মেলছিলেন হিমানী।

বলছিলেন,
- অংরেজি মে কিয়া বড় বড়া রহে হ্যাঁয় আপ দোনো?
ম্যায় ভি তো সুনু?

রঘু বলল,

- ইউ ক্যান নট্ আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার টকিং।

হিমানীর জোর ধমক,

- তু চুপ কর অংরেজ কা পোতা।

রঘু চুপ। জানে, চাচিজির অংরেজিতে চিড় (বিরক্তি) আছে। স্যার বললেন,

- কিয়াহুয়া ফির অংরেজি মে?

খুব জোরে ঝড়াৎ শব্দে ভেজা চাদর বাড়লেন হিমানী। রশিতে মেলে দিয়ে ক্লিপ লাগালেন। এ ঋতুতে ভীষণ হাওয়া। কাপড় চোপড় কোনোদালানের মাথায় কিম্বা আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঠিক নেই।

হিমানী বলছেন,

- এই 'খটারা' (অচল যান) ফেলে দাও না কেন?
- কী? এটা খটারা?
- আর না তো কি? কি আওয়াজ! কচি শিশু 'চমকে উঠবে' তোমাদের কালো ঘোড়ার শব্দে।

তোমাদের বলতে মাঝেমাঝে রঘুও ঐ 'খটারা' চালায় তাই।

স্যার বলেছেন,

- শুনলি রঘু? রয়েল এনফিল্ড খটারা হয়ে গেল।

রঘু বিজ্ঞের মতো বলেছে,

- ইট ইজ নট হার ডিপার্টমেন্ট স্যার।

স্যার জোর দিয়ে বলেছেন,

-ইয়েস দ্যাট্‌স্ ইট।

-যশোবন্ত এখনো বাইক ডেলিভারি দেয়নি। নির্দিষ্ট জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে।

অঙ্গনা অনেক প্রশস্ত। প্রায় বর্গাকার। আরো একটু বড়ো হলে রীতিমতো লনটেনিস খেলা যেত, তাই মনে হয়।

এখনো দাঁড়িয়ে আছে। পা-ধোয়া ধরাবাঁধা নিয়ম বাইরে থেকে এলে।

বালতির জলে চামড়ার চপ্পলসহ পা ধুয়ে হাতমুখে জল দিল। খুব গরম আজ। সূর্য তো নয়, জ্বলন্ত বারুদ ছড়াচ্ছে চারধারে। বাতাস যা আছে, তাও গরম।

লছমতিয়া কুয়োতলায় এলো আবার। বলল,

- বুলা রহি হ্যাঁয় ।

- কে চাচিজি?

- জি হাঁ।

- কোথায় উনি?

- বিছানায় শুয়ে আছেন। আপনি আসুন।

- আচ্ছা চলো।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মূল দালান। এরপর দালানের বিস্তৃত বারান্দা। বারান্দায় পরপর অনেকগুলো কক্ষ।

এসব পেরিয়ে করিডোর। করিডোরের শেষমাথায় স্যারও হিমানীর কক্ষ।

করিডোর পেরিয়ে দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল রঘু। দরজায় ভারী পর্দা। অনেকবার এই কক্ষে এসেছে সেই প্রথমদিন থেকেই। আজ একটু দ্বিধা কারণ, হিমানী কক্ষে শুয়ে আছেন একা।

লছমতিয়া করিডোর অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে কুয়োতলায়।

ফাঁকা করিডোর। সিলিঙে পাখা ঘুরছে। আরো কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইলো রঘু। এখানে গরমের ভাপ নেই।

একসময় কক্ষের অভ্যন্তর থেকে ডাক এল হিমানীর,

-লছমতিয়া, রঘু ফিরে গেল নাকি রে?

লছমতিয়া কুয়োতলায়। শোনেনি, তাই জবাব এল না। একটু সময় নিয়ে রঘু ডাকল স্তিমিতস্বরে, চাচিজি।

আরো একটু পরে, অবসন্ন, কিছুটা কাতরস্বরে কক্ষের ভিতর থেকে শব্দ এল,

-রঘু তুই? বাইরে কেন? ভেতরে আয়।

রঘু গেল ভেতরে। অনেকবার দেখা কক্ষের চারদিকে চোখ বোলালো। দামি আসবাবপত্র। বাঁদিকের গোটা দেয়ালজুড়ে মধুবনি-পেন্টিং।

বিরাট পালঙ্কে দীর্ঘাঙ্গী, আপাত নিঃসঙ্গ, ছিন্নলতার মতো শুয়ে আছেন হিমানী। ওর ফর্সা সুডৌলমুখ লালচে কিছুটা। কপাল কোঁচকানো পাতলা দুটো ঠোঁট একটু শুকনো। কাঁপছে মৃদু। আঁচল দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা। যদিও একটা র‍্যাপার পায়ের কাছে ভাঁজ করা। নাকের বাঁ-দিকে জলরঙা ছোট্ট নাকছবি চিকচিক।

হিমানী ডাকলেন,

-আয়, দাঁড়িয়ে কেন? বোস এখানে।

হিমানী একটু সরে গেলেন বিছানার ওপাশে। আবার বললেন,

- বৈঠ যা মেরে পাস।

একটু দ্বিধা নিয়ে রঘু বসল। হিমানীর দুটো চোখ লালচে, ছলছল। দেখছেন রঘুকে।

রঘু বলল,

- কী হয়েছে তোমার? (রঘু অনেকদিন থেকে হিমানীকে 'তুমি' বলে)

ক্ষীণকণ্ঠে হিমানী বললেন,

- আমার মুন্ডু হয়েছে!

রঘু থমকে গেল। বলল,

- কেন যে হঠাৎ করে রেগে যাও, তুমিই জানো। বলো না কী হয়েছে?

কথার জবার না দিয়ে হিমানী বললেন,

- কেন এসেছিস?

- তোমার গালাগাল খেতে এসেছি।

হিমানী ম্লান হাসলেন। বললেন,

- সাহেবের চট করে রাগ উঠে যায়। কেন এলি রে!

রঘু বলল,

- এমনি। এদিকে এলাম তো। ভাবলাম, দেখে যাই।

- কাকে দেখে যাবি?

এবার রঘুর পালা। বলল,

- আমার মুন্ডু দেখে যাব।

- আমি তোর মুন্ডু?

রঘু কিচ্ছু বলেনা। হিমানী বললেন,

- এই দুপুরে এদিকে কী কাজ তোর? এতো টো টো করতে পারিসরে তুই!

কথা বলতে বলতে মৃদু কোঁকালেন হিমানী রঘু বলল,

- কিয়া তকলিফ্ তুমহারি?

- মাথা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়!

রঘু বলল,

- এত গরম মেজাজ দেখাচ্ছ, যন্ত্রণা তো হবেই।

হিমানী আবার ম্লান হাসলেন। রঘু বলল,

- মাথা টিপে দিই?

একবার তাকালেন হিমানী রঘুর দিকে। রঘু হিমানীর লম্বাটে পায়ের পাতায় হাত বুলোয়। পায়ে নূপুর। বুড়ো আঙুলের পাশে লম্বা আঙুলে রূপোর আঙটি।

হাত দিতেই টের পেল পায়ের পাতা নয়, দুইখণ্ড মাংসল বরফ।

র‍্যাপার খুলে ঢেকে দিল দুটো পা। তারপর আবার বলল,

-কপাল টিপে দিই চাচিজি?

হিমানী পলকহীন লক্ষ করছেন রঘুকে। বললেন,

-দিবি? আচ্ছা দে।

কপালে হাত দিয়ে রঘু আরো টের পায়,কপাল নয়, গরম তাওয়া।

প্রায় আঁতকে উঠে বলল,

-তোমার তো ভীষণ জ্বর। থার্মোমিটার নেই? জ্বর নিয়ে বসে আছ?

একটু হেসে হিমানী বললেন,

-নেহি রে। কুছ নেহি হ্যায় বুখারউখার। এমনি একটু মাথা ধরেছে।

রঘু আপত্তি করে,

-নানা, কম করেও একশোতিন জ্বর হবে। কোনো অষুধ নেই ঘরে?

হিমানী বললেন,

-কিচ্ছু লাগবে না। তুই শান্ত হয়ে বোস।

কথা গ্রাহ্য করলনা রঘু। 'আমি এখনি আসছি' বলেই ছুটল করিডোরে। পেছন থেকে জ্বরে আক্রান্ত হিমানীর উষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল,

-রঘু শোন, এই পাগল, কিছু হয়নি, ফিরে আয় আমার কাছে!

কে কার কথা শোনে। ভরদুপুরে প্রায় দৌড়ে সোজা মঙ্গলবাজার। এখানে পরিচিত অষুধের দোকান অধিকারী ড্রাগ সেন্টার।

অষুধের কথা বলতেই সেলসম্যান বলল,

- ডক্টরের পর্চা আছে আপনার কাছে?

তাড়াহুড়ো ও আপৎকালীন অবস্থায় রঘুর মগজ মানে,ভাট্টির আগুন। সুতরাং গর্জে উঠল জোরে,

- ধেৎ বে ভোঁসড়িওয়ালা। জো বোলা সো কর। এ পি সি চার গোলি। এলবারসিলিন পাঁচ ক্যাপসুল। ঔর সরদর্দকা বাম একঠো।

সেলসম্যান কিচ্ছু না বলে রঘুর পর্চা মতো দিয়ে দিল সব।

কাউন্টারে দাম ছুঁড়ে দিয়েই আবার ছুট। মাথায় একটাই চিন্তা,ওখানে চাচিজি কাতরাচ্ছেন। ছুটতে ছুটতে মনে হলো,থার্মোমিটার কিনলে ভালো হতো। কিন্তু আর তো টাকা নেই পকেটে। মাত্র চল্লিশ পয়সা বেঁচেছে। অন্তত ছ-টাকা চাই একটা হিক্‌স থার্মোমিটার কিনতে যাকগে। হাতের চেটো তো আছেই। জ্বর বোঝা যাবে।

কুয়োতলায় পায়ে একটু জল ঢেলে ছুটল করিডোরে। কোনো কথা না বলে দরজার সামনে গলাখাঁকারি দিয়ে ঢুকল কক্ষে। এগিয়ে গেল হিমানীর পাশে।

তখনো একইভাবে পড়ে আছেন, যেভাবে রঘু ফেলে রেখে গিয়েছিল।

হিমানী বললেন,

- কোথায় ছুটে গিয়েছিলি রে উন্মাদ?
- অষুধ আনতে গিয়েছিলাম।
- অষুধ ? কে খাবে?
- কে খাবে মানে? তুমি খাবে।
- আমি কেন?
- জ্বর কার হয়েছে আমার না তোমার?
- হোক জ্বর।
- কত জ্বর জান?
- জ্বর নেই। কোনোদিন অষুধ খাইনি জ্বরের।

রঘু বলল,

- ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। সিম্পল মেডিসিন।
- তা নয়রে ভূত। এমনি সেরে যাবে।
- সারবে না। আমি দিচ্ছি। খাও তুমি। খারাপ কিছু হলে আমি দায়ী। বিশ্বাস করো।

অল্প হাসি হিমানীর মুখে। বললেন,

- তুই বিষ দিলেও খেয়ে নেব। দে তোর অষুধ।

রঘু বলল,

- দ্যাটস্ ফাইন। মুখ খোলো।

হিমানী বাধ্য মেয়ের মতো হা করলেন। পাশের টেবিলে জল রাখা ছিল। একটু জল দিল হিমানীর মুখে। হিমানী গিলে ফেললেন।

রঘু বলল,

- ওহো! মুখে জল ধরে রাখো। ট্যাবলেটসহ গিলতে হবে তো।

হিমানী এবার অবুঝ। বললেন,

- কেন? জল খেয়েই তো বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। জ্বর কমছে মনে হয়। শুধু জল খেলে হবে না?

রঘু উত্যক্ত। বলল,

- না, না। জল আগে গিলবে না। জল ট্যাবলেট একসাথে খাবে।

রঘুর নির্দেশমতো হিমানী তাই করলেন। অষুধ খেলেন। বললেন,

- আর কী কী দিবি দে। ওগুলো কিরে, এত মোটা মোটা?

রঘু আশ্বাস দিল,

- অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল। খুব ভালো অষুধ।

- ওগুলো খেতে হবে বলছিস?
- এখন না। আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বালিশে মাথা এলিয়ে হিমানী বললেন,

- এত প্রকান্ড ডাক্তার থাকতে বাইরের ডাক্তারের কী প্রয়োজন? কত বড়ো ডাক্তার, বাপরে!
-কী?
-কিচ্ছুনা। লছমতিয়াকে বল, চা বানিয়ে দেবে। তুইও খাবি।
-তুমি চা খাবে?
-খাব। কেন, এতে তোর বারণ আছে?

রঘু নির্দেশ দিল,

-খেয়ো। তবে এর আগে একটু দুধ আর দুটো বিস্কুট খেতে হবে। হিমানী কঁকালেন,
-ও মা গো!
-এনি প্রবলেম ম্যাম?
-বাবারে!
- হোয়াট হ্যাপেন্ড্?
-মার ডালেগা তু!
-আয়াম সরি ম্যাম।

কপট বিরক্তি, মাথার যন্ত্রণা, জ্বরের দহন, আছে তবু , একপাশে মাথা ঘুরিয়ে মিষ্টি হেসে হিমানী বললেন,

- শেক্সপিয়ার কা পোতা!

একটু সময় এমনি কাটে। রঘুঅল্প কিছুটা 'বাম' নিল আঙুলে। বলল,

- অয়িন্টমেন্ট লাগব চাচিজি?

হিমানী কিচ্ছু বললেন না। রঘু আবার বলল আস্তে, শান্ত স্বরে,

- কপাল টিপে দিই?

একইভাবে কাত মাথায় অবসন্ন হিমানী বললেন,

- তোর যা ইচ্ছে কর। মাথাটা শুধু গুড়িয়ে দিস না। কী শক্ত তোর আঙুল!
- ওকে ম্যাম।
- আবার?

রঘু বলল,

-সরি।

হিমানী তিক্ত। ধমকালেন,

-পালা তুই। আবার অংরেজি!

রঘুর আত্মসমর্পণ। বলল,

-ফরগিভ্ মি।

- মার খাবি, বেকুফ!

মার দেবার অবস্থায় হিমানী নেই। কেবল সম্পূর্ণ হাসলেন রঘুর দিকে চেয়ে। কেন হাসলেন রঘু কিছুই বুঝল না। বামসহ হিমানীর কপালে হাত বুলোতে থাকল শুধু। ধনুকের মতো বাঁকানো পাতলা ভুরু টিপে দিল। সুচারু নাকের দুপাশ বুলিয়ে দিল খুব যত্নে। হিমানীর ফর্সা গাল রক্তিম হলো জ্বরের উত্তাপ ও রঘুর অনাবিল পরিচর্যায়।

একসময় বন্ধ দুচোখে জল গড়াল হিমানীর। হাল্কাভাবে নাক টানলেন। তীক্ষ্ণ নাকের ডগা লালচে হল। আরো জল গড়াল চোখে-গালে। কেন গড়াল চোখের জল রঘু এও বুঝলোনা। ভাবলো 'বামের পিপারমেন্টের জ্বলুনী বোধহয়। বলল স্তিমিত স্বরে,

-অয়িন্টমেন্টে বেশি জ্বালা করছে চাচিজি?

দুদিকে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানান দিলেন হিমানী - না, জ্বালা নেই।

আবার বলল রঘু,

-মাথাব্যথা বেড়েছে?

ফিসফিস স্বরে বললেন হিমানী এবার

-না।

- দেখো পনেরো কুড়ি মিনিটে জ্বর কমে আসবে।

হিমানীর চোখের জল গাল বেয়ে নেমে গেছে থুতনি হয়ে গলায়। না মুছেই একবার চোখ খুললেন। তাকালেন দেয়ালের দিকে। দেয়ালে বিখ্যাত মধুবনি পেন্টিং -এর মায়াময় দৃশ্য, মায়ের কোলজুড়ে এক দামাল শিশু।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ঐ দিকে। বললেন প্রায় না-শোনা শব্দে,

-তোর প্রতাপে জ্বরের কী সাহস যে আমার শরীরে জেঁকে বসবে!

-কী?

-কিচ্ছুনা। লছময়িয়াকে বলে আয়, চা দেবে।

তারপর নিজেই জোরে ডাকলেন,

কোথায় গেলিরে?

লছমতিয়া চা, গরম দুধ বিস্কুট, ঠেকোয়া (পিঠে) দিয়ে গেছে ট্রে সদৃশ রুপোর রেকাবিতে।

রঘু চা নিল। হিমানীও। রঘু বলল,

- খালি পেটে এ পি সি পড়েছে। এরপর চা খেলে কী হবে জান?

- কী হবে রে ডাক্তার?

- স্টমাক ইরিটেশন হবে। ভমিটিং হতে পারে।

- কী হতে পারে? আবার অংরেজি?

- হোয়াট ক্যান আই ডু ম্যাডাম? এসবের হিন্দি জানা নেই আমার। একটা জানি শুধু।
- কোনটা?
-ভমিটিং মানে উল্টি।
- হোক উল্টি। আবার ছুটবি অষুধ আনতে। দুলাইন ফিজিওলাজি -পড়ে কী না ডাক্তার রে!

হিমানীর কৃত্রিম ভর্ৎসনায় হাসল রঘু। বলল,

-সন্দেহ থাকলে আসল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো।
- থাক ডাক্তার। ক্যাপসুল দিলি না কেন?

রঘু বলল,

-পাইরেক্সিয়ার রিজন না জেনে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যকিছু অ্যাডমিনিস্টার করা ঠিক নয়।
- কী আবোল তাবোল বলছিস আমায় মূর্খ পেয়ে?
-এগুলো আবোল-তাবোল হল? দিজ ইজ ক্লিনিক্যাল ফ্যাক্ট।

হিমানী বললেন অন্যকথা,

-এত জানিস যখন, পড়াশোনা করিস না কেন? রেগুলার ক্লাস করিস না।

এবার আটকে যায় হিমানীর হাতুড়ে ডাক্তার তবু বলল জোর দিয়ে,

-দুধসহ দুটো বিস্কুট খাও আগে।
-আরো বিস্কুট? একটা তো খেয়েছি।
-আরো দুটো খাও। পেটখালি আছে, কষ্ট হবে।
খাও বলছি।

কড়া ডাক্তারের পথ্য হিমানীকে নিতেই হয় একসময়। বিন্দু বিন্দু ঘাম এখন শরীরে। কোনোদিন পেটে এ পি সি পড়েনি। সুতরাং আনকোরা নতুন শরীর পেয়ে অষুধের সব অ্যাটম দিক বিদিক ছোটাছুটি করে হিমানীর অভ্যন্তরের যত্রতত্র। তাপ কমিয়ে আনল অন্তত চার ডিগ্রি।

কয়েক ঢোঁক দুধও অনিচ্ছায় খেলেন হিমানী। বিজ্ঞ ডাক্তার বলল,
-ঔর থোড়া।

এবার অবাধ্য আবদারি বালিকা হলেন চৌত্রিশ বছরের নিঃসন্তান হিমানী। পাশে বসা কর্তব্যে অটল উনিশবছরের নিগ্রোসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ রঘুকে অনুনয় করলেন কান্না-কান্না গলায়,

-আর খাবনা, মেরে বাপ!

সন্তানের নিরাময়ে অধীর সদ্যযুবক পিতা বললেন,

-আরো একটু খেয়ে নাও। খালি পেটে বমি হতে পারে। এ পি সি মানে বিষ। এতো তাগড়া জ্বর নামায়। কাম-অন টেক ইট।

একটু একটু করে, এভাবেই সম্পূর্ণ গ্লাস শেষ করাল রঘু। চৌত্রিশ বছরের অবুঝ

কন্যা খেলেন।

- হায় শঙ্করভগবান, এই ভূতের সামনে আর কোনোদিন যেন আমায় অসুখ বিসুখে ফেলো না। মেরে ফেলবে সরফিরা।

শব্দগুলোর উচ্চারণে হিমানীর জিহবা ও ঠোঁট অংশ নিল কেবল, অন্তর নেয়নি। এবং প্রমাণ করে দিল চোখ থেকে প্রায় ছিটকে বেরুনো আরো কয়েকফোঁটা জল,যে জলে বাৎসল্যের বাঁধভাঙা উদ্দমতা ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

দেয়ালে মধুবনির সেই ছবি,মায়ের কোলে দামাল শিশুর লালন পালন। হিমানী বারবার দেখলেন একই চিত্রপট।

হিমানীর বর্ষিত অশ্রু রঘুর দৃষ্টি এড়ায় না। বলল,

- আবার মাথা ধরেছে চাচিজি?

হিমানী ধমকালেন,

- তুই থামতো। খালি বকার বকার!

কী আর করে রঘু। একবার হিমানীর পায়ের পাতা ছুঁল।

হিমানী বললেন,

- কী দেখলি?

- দেখলাম পায়ের পাতার তাপ স্বাভাবিক। তবু, ঢেকে দিই।

রঘু র‍্যাপারে ঢেকে দিল হিমানীর পায়ের পাতা।

দুহাতে র‍্যাপার সরিয়ে হিমানী বললেন,

- সরা সব। ঘামছি। জ্বর নেই দেখছিস না, উল্লুক।

কমবয়েসি পিতা গাল খেয়ে কন্যার কপালে চোটোর স্পর্শে রেখে বলেন জ্বর এখনো নিরানব্বইর মতো। ডাকলেন,

- চাচিজি।

- উম্।

- কখন জ্বর এল?

হিমানী বললেন,

- তখন কি আমার হাতে ঘড়ি ছিল, সময় দেখে রাখব?

- তবু?

- এতো জেনে কী করবি?

- জ্বর দু-একদিন সাসটেইন করলে প্যাথোলোজিক্যাল টেস্টগুলো করাতে হবে।

- কী বললি? কী টেস্ট করাতে হবে?

রঘু বলল,

- কফ্ ইউরিন, ব্লাড।

- কী?

-ইয়েস ম্যাম।

-মার খাবি।

-খাবো। পাইরেক্সিয়ার রিজন ফাইন্ড আউট করতে হবে আগে।

-তোর মাথা!

বলেই বিপন্ন স্বরে বললেন হিমানী

-ছিঃ ছিঃ! কী বললাম আমি! হে রাম!

হিমানী হাত রাখলেন রঘুর মাথায়। একটু হেসে বললেন,

-তোর এই ধাপে ধাপে ডাক্তারির ঠেলায় আমি এমনি গঙ্গাজির প্যারি হয়ে যাব।

- না চাচিজি। যদি জ্বর সাসটেইন করে এসব টেস্ট খুব দরকার। বোধে না কেন?

- না জানিনা। মূর্খ পেয়েছিস তো।

রঘু বলল,

-স্পেসিমেনগুলো দিলে আমি টেস্ট করিয়ে আনব।

-কিসের স্পেসিমেন?

-কফ।

হিমানী সমস্যা তুললেন। বললেন,

-সর্দি নেই তো কফ কোথায় পাব?

রঘু বলল,

-কফ নেই ঠিক আছে। কিন্তু ব্লাড ইউরিন?

হিমানীর মুখ একটু রক্তিম হল।

মাথাটা একপাশে এলিয়ে একটু লজ্জায় ধমকালেন

-ডাক্তারি অনেক হয়েছে। চান কর। এ দুপুরে কোথাও বেরোবি না আর। বুঝেছিস?

রঘুর অভিমান হয়। বলল,

-এখানে চান করে খেতে আসিনি ম্যাডাম।

হিমানী বুঝলেন ডাক্তারি বলায় রঘু চটেছে। বললেন,

-খেতে আসিসনি জানি। তাএলি কেন?

রঘুর স্বভাবসিদ্ধ সোজা জবাব,

-স্যার এখানে নেই। ভাবলাম কেমন আছ তুমি দেখে আসি। তাই এলাম। আমার একটা দায়িত্ব আছে তো?

হিমানী হাসলেন। বললেন,

-বাবা! তোকে কে দায়িত্ব দিল রে পাকাবুড়ো?

রঘুর টানটান জবাব,

-দায়িত্ব কেউ দেয়নি। আমার মনে হলো, দেখা দরকার।

হিমানী দেখলেন,রঘু মাথা নিচু করে ম্রিয়মাণ বসে আছে। নরমস্বরে ডাকলেন,

-এ সরফিরা।

রঘুর জবাব নেই। আবার ডাকলেন,

-ডাক্তারসাহেব, শুনুন তো।

রঘু তবু নিশ্চুপ। আনমনা। হিমানী জোরে বললেন,

-রঘুরে, রাগ করলি তুই?

রঘু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। হিমানী তটস্থ হলেন। বললেন,

-কী হল? উঠলি কেন? চানে যাবি?

-না।

-তো?

- চলে যাব।

-কোথায়?

-যেখানে খুশি।

হিমানী বললেন,

-কিয়া মতলব? মজা করছিলাম আমি।

রঘুর স্বরে দৃঢ়প্রত্যয়। বলল,

- সব কথা নিয়ে মজা করা ঠিক-নয়।

-ঠিক আছে। করব না। এখন বস।

এবার আরো কঠিন ও অন্যরকম রঘুর স্বর।

বলল ম্রিয়মাণ গলায়,

-জানেন আপনি?

-কী জানব?

-এমনি জ্বর জ্বর করেই তো একদিন।

রঘু থেমে গেলো। হিমানী বললেন,

-কী একদিন?

-জ্বর হতে হতে রোগ বেড়ে গেল। মাত্র সাত মাস।

রঘু থমকে গেলো পুরোপুরি। হিমানী উদগ্রীব। বললেন,

-মাত্র সাত মাস! কী সাত মাস রে রঘু?

শান্ত শীতল কণ্ঠে রঘু বলল,

-শি পাস্‌ড্ এওয়ে।

-কে?

আর কিছু না বলে রঘু ফিরে যাচ্ছে তখন দরজার দিকে। হিমানী বললেন,

- কী হল রঘু? কে চলে গেল?

পর্দা তুলে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে রঘু সম্পূর্ণ বসে-যাওয়া গলায় বলল,

- মা। মাই মাদার।

রঘুর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ ঠিক শুনলেন হিমানী। জ্বরের সমস্ত অবসাদ দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে প্রায় ছুটে এলেন করিডোরে। রঘু তখন হাঁটছে জোরে। হিমানী জাপটে ধরলেন ওকে। কাতর শরীরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন নিজের কক্ষে আবার। জোর করে বিছানায় বসিয়ে বললেন,

- রাগ যদি করিস, তোর এই চাচিজি চলে যাবে চিরতরে। কোনোদিন আমার মুখ আর দেখতে পাবিনা। কার কপালে 'বাম' লগাবি তখন? বোস বাবা।

একটু থামলেন হিমানী। গলা শুকিয়ে গেছে। ঢোঁক গিলে আবার বললেন,

- তুই যা-যা বলবি সব করব। সব নিয়ে যাস। আজ আর হবে না। আমি-ও যাব তোর সাথে ক্লিনিকে। হল তো? এবার আমায় ক্ষমা করে দে বেটা।

কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। হিমানী শুয়েছেন আবার। ভেজা গাল একটু আগে মুছেছেন আঁচলে। হিমানীর নরম বাঁহাত ধরে আছে রঘু। এখন জ্বর প্রায় নেই। হাত ঠান্ডা।

রঘু বলল,

- কখন জ্বর এসেছিল?

হিমানীর অস্পষ্ট ভাসাভাসা জবাব,

- কী জানি।

- স্ট্রেঞ্জ। কখন জ্বর এল, টের পেলে না?

হিমানী উঠলেন। জানালার শিকে মাথার পেছন এলিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন এবার। কাঁধের দুদিকে ঘন চুল ছড়ানো। জ্বরের প্রকোপ কমেছে। চোখে মুখে কপালে কাতর স্নিগ্ধতা - যা এখন হিমানীরই যেন নিজস্ব। একবার মৃদু শ্বাস টানলেন।

বাইরে ধূসর আকাশে পাখি নেই। ঘুড়ি উড়ছে দু একটা। বিকেল মিলিয়ে যাবে একটু পরে।

হিমানীর ছড়ানো চুলের কিছুটা বাঁ-কাঁধে। বাকি সবটুকু বুক চেপে কোলের উপর। দীর্ঘ কালো চুল চোখমুখের অবসন্ন সৌন্দর্য কক্ষে যেন আলো ছড়ায়। কপালের বিন্দি হয়তো অনেক আগেই খুলে রেখেছেন কোথাও কিম্বা অখেয়ালে পড়ে গেছে। গলায় মঙ্গলসূত্র উঁকি দেয় চুলের ফাঁকে। দুচোখে বিষণ্ণতার ক্লান্তি। নাকের বাঁদিকে বিন্দুবৎ শাদা নাকছাবিতে আলোর একটু ঝিলিক। ঠোঁটদুটো তেমন আর শুকনো নয় এখন। বরঞ্চ ভেজা ভেজা। ফলের রস খেয়েছেন একটু আগে রঘুর পীড়াপীড়িতে। দুপুরে হাল্কা চা-পাটি (রুটি) আর

উরৎডালের (কলাইডাল) তড়কা দিয়েছিল লছমতিরা। ছুঁয়েও দেখেননি।

দু-পা জড়ো করে, একটার উপর আরেকটা তুলে সামনে ছড়ানো। পায়ের পাতায় র‍্যাপারের আবরণ নেই। পায়ে রুপোর মল্ দৃশ্যমান। দুহাতে কব্জিতে কাচের ফিকেসবুজ চুড়ি। চুড়ির এমনরঙে আরো ফর্সা দেখায় হিমানীর দীর্ঘ হাত। বাঁ হাতের অনামিকায় একটাই আঙ্গুঠি-ওতে ক্যাটস্ আই।

একই হাতে কপাল ও কাঁধের চুল সরিয়ে খোঁপা বাঁধলেন।

রঘু বলল,

- বড়ো পিক্যুলিয়ার রোগী!

কী?

- কখন টেম্পরেচার বাড়লো, বুঝলে না?

রঘুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন হিমানী। কোনো জবাব দিলেন না। রঘু বলল

- কী হল?

হিমানী বললেন,

- কী করে বুঝব? ঘড়ি ধর সময় গুনব? কত কাজ থাকে দেখিস না। শধু জ্বর দেখলে চলবে?

রঘু বলল,

- কী এমন কাজ তোমার?

- তোর কী মনেহয়? আমার কোনো কাজ নেই?

রঘুর সোজাসুজি জবাব,

- যখনই আসি, একটাই কাজ করতে দেখি সবসময়।

- কী দেখিস রে ভূত?

- কয়েকটা ধোয়াবাসন ছাই দিয়ে আবার মাজছ। আর কী কাজ তোমার? রসুইঘরে রোটি-সোটি অবশ্য বানাও।

হিমানী কঠিন চোখে তাকালেন রঘুর দিকে। অথচ স্মিত হেসে বললেন,

- যেমন গুরু তেমন চ্যালা।

- কী?

- তোরা সবাই এক। আমার কাজ কেউ দেখে না। এতো বড়ো হভেলি। অপদার্থ কয়েকটা কাজের লোক নিয়ে তোর স্যার আর বাবুজীকে সামলানো যে কত মুস্কিল ,তুই কি বুঝবি রে জ্যাঠা ছেলে! কত কাপ চা হয় রোজ জানিস? আমরা বাড়িতে মানুষ আর ক-জন?

জানার ইচ্ছে নেই, শুধু হিমানীর মেজাজ ঠান্ডা করার জন্য রঘুবলল,

- কতো কাপ গো চাচিজি?

-ফুলমতিকে জিজ্ঞেস কর। তোর স্যারকেও করতে পারিস। আমার কাজের তত্ত্ব তলাশ

করছে বাঁদর কোথাকার!

রঘু হাসে। বলল,

- ওকে ওকে, কুল ডাউন, প্লিজ কুল ডাউন।

হিমানী চটেছেন। বললেন,

- সকালে বাপুজির অফিসরুমের অবস্থা দেখেও বুঝিস না তোরা?

রঘু বুঝল- 'তোরা' বলতে স্যার আছেন, এবং সে নিজেও।

হিমানীর অভিমান জনিত অভিযোগের একেবারেই হিমানীর অভ্যন্তরের নিরালা নিভৃতিতে তার নিজেরও বেশ কিছুটা অবস্থান হয়ে গেছে। এইসব হৃদয়ঙ্গম করেই রঘু বলল,

- আমায় ক্ষমা করো। এমনি বলেছি গো।

- তোর স্যারও এরকম বলেন। তারপর,

থেমে গেলেন হিমানী। রঘুবলল,

- আমি জানি তোমার অনেক কাজ।

- চুপ কর বদমাশ।

- রাগ কোরো না। বলো না, তারপর কী?

একটু সময় নিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন হিমানী।

শেষ বিকেলের আলোর মতো ভীষণ স্বল্পজীবী হাসির রেখা ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে গেল। বললেন,

- এখন এসব জেনে তোমার কাজ নেই বুদ্ধু।

সে বুদ্ধু কেন-তা রঘুর কাছে স্পষ্ট হল না। তাই বলল,

- আমি বুদ্ধু কেন? আমার বুদ্ধি নেই বলছ?

চুলের আগোছালো খোঁপা খুলে গিয়েছিল। আবার সামলে বললেন হিমানী,

- তু বন্‌জারা হ্যায়, অভি সমঝেগা নেহী।

-রঘু উঠল। এবার ফিরে যাবে। লক্ষ করে হিমানী বললেন,

- কী হল রে?

- যাব এখন।

- একটু বসে যা। যাসনে।

- কেন? আবার জ্বর আসছে?

- না, না এমনি।

হিমানী ধমকালেন,

- ধুর! খালি জেরা করে! কাল আসবি আমায় নিয়ে যেতে?

- কোথায় নিয়ে যাব?

- বাহ্ বেটা! ভুলে গেছিস?

রঘু অন্যমনস্কতায় খেয়াল করেনি। খেয়াল হতেই বলল,

-ওহো । ল্যাবোরেটরি। কখন আসব বলো ? ন-টার আগে খোলে না। একটা কথা।

- কী ?

-ইউরিন পরিষ্কার শিশিতে কালেক্ট করে রাখবে। মিড ফ্লো ইউরিন কিন্তু। নাহলে রিডিং ঠিক আসবেনা।

হিমানী আরো রক্তিম হলেন। একটু হেসে বললেন,

-হবে রে ডাক্তারসাহেব।

রঘু যখন দরজার দিকে এগোতে যাবে, তখন কেবল একপলক দেখলেন হিমানী মধুবনির চিত্রকরী।

তারপর রঘুকে ডাকলেন,

-শোন।

ঘুরে তাকাল রঘু। বলল,

- বলো।

-আরো একটু বোস।

-আমি যাব গো।

-যাবি তো জানি। একটু থাক আরো।

- কেন, আবার কী হল ?

হিমানী বললেন,

- সাঁঝ হোনেকো হ্যায়। দিয়া জ্বলাতি হুঁ। ইস সময় ঘর কা বাহর কৌঈ নেহি নিকলতা। তু বৈঠ।

-কেন ?

- যা বলছি মান্য কর বেয়াদপ। সব কথায় এত প্রশ্ন করিস কেন ? মার খাবি ?

এখন হিমানীর জ্বর নিরানব্বইর মতো। রোজ যেমন করেন, তেমনি চান-টান সেরেছেন সেই ভোর ভোর সময়ে। পুজোটুজো করেছেন ঘণ্টা দেড়েক। জ্বর জ্বর ভাব টের পাচ্ছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ তেমন গুরুত্ব দেননি। এখন হাতমুখ পা সব ধুয়ে নিলেন বাথরুমে। কাপড় চোপড় পাল্টে ঘি-র দিয়া জ্বালালেন তুলসী বেদীতে একগুচ্ছ ধূপসহ। তারপর পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হয়ে গেল নিত্যদিনের সন্ধ্যাবাতি।

বিরাট হাভেলির এদিকওদিক দিয়ার আলো দেখাচ্ছেন। একজন পুরোহিত আসেন -বদ্রীজি

পুরোহিত শঙ্খে ফুঁ দিলেন। তীক্ষ্ম ধ্বনি টিকরে টিকরে ছড়িয়ে পড়লো গোটা আঙ্গ্না আর হাভেলির অলিন্দে।

প্রশস্ত লম্বা বারান্দায় পঞ্চপ্রদীপ হাতে হিমানী, পেছনে ছায়ার মতো রঘু।

হিমানী মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। একবার পিছন ফিরে তাকালেন। রঘুকে নিশ্চুপ ইশারায় কিছু বললেন। রঘু বুঝল। তাই এগিয়ে গেল কুয়োতলায়। নির্দেশ। হাতমুখ ধুতে হবে।

সন্ধ্যারতি শেষ। বদ্রীজি চলে গেছেন একটু আগে। দ্বারিকা সদরের পাশে খাটিয়ায় চিৎ। ওটা ওর নিজস্ব। লিচিগাছের তলায় যে খাটিয়া ওতে বসেন স্যার, স্যারের বাবা, গ্রামের বাড়ি থেকে এখানে এলে মা, হিমানী, আর ইদানীং রঘু। প্রথমদিন বসতে চায়নি। স্যার হাত ধরে টেনে বসিয়েছিলেন। সেদিন পাশের মোড়ায় বসে সবজি কুটছিলেন হিমানী।

-অংরেজ কা পোতা খাটিয়া মে বৈঠেগা কিউ!

ফোন এল। কয়েকমিনিট কথা বলে হিমানী ফিরে এলেন রঘুর পাশে। এখন দুজনেই পাশাপাশি, প্রশস্ত বারান্দায়। হিমানী বললেন,

-শ্বশুরজির ফোন। মিটিং আছে। ফিরতে রাত হবে।

-স্যারের ট্রাঙ্ককল আসবে আজ?

- কাল এসেছিল। আজ আসবে না মনে হয়।

- পাটনার কাজ মিটেছে?

কী জানি। কত কাজ নিয়ে যে গেছেন! বিশ্ববিদ্যালয়, পার্টি অফিস , হাইকোর্ট, কত কাজ। এই রঘু।

- বলো।

- তোদের স্যার ক্লাসে ঠিকঠাক পড়ান তো রে?

-হোয়াট ডু ইউ মিন!

-এত যার কাজের ব্যস্ততা, সে কী করে পড়ায়?

রঘু ওর স্যারের পক্ষের শক্তিশালী ডিফেন্স কাউন্সেল। বলল.

-স্যারের কাছে যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়বে, হিউম্যান বডির সব রহস্য জলের মতো সাফ হয়ে যাবে।

রঘুর দিকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে ভিন্ন প্রশ্ন করলেন হিমানী,

-স্যারের উপর তোর ভীষণ আস্থা, তাই না?

-ইয়েস অফ্‌কোর্স।

-খুব শ্রদ্ধা করিস ওকে?

- হি ডিজার্ভজ ইট।

হিমানী এবার দৃষ্টি ফেরালেন অন্যদিকে। আর প্রকৃতই উত্যক্ত হলেন। বললেন,

-তোর মাতৃভাষা তো বাংলা। এতো ইংলিশ বলিস কেনরে? বাংলায় বলবি। আমি বাংলা বুঝি।

-তুম ইংলিশ সে ইত্‌না চিড়তি কিঁউ হো?

হিমানী বললেন অকপট,
-সত্যি বলব ?
-ইয়েস।
-তবে শোন।
-বলো না।
হিমানী বললেন,
-আমার তো টুটাফুটা ইংলিশ। ইংলিশ শুনে চটব কেন ? ভাষায় কোনো দোষ নেই। সব ভাষাই কোনোনা-কোনো জাতির মাতৃভাষা। একে অসম্মান করবো কেন ?
-ইংলিশ বললে রেগে যাও কেন ?
- রাগি কোথায় রে বুদ্ধু ! আমি জানি, তোর যখন খুব জোস্ হয় এক নাগাড়ে এতো দ্রুত ইংলিশ বলিস ? যেন কুয়োতলা থেকে জল তুলে দ্বারিকা হড় হড় শব্দে সব জল ঢেলে দিচ্ছে বাসন কোসনে।
-হোয়াট !
- তোদের কত শব্দের অর্থ যে এখনো জানি না রঘু।
-কোন শব্দ চাচিজি ?
হিমানী প্রায় অসহায় গলায় বললেন এমন, যেন ওর সব আশাভরসা নিঃশেষ,
-ঐযে তুই সেদিন বললি রিলাক্টেন্ট্।
রঘুর ধসকে যায়, অবাকও লাগে হিমানী আবার বললেন,
-আমায় আরো কিছু শব্দের অর্থ বলে দিবি রে হেস্টিংস ?
রঘুর সন্দেহ - ত্রিহুত কলেজের অর্থশাস্ত্রের স্নাতক বলছেন শব্দার্থ বলে দিতে।
বলল ক্ষুণ্নস্বরে,
-কিঁউ মজাক করতি হ্যাঁয় আপ ?
হিমানী তাকালেন রঘুর দিকে। চোখেমুখে ক্রোধও বিরক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্নবর্ণ নেই। এক অভূতপূর্ব লালিত্য ও বাৎসল্য মুখাবয়ব জুড়ে। হাল্কা হাসি ঠোঁটে।
বললেন ধমকের স্বরে,
-এক থাপ্পড় মারুঙ্গি। তোর সাথে ফাজলামো করতে পারি আমি ? বেকুফ !
হিমানীর অপার্থিব মহার্ঘ বিকিরণ স্পর্শ করে রঘুকে। বলল মিনমিন স্বরে,
-মুঝে মাফ্ কর দো ম্যাডাম।
জ্বরের শ্রান্তি ও শুষ্কতা সত্ত্বেও হেসে ফেললেন হিমানী। বললেন,
-ফির ইংলিশি ? এ কালা ক্লাইভ অব লৌট যা। রাত হো চুরি হ্যায়। কাল আনা জরুর।
-কিঁউ ?
-কিয়া হ্যায় রেতু ! নেহি লে যায়েগা মুঝে ? খুন-উন কা টেস্ট করওয়ানে ? বল্‌গম্ (কফ)

তো নেহি হ্যায়। তবু আজ রাতে জোর চেষ্টা করব ঠান্ডা লাগিয়ে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সর্দি লেগে যেতে পারে,

বলেই হাসলেন হিমানী। রঘু পুরোপুরি বিপন্ন। বলল,

-হোয়াট! ঠন্ড্ লগায়েঙ্গি আপ?

হিমানী বললেন,

-তো কী করব? তোর যখন এত শখ আমার সবকিছুর প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করাবি। তোর স্যার এলে দেখাতে পারবি, পড়াশোনা না করি, একটা তুচ্ছ কাজ তো করেছি এতদিনে।

গলার স্বর গম্ভীর নিবিড়তায় একাকার হয় হিমানীর।

রঘু ম্রিয়মান স্বরে বলল,

-তোমার অসুখ তুচ্ছ হল?

হিমানী বললেন একই অতল স্বরে,

-তুচ্ছ নয় তো কী?

রঘুর প্রতিবাদ। বলল,

-নাথিং, নেগ্‌লিজিবল। এখনো জ্বর আছে তোমার

হিমানীর এবার স্বাভাবিক স্বর।

বললেন হাল্কা গলায়,

-অল্প আছে অবশ্য। রাতে জ্বর বাড়লে ঐ ট্যাবলেট আরো একটা খাব ডাক্তারসাহিব?

রঘু বলল,

-থার্মোমিটার তো নেই। তবু যদি মনে করো জ্বর একশ এক হচ্ছে, তখন খেয়ো। খালি পেটে খাবে না।

হিমানী তখন অবোধ। তেমন স্বরে বললেন,

-শরীর ঠিক কতোটুকু গরম হলে একশো এক হয় রে? আমি কী করে বুঝব?

রঘু দমে গেল। বলল,

-টাকা দাও। থার্মোমিটার কিনে আনি। তখন টাকায় পোষায়নি বলে আনিনি।

এতসময়ে হয়তো খেয়াল হয় হিমানীর। বললেন,

-ওহো। দাঁড়া, দাঁড়া, যাবি না। আমি আসছি।

বলে উঠে গেলেন ভিতরে। ফিরে এলেন কয়েক মিনিটে। রঘুর বুকপকেটে একমুঠ টাকা দিয়ে বললেন,

-এবার যা। রাত হচ্ছে। হোস্টেলে ফিরে যাবি সোজা।

রঘু বলল,

- টাকা কেন?

-মঙ্গালবাজারের অষুধ দোকান কি তোর জমিনদারির সম্পত্তি? অষুধ কিনতে টাকা লাগে

না?

-লেগেছে।

- তো?

- কয়েকটা ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল তো মাত্র। এগুলো আমি আনতে পারি না?

- না পারিস না।

রঘু কিছুটা আহত। টের পেলেন হিমানী, এগিয়ে এলেন রঘুর কাছে।

রঘুর বাঁ-গালে নিজের উষ্ণ চেটোর আলতো ছোঁয়া দিয়ে বললেন,

- রাগ করলি? যেদিন নিজে উপার্জন করবি, সেদিন তোর যা যা মন চায় যত পারিস অষুধ পথ্য এনে দিস রঘু, আমি গপাগপ খেয়ে নেব চোখ বুঁজে।

রঘুর অভ্যন্তরে মৃদু আঘাতজনিত তীব্রতা বিশেষ কোনো আকার নেবার আগেই হিমানীর অন্তর থেকে উত্থিত আপাত আবেগহীন কিম্বা তীব্র আবেগে জমাটবাঁধা বাক্য ও কোমল চেটোর স্পর্শে; একটু আগের ক্ষীণ আঘাত অভিঘাত-শরতের মায়া মায়া শিউলি হয়ে যায় রঘুর গভীরে, আর সুবাস ছড়ায়।

একই সুবাসের মোহাচ্ছন্নতায় প্রায় মহাব্যস্ত রঘু বলল,

-তুমি ভেতরে যাও। আমি যাব এবার।

জবাবে হিমানী বললেন,

-যাবি? আচ্ছা। কাল আসিস।

সদরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে রঘু জোরে বলল,

-স্যারের ফোন এলে ওঁকে জ্বরের খবর বল না। খামোকা ভাববেন।

একটু হেসে ক্ষীণ কণ্ঠে হিমানী বললেন

-আচ্ছা , আচ্ছা মেরে বাপ!

(৫)

ঝিলিক ঝিলিকের মতোই দিন কাটায়। রঘুর মতে পড়াশোনায় ভাজ্ঞাড্ডুর চেয়েও পণ্ডিত আছে।মেয়েটা। নাইনে দুবছর লটকে ছিল। টেনে উঠেছে কোনোমতে । কোনোমতে বলা যায়না। রীতিমতো জোরজার করে।

যথারীতি ফেল করেছিল। রেজাল্ট বেরুতেই চিৎকারসহ মড়াকান্না শুরু করে দিল। চিৎকারের ঠ্যালায় প্রায় সব স্যার ম্যাডামরা বললেন,

-পরে দেখা যাবে। আজ বাড়ি যাও। নাউ স্টপ ক্রায়িং।

কে কার শোনে। হাত-পা ছুঁড়ে বারান্দায় এলিয়ে পড়ে ঝিলিক, আর দুহাতে বুক চাপড়ে চেঁচায়,

-না ম্যাডাম। বাবা কেটে ফেলবেন। কিমা বানাবেন।

-কেন কেটে ফেলবেন!

-বাবা খুব নিষ্ঠুর।
-কী?
ঝিলিক বিলাপ করে,
-সবাই নিষ্ঠুর! আমার দর্দ কেউ বোঝে না!
রীতি ম্যাডাম বললেন,
-কী বলছ আবোল তাবোল। সবাই নিষ্ঠুর কেন হবে?
ঝিলিকের জোর কান্নাসহ পাল্টা প্রশ্ন,
-নয় কেন? ফেল করিয়েছে।
-কে ফেল করিয়েছে?
-সবাই।
-মানে?
-চিন্তা করবেন না। আপনি, অন্য ম্যাডাম বা স্যাররা নন। আপনারা তো মনে প্রাণে চান আমি পাশ করি। কিন্তু,
-কিন্তু কী?
ফোঁপাতে-ফোঁপাতে ঝিলিক বলল,
-আপনাদের ইচ্ছে ওরা পূরণ হতে দিল না।
রীতি ম্যাডাম সহ অন্য স্যার ও ম্যাডামরা একটু ভ্যাবাচ্যাকা। কৃষ্ণা ম্যাডাম অন্য ধাতুর। বললেন,
- কী বলতে চাস তুই ঝিলিক?
ঝিলিক যেন নিভন্ত শিখা। তেমনি চোখমুখ করে, চোখের জলের গঙ্গা-কোশি বইয়ে বলল,
-যে হলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, ওরা ফেল করাল।
আপনাদের দোষ দিই না। সব আমার বদন্‌সিব্‌।
কৃষ্ণা ম্যাডাম চটে যান। বলেন, হোয়াট ডু ইউ মিন!
-হলের সবাই টিজ্‌ করল সায়রাবানু, সায়রাবানু বলে!
-কী!
নিতান্ত অবোধ,ভীষণ সরল বালিকার ভূমিকায় কপটকান্নার বাধহীন প্রাবল্যে মাত্রাহীন ফাজিল ও চতুর ঝিলিক বলল,
-আমি কি সায়বাবানু ম্যাডাম? চেহারা হয়তো প্রায় মিলে যায়। কিন্তু তা বলে এমন টিজ কেউ করে। অন্যমনস্ক হয়ে আসল সায়বাবানুর কথা মনে পড়ে গেলো। সিনেমা আমি একদম দেখি না। ফিল্মের গান কোনোদিন শুনি না। পিসিমার সাথে হেমন্ত টকিজে একটামাত্র সিনেমা দেখেছি আজ অব্দি। সাধক কমলাকান্ত। পিসিমা তুলসীর মালা জপ করতে করতে

সিনেমা দেখছিলেন। আমিও।

কৃষ্ণা ম্যাডাম বললেন,

-এর সাথে তোর ফেলের কী সম্পর্ক?

ঝিলিক আত্মপক্ষ সমর্থন করে,

-ঐ অ্যাক্টরনির নাম শুনে আনমাইন্ডফুল হয়ে গেলাম। শেখা জিনিস লিখতে পারলাম না। ফেল হয়ে গেলাম। উঃ মা-গো! তখনই বলেছিলাম আমার সিট পাল্টাই।

আর্তবিলাপ করে আপাতত চিরদুঃখী, শান্ত ঝিলিক। অন্যরা তিক্ত, বিরক্ত।

বৈদ্যনাথ স্যার বললেন,

-ফেল তো করোগি তুম। পড়তি তো হো নেহি।

ঝিলিক হার মানে না। বলল,

-পড়তি হুঁ স্যার। দিমাক মে ভুঁসা হ্যায় তো কিয়া কঁরু কাহিয়ে?

বলেই আরো জোরে জোরে কান্না ছোটায় ঝিলিক। দুপা দুদিকে ছড়ানো। শাদা মিডিস্কার্টে ধুলো সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। রুমালে চোখ নাক মুছে আবার নতুন উদ্যমে অশ্রুমোচন করে।

বারান্দার একটা পোস্টে ঠেস দিয়ে বসেছিল। ওতে মাথা ঠোকার প্রয়াস করে আবার বাদ দেয়। ফেটে-টেটে যেতে পারে, এতটা রিস্ক নেয় না। তবে বুক চাপড়ায়, আর এমন জোরে কাঁদে, মনে হয়,ওর কোনো প্রিয়জন এইমাত্র দেহ রেখেছে।

বারবার একই কথা বলে,

-আমি আমার জন্যে বলছি না।

অহল্যা ম্যাডাম বললেন,

-কার জন্যে বলছ?

-বাবার জন্যে। নিষ্ঠুর হলেও বাবা তো। বাবার হার্টের অসুখ। আমার ফেল করার খবর শুনে হার্ট ফেল করতে পারেন। তখন আমি কী করব গো!

সবাই জমে গেছে ঝিলিকের কাছে। ঝিলিক তখন পুরো ফর্মে আছে। দর্শক টানার সব কৌশল ওর করায়ত্ত।

সবাই লক্ষ করছে ওকে। কতোটা নাটক, কতোটা ঠিকঠিক-পরিমাপ করছে। কিন্তু ধরতে পারছে না। এভাবে হাত পা ছড়িয়ে চোখে নাকে জল সিক্‌নি গড়িয়ে এমন কান্না আর কতো সময় কাঁদা যায়? সুতরাং মোটামুটি সবাই ধরে নিল,সত্যিই তো ফেল করলে ঝিলিকের কত কষ্ট হবে!

খিটখিটে চতুর্বেদীস্যার, ঝিলিককে দুচোখে দেখতে পারেন না। বললেন,

-সব নৌটাঙ্কি। এ লড়কি ঘর যা। আচ্ছাসে পড়াই কর। অগলি সাল পাস হো যায়েগি।

ঝিলিক মনে মনে বলে,

-তোমার মুন্ডু রে ইক্ষুর ছিবড়া!
কিন্তু সক্রন্দন মুখে বলল বিনয়ে,
-আপ আশীর্বাদ কিজিয়ে স্যার। সামনেরবছর অব্দি বেঁচে থাকব তবে না পাশ করব?
ঝিলিকের ইক্ষুর-ছিবড়া বললেন,
-কিঁউ জিন্দা নেহি রহোগি?
ঝিলিকের প্রায় সব চুল কপালে, মুখে, চোখে। গালে গলায় অশ্রু। দুহাত দুদিকে ছড়ানো।
বাঁ-হাতের আলগা মুঠোয় দোমড়ানো মোচড়ানো হাল্কা নীল মার্কশিট—মার্কশিটে একহাজারে একশ তেষট্টি। ঝিলিকের এই সম্বল।
সহায় সম্বলহীন ফোঁপানো তরুণী বলল উদাস গলায়,
-বাবা আমায় ফরাক্কায় পাঠিয়ে দেবেন। ওখানে শেখ মোক্তারের মতো আমার বড়কাভাইয়া আছে। ও আমায় কেটে গঙ্গায় ফেলে দেবে। সব শান্তি হবে।
রঘু জানে- ঝিলিকের দাদা ফরাক্কায় ইঞ্জিনিয়ার। ভদ্র, নিরীহও মেধাবী। ছোটোবোনকে খুব ভালোবাসে। রঘু আরো জানে- ড. মৈত্র মানে ঝিলিকের বাবা, ছোটোমেয়ে বলতে অজ্ঞান। মেয়েকে ভীষণ ভয় পান।
আসলে তিনসন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো বলে আদরে আদরে বাঁদর না বন্দরনি বানিয়েছেন, এটাই অভিমত রঘুর।
একসময় কৃষ্ণা ম্যাডাম এলেন আরো কাছে।
বললেন,
-ইউ, গেট আপ। ডোন্ট ক্রাই।
ঝিলিকের অপার জেদ,
-নো ম্যাম। আই উইল নট।
-এখন ওঠ্। কিছু একটা করা যাবে।
ওদিকে, চিৎকারে উত্যক্ত প্রিন্সিপাল বললেন দপ্তরিকে,
-হু ইজ ক্রাইং সো মাচ!
ইংরেজি না বুঝলেও প্রশ্ন বুঝল দপ্তরি মোহনলাল। বলল,
-ঝিলিক বিটিয়া রোতে রহিন।
-কিঁউ, কিয়া হুয়া?
-ফেল হো গইল স্যার।
প্রিন্সিপাল ঝিলিককে ভালো চেনেন। বললেন বিরক্তির স্বরে,
-রোনে দে। বলে দে, নিজের বাড়িতে যেয়ে কাঁদুক।
সারাবছর পড়াশোনা নেই। এখন কাঁদে উশৃঙ্খল মেয়ে!

ঝা-স্যার মজুমদারস্যার, অহল্যা ম্যাডাম, হেডক্লার্ক, গার্লস্ ইউনিয়ন সেক্রেটারি, স্পোর্টস স্যার সবাই বোঝালেন,

-এই মেয়ে, এখন ওঠো। স্পেশাল কনসিডারেশনে কিছু করা যায় কিনা দেখা যাবে। প্রিন্সিপালকে কনভিন্স্ করা যাবে।

ঝিলিক ঝটপট কাজ গোছাতে বিশ্বাসী। আচমকা কান্না থামিয়ে বলল,

-আজই দেখলে তো হয়। আজকে কী দোষ। যা দেখার আজ, এখন দেখুন প্লিজ। কাল সবাই আমার মরা মুখ দেখবে। ও মাগো মৈঁ কাঁহা যাঁউ!

বিশাল কম্পাউন্ডের চারদিকে তিনতলা দালান। মাঝখানে বিস্তৃত সবুজ ঘাসের মাঠ। দালানে দালানে টিকরায় ঝিলিকের কূটনৈতিক হাহাকার।

রঘু দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল এত সময়।

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে হয় হয়।

কম্পাউন্ডের শেষমাথায় অজস্র পাখি ঝিলিকের সাথে পাল্লা দিয়ে সরব। তবে ওদের পাশ ফেলের মাথাব্যথা নেই।

দূর আকাশে লেজওয়ালা লাল-সবুজ দুটো ঘুড়ির ওড়াউড়ি।

সব স্যার ও ম্যাডাম প্রিন্সিপালসহ শলাপরামর্শ করছেন। কী করছেন ওরাই জানেন। ঝিলিক মাঝে মাঝে কান্না থামিয়ে অনুমান করার চেস্টা করছে ভেতরে কেমন খিচুড়ি পাকাচ্ছেন অন্যান্য স্যার ম্যাডামসহ আখের ছিবড়া। সঠিক অনুমিত হচ্ছে না, অতএব ওর সুরেলা কণ্ঠে বিলকুল বেসুরো চিল্লাচিল্লি।

রঘু নিজের মনেই গুজগুজ করে,

-বহুৎ ড্রামা জানে উল্লুকা-পাঠি!

প্রায় কুড়ি মিনিট পর বেরিয়ে এলেন সবাই প্রিন্সিপালের চেম্বার থেকে।

ডাল থেকে ছিন্ন ফলের মতো মাটিতে পড়ে থাকা অতীব দুঃখী ঝিলিক, নিঃশব্দে ফোঁপায় আর বিড়বিড় করে,

-কোশীতে ডুবিয়ে মারবো যদি পাশ না করায়। ওদের ঘাড় পাশ করাবে। মাই নেম ইজ ঝিলিক।

কৃষ্ণা ম্যাডাম ডাকলেন,

-এই মেয়ে।

অবসন্ন রোগীর ভঙ্গিতে ঝিলিক বলল,

-কী ম্যাডাম?

-ওঠো। বাড়ি যাও।

-কিন্তু প্রমোশন?

- হবে। নাউ গেট লস্ট। ওঠো।

-কেন উঠব। ফেল করেছি। এ টি মেলের তলায় গলা দেব।

অহল্যা ম্যাডাম বিরক্ত হলেন। বললেন,

-প্রিন্সিপালকে কনভিন্স্ করা গেছে।

-মানে?

- মানে, তুমি পাশ ভেরি স্পেশ্যাল কনসিডারশনে।

-তাই?

-হ্যাঁ।

-খামোকা।

-খামোকা কেন?

-এখন আমায় ফুসলিয়ে-ফাসলিয়ে বাড়ি পাঠাতে চান। আপনাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে তাই। আমি যাব না গো। কেউ নেই আমার এই দুনিয়ায়।

কৃষ্ণা ম্যাডাম রেগে যান। ঝিলিকের কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন,

-চেঁচাস কেন রে ক্যাওস্ মঙ্গার? —শুধু শুধু!

-কী শুধু-শুধু?

-প্রমোশন।

-ওঃ কাম অন! কী মেয়ে রে! তুই পাশ তো।

এত শোকে, যাতনায় প্রচণ্ড বিষয়ী মৃত্যুপথযাত্রী আত্মহননে উদ্যমী ঝিলিক দলামচা মার্কশিট প্রায় জোর করে গুঁজে দিল কৃষ্ণা ম্যাডামের হাতে। বলল অনুনয় ও প্রায় আদেশ পাঞ্চ করে,

-ওটা কারেক্শন করে দিন ম্যাডাম।

-আজ হবে না। সন্ধে হচ্ছে দেখছিস না?

মাত্র তিনটে শব্দ

-কী তিনটে শব্দ?

-প্রোমোটেড্ অন কনসিডারেশন।

-তুই কী করে জানলি এই তিনটে শব্দ লেখা হবে?

ঝিলিকের স্পষ্ট জবাব,

-এর আগেও দুবার আমার মার্কশিটে এমন লেখা হয়েছে।

-ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ হবে না। ঝিলিকের পুলিশি জেরা,

-কাল না কেন?

-ইউ ক্র্যাজি গার্ল। টুমোরো ইজ সানডে। ডোন্ট ইউ নো?

-এত দুঃখে সব ভুলে গেছি ম্যাম। পুরো শব্দ না হোক, শুধু লিখে দিলে চলবে। প্লিজ ম্যাম!

অহল্যা ম্যাডাম বললেন,

-বহুৎ অব্স্টিনেট রে তুই ?
এই শব্দটা বুঝলনা ঝিলিক। বলল,
-কী মানে ? আমি সত্যি সত্যি পাশ ?

ঝা-স্যার ও অন্যান্য ম্যাডামরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। স্যার বললেন,
-দে তোর মার্কশিট।

ঝিলিক কৃষ্ণা ম্যাডামের হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল মার্কশিট। ঝটপট দিয়ে দিল ঝা স্যারকে। মার্কশীটের কোনায় স্যার লিখে দিলেন ঝিলিকের অনুনয়-আদেশের মিশ্রন-P.O.C।
স্যার বললেন
-অভ্ উঠ্ বেটি। ঘর যা, সোমবারে মার্কশিটসহ অফিসে আসিস। ক্লার্ক মোহর দিয়ে দেবে। ওঠ জলদিরে নটখটিয়া। আচ্ছাসে পড়াই কর।

ঝিলিক গড় হয়ে প্রণাম করল কেবল ঝা স্যারকে।

অন্যসব ম্যাডামরা এমনভাবে তাকালেন ওর দিকে- দ্যাখো রে, কী অকৃতজ্ঞ মেয়ে! একজনকেই প্রণাম করল।

কৃষ্ণা ম্যাডাম বললেন,
-এখন বাড়ি যা। অনেক হয়েছে। পরে তোর বাবার সাথে চেম্বারে দেখা করব।
-কেন ম্যাম, আপনার কোনো অসুখ ?
-শট্ আপ। অসুখ তোর। সারাতে হবে ?
-বাবা তো চোখের ডাক্তার ম্যাম। আমার ট্রাব্‌ল নেই।

বলেই দূরে দাঁড়ানো রঘুর দিকে চেয়ে সবার অলক্ষ্যে চট করে বাঁ চোখ টিপল ঝিলিক। ভাবটা এমন, দ্যাখ্ বেটা, প্রয়োজনে কীভাবে হাইপ্রেসার দিতে হয়, এতে যতই সিনক্রিয়েট হকনা।

তবু একইভাবে বসে রইল ঝিলিক সবাই ভাবল (কৃষ্ণা ম্যাডাম ও রঘু ছাড়া) -কাঁদতে কাঁদতে অবসন্ন হয়ে গেছে ঝিলিক বেচারী।

বৈদ্যনাথ স্যার বললেন,
-অভ্ কিয়া হ্যায় ? উঠো। ঘর যাও। ইসকো কোঈ উঠাও।

ঝিলিকের এবার প্রকৃতই অসহায় জবাব,
-কী করে যাব স্যার ?
- কেন, হেঁটে যাবে।
- অন্ধকার হবে একটু পরে। ইমারজেন্সি কলোনি পেরিয়ে আমবাগানের পথে একা যেতে পারবোনা স্যার। ওদিকে রাস্তায় আলো থাকেনা। ভয় করে।

স্যার বললেন,

-মেনরোড হো কর রিকসা সে যাও।

রঘু টের পেল ঝিলিকের মতলব।

সরে পড়তে যাবে, তখনি ঝিলিক নিজেই উপায় বলল,

-ওকে বলুন দাঁড়াতে। ওর হোস্টেল আমার বাড়ি এক পাড়ায়।

বৈদ্যনাথ ডাকলেন রঘুকে,

-রঘু ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও। সত্যি তো, সন্ধে হচ্ছে। একা এতটা পথ যাবে কী করে?

সন্ধ্যায় আমবাগানের নির্জন পথে,

শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে ফরাক্কার নিরীহ ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোক্তারের বেতালা ছোটোবোনকে নিয়ে ফিরছে রঘু।

একসময় ঝিলিক বলল,

-দেখলে ক্যারিকেচার?

রঘু জবাব দেয় না। তাই আবার বলল,

-এ ঘমণ্ডী বেকুফ বালক, মজা দেখলে?

রঘু অনিচ্ছায় বলল,

-কী দেখব?

-কী করে মজা জমাতে হয়!

-কী জমাতে হয়?

-ড্রামা!

-তোর ড্রামা তুই দ্যাখ।

আত্মতুষ্টিতে ঝিলিক বলে যায়,

-এতটা হিন্দি সিনেমা দেখে কী শিখলাম তবে? আমার তামাম এক্সপিরিয়েন্স আছে, তাই না?

রঘু কথা বলেনা। ঝিলিক বকে যায়,

-কৈসন্ ড্রামা ফিট্ করলাম। শালা, সব স্যার ম্যাডাম প্রিন্সিপাল লড়খড়াতা উইকেটের মতো লুড়কে গেল!

রঘু বলল,

-তোর চেঁচামেচিতে অতিস্ট হয়ে পাশ করিয়ে দিল।

ঝিলিকের উৎসাহ তুঙ্গে। বলল,

-এটাই চেয়েছিলাম। আজ সকালেই ঠিক করেছি, ফেল তো হবই জানা কথা। কিন্তু এমন হল্লা করব যে সবাই বেকুফ বনে উপরের ক্লাসে ঠেলে তুলে দেবে। একই ক্লাসে দুবছর হয়ে গেছে। এবার ফেল হলে তিনবছর হয়ে যেত খামোকা। বোরিং লাগে তো! কিয়া ইয়ার মেরে বারে মে কুছতো বোলো কোডারমা?

রঘু বলল,
-ক্লাস টেনে কতোবার ফেল করবি ঠিক করলি?

ঝিলিকের স্পষ্ট জবাব,
-মাত্র উঠলাম আজ। দেখা যাক কত বছর থাকি।

রঘু বলল,
-এই ক্লাসে থাকতে থাকতেই তোর নাতিপুতি জন্মে যাবে।

কথা শুনে মজা পেয়েছে। খিলখিল হাসল ঝিলিক ঝর্ণার জলের মতো। একই কৌতুকে চোখ টিপল। রঘুকে বলে দিল অকপট,
-নাতিপুতি তো পরে হবে রঘুবীর। আগে চাই ছেলেপুলে। ছেলেপুলের আগে চাই বিয়ে শাদি। এসবের জন্য চাই মনপসন্দ্ বর। বর কে হবে গো? মজা হবে। ভবিষ্যতে আমার সব নাতিপুতির দাদু হয়ে যাবে তুমি। বলো, হবে?

রঘু ব্রেক কষতে চায়। কিন্তু ঝিলিক বাধাহীন জলস্রোত। বলে দেয়,
-আমি ঠিক করে রেখেছি।
-কী?
-তোমাকে?
-কী আমাকে?
-আমার নাতিপুতির দাদু।
-তোর মাথা!
-চলো না পালাই।
-কোথায়?
-যেখানে খুশি।
-তুই পালা।
-তুমি ছাড়া পালাতে পারি না।

রঘু বিরক্তির গলায় বলল,
-তোর দ্বারা সব সম্ভব। জাহান্নমে পালা।

সহসা গম্ভীর হয় ঝিলিকের স্বর। বলল,
-তুমি এতো খারাপ ব্যবহার কর কেন?

তারপর দূরের শিবমন্দিরের দিকে হাত তুলল ঝিলিক, যেন সাক্ষী করল পাথরের শিবকে। তেমনি আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলল,
-ঐ নীলকণ্ঠকে ছুঁয়ে বলছি।
-কী?
-আমার মনে সত্যিসত্যি কী আছে। যা আছে সব সত্যি?

-কী সত্যি তোর মনে?

ঝিলিক বলল,

-মুখে আর বলব না। পারলে তুমি বুঝে নিয়ো।

নিশ্চুপ হাঁটে দুজনে। ইমার্জেন্সি কলোনির রাস্তা পেরিয়ে কালভার্ট পেরোয়। ঝিলিক ঠিকই বলছিল তখন- রাস্তায় আলো নেই। এখান থেকেই দেখা যায় ওদের বাড়ি আলোয় ঝিলমিল। পাশেই সান্যালদের শাদা তিনতলা দালান। রেলের গোডাউন দক্ষিণদিকে।

বাঁদিকে বেশ দূরে অন্ধকার আমবন। আমবনের পূর্বদিকে শিবমন্দির। শিবমন্দিরে সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজে। আরতি হচ্ছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো বেনারসি ধূপের গন্ধ এদিকেও আসে। একেবারেই হাল্কা ঠান্ডা বাতাস। মন্দিরের মাইকে স্তোত্রপাঠ সান্ধ্যকালীন। সবই হাওয়ায় অনুরনণ তোলে। এরি বিমিশ্র ধ্বনিতে ঝিলিক গম্ভীরস্বরে বলল,

-এই শোনো।

-কী?

- শোনো না।

-বল শুনছি। সংক্ষেপে বলবি।

-তাকাও আমার দিকে।

রঘু তাকায় বলল,

-কী বলবি?

আলো ও আঁধার মেশানো নিরালা পথে চলতে চলতে নৌটঙ্কি ঝিলিক নতুন এক নাটক করল অত্যন্ত ধীরও গম্ভীর স্বরে, যে স্বর ঝিলিকের প্রাত্যহিক স্বভাবের সাথে মেলে না। বলল,

-রঘুদা।

-হুঁ।

-শিবের নামে শপথ করছি।

রঘু পাত্তা না দিয়ে বলল,

-কোন শিব? তোর আত্মীয় কেউ?

ঝিলিক তেমনি শান্তস্বরে বলল,

-শিব আবার ক'-জন? ঐ মন্দিরের শিব।

-কী শপথ তোর?

-এই ক্লাসে মন-দিয়ে পড়বো। শুনেছি তুমি ব্রিলিয়ান্ট। আমায় পড়া বুঝিয়ে দেবে? সব দেখিয়ে দেবে, কেমন?

-আমি ব্রিলিয়ান্ট -ফিলিয়ান্ট নই। আর আমার কি ঠেকা পড়েছে তোকে পড়া বোঝাবার?

ঝিলিকের স্পষ্ট জবাব,

-পড়েছে তো।
-কেন?
ঝিলিক বলল,
-লেখাপড়া শিখে দুজনে,
থেমে গেল ঝিলিক। রঘু বলল,
-কী দুজনে?
ঝিলিকের স্বরে কোনো জড়তা নেই।
বলল আরো স্পষ্ট,
-পালাব।
রঘু চটে গেল। বলল,
-তোর মাথা!
-সত্যি বলছি রে ঘমন্ডি।
-কী বলছিস?
-কান নেই তোমার?
-তোর ফাজলামো শোনার কান নেই।
হাত রাখে ঝিলিক রঘুর পিঠে। কোনো ধরনের কপটতাও রঙ্গ ছাড়াই বলল,
-কতভাবে কতদিন তোমার মনোযোগ টানার চেষ্টা করি তুমিই বলো? তুমি পাত্তা দাওনা, তখন আমার জেদ আরো বাড়ে। আমি উৎপাত বাড়াই। তবু তুমি পাথর। আমায় মানুষ বলে গণ্য করনা। কেন এমন তুমি রঘুদা? তোমার মন বলে কি কিচ্ছু নেই?
রঘুর ভিতর নায়েগ্রা আছড়ায়। জলের অজস্র উদ্দাম রেখা চৌচির হয়। ভিতরের বাতাস ফোলা ফালা হয়। তীব্র জলধারা ধরে রাখার বাঁধ তৈরি করে রঘু মুহূর্তে। ব্যর্থ হয়। কিছুই প্রকাশ করে না রঘু। সময় গড়ায়। সব শান্ত হলে ভাসাভাসা স্বরে বলে,
-তুই আমার কী জানিস রে? জানিস, আমি কে?
ঝিলিক বলে
-এত সব জেনে কি কাজ?এতোটুকু জানি, তুমিই তুমি। এক অহঙ্কারী, একটু উন্মাদ। আর জানতে চাইনা।
রঘু ডাকল,
-ঝিলিক। যেন প্রথমবার কাঙ্খিত মানুষের মুখে শুনলো নিজের নাম। ঝিলিক বলল,
-ওয়ান্ডারফুল!
-কী?
ঝিলিক আবার । বলল,
-ভূতের মুখে রামনাম! আরে নানা। সীতার নাম!

-যা বলছি শোন্। ফাজলামো না।
-বলো।
-তোর বাড়িতে মাথা ঠান্ডা রাখার তেল আছে বলছিলি না?
-আছে মহাভৃঙ্গরাজ। পিসিমা রোজ মাখেন। কেন?

রঘু বলল,
-বাড়ি ফিরে ব্রহ্মতালুতে ঠান্ডা তেল ডলবি। কোষ কোষ জলদিবি মাথার সেন্টার পয়েন্টে। দেখবি ভালো ঘুম হবে রাতে। ইনফ্যাক্ট্ তোর মাথা চড়েছে।
-কী!
-ব্রেনের টেম্পারেচার বেড়েছে। তোর দোষ নেই, এমন হলে সবাই কিছুটা আবোল তাবোল বকে।

আর এভাবেই রঘু সজোরে গুটিয়ে দেয় উন্মোচিত ঝিলিকের ডালপালা। এভাবেই নিভিয়ে দেয় প্রায়ান্ধকার পথে ঝিলিকের আকস্মিক আলোর দ্যুতি। তবু এতোসব বলার পর রঘুর ভর্ৎসনা অস্বীকার করে ঝিলিক ঝিকিরমিকির জ্বলে আপনমনে। বলে হতাশায়
-বহুৎ খড়োস্ আছে বেকুফ লৌন্ডা!

ঝিলিক স্পষ্টতই আহত। জেদি মেয়ে নিজের তুবড়ি মেজাজে ও স্বরে আবার ফিরে যায়। বলে,
-ম্যায় ছোড়ুঙ্গি নেহী তুহে। তুঝে তো কিয়া, তেরা নানি কো ভি মানা লুঙ্গি। মেরি তরকস মে বহুৎ তির বাকি হ্যায়। ঝিলিক মেরা নাম। সালে ইয়াদ রাখনা।

রঘু কিছু বলে না। সত্যি বলতে কী, কিছুটা ঘাবড়ে যায় রঘুর মতো দুরন্ত ঘোড়া। যদি হঠাৎ চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দেয় মেয়েটা- আমি পালাব তোমার সাথে। তখন নিয়ে যাবে বললে কেন? এখন নিয়ে চলো ডরপোক!'

কতকিছু বলতে পারে এই নৌটঙ্কিওয়ালি। মাথায় কোন লাটিম ঘোরাচ্ছে কে জানে। তখন আরেক রংবাজি হয়ে যাবে। ধুর!

বাড়ির গেটে পৌঁছেই একটাও কথা না-বলে ঝিলিক ছুটে গেল বারান্দায়। ওখান থেকেই ঘুরে দাঁড়াল। রঘু গেটের বাইরে।

বারান্দায় আলো। ওর পিসিমা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বললেন,
-এতো দেরি কেন রে?

ঝিলিক বলল,
-কত কিছু অ্যারেঞ্জ করে রেজাল্ট বের করতে হল।

পিসিমা বললেন,
-এবারও ফেল?

ঝিলিকের বিরক্তি এখন। বলল,

-ধুর। চুপ করো তুমি। হ্যাট্রিক কেন করব?

-মানে!

-বুড়ী রে, সসম্মানে পাশ করেছি।

তারপর সসম্মানে উত্তীর্ণা সগর্বে রঘুকে বলল,

-বাইরে কেন? এসো না ভেতরে।

-না।

-না কেন?

-আমি যাব।

-যাবে তো। রাতে কে থাকতে বলছে? এসো।

-না।

বলেই রঘু এগিয়ে গেল সামনে। নেমে এলো ঝিলিক গেটে। বলল জোরে,

-এসো না। একমিনিটে কফি বানাব। এসো, এসো।

-না।

রঘু মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। বেজার ঝিলিক বলল নিজের মনে,

-এত অহংকার ভালো নয়রে ছেলে। পস্তাবি একদিন,

শ্লথ পায়ে বারান্দায় উঠে এল

পিসিমা বললেন,

-ছেলেটা কে রে?

ভীষণ আনমনা ঝিলিক শুনতে পায়নি পিসিমা কী বলেছেন। উনি আবার বললেন,

-বললি না?

-কী?

-ও কেরে?

ঝিলিক কঠিন হল। তবু মুচকি হেসে বলল,

-জানতে চাও, কে?

-কে?

-আমার বর, তোমাদের জামাই। বুঝেছ?

-কী!

-হ্যাঁগো পিসিমা।

-বজ্জাত, নির্লজ্জ মেয়ে। দাঁড়া তোর বাপকে বলব

ঝিলিক বলল,

-ধুর! তুমি কেন? তোমার ভাইয়ের কাছে আমি নিজেই আলাপ দেব গো পিসিমা ভালো দিন দেখে।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে চলে গেল স্বয়ম্বরা সেল্ফস্টাইলড সীতা।

বাইরে বসে পিসিমা গজগজ করছেন তখন।

আজও ইচ্ছে হল এক চড় মারে। কিন্তু মারা যায়না। মেয়ে তো। এক মেয়েকে কী করে মারবে রঘু। মনে পড়ল-রেজাল্টের দিন সন্ধে বেলা বলছিল ঝিলিক,

-চলো পালাই দুজনে।

মেয়েটা আসলে কী চায়? ফাজলামো করে কি? রঘু ভেবে কিনারা করতে পারেনা।

মাঝে মাঝে মেয়েটা ভীষণ সিরিয়াস। ওর প্রকৃত রূপ কি, এ নিয়ে বিরাট এক ধন্দ রঘুর।

রঘু সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল,

-এভাবে আর কতজনকে বলেছিস এর আগে?

-কী বলেছি?

-ঐ যে পালানোর কথা।

ঝিলিক তেতে ওঠে। বলল,

-মানে? আর কাকে বলেছি তোমাকে ছাড়া?

রঘু বলল,

-যাদের বলিসনি, এদের ভাগ্য ভালো।

-তোমার ভাগ্য কি খারাপ হল? অহঙ্কারী অন্ধ কোথাকার! কিছুই দেখতে পাওনা তুমি?

- কী দেখতে পাব?

ঝিলিকের তটস্থ জবাব,

-কেন, আমাকে?

-তোকে কী দেখব?

-সবাই বলে সায়রাবানু। চেহারা ফিগার কত সুন্দর! এসব তোমার চোখে পড়ে না?

রঘু বলল,

-দারার বোনকে চোখে পড়বেনা কেন?

- কী! আমি দারার বোন।

রঘু আশ্বস্ত করল,

-আপন না। সম্পর্কে।

-এই ভালো হবে না বলছি। সেদিনও গায়ের রং-টং নিয়ে যাচ্ছেতাই বলেছিলে। নিজে কী? দাঁড়কাক।

রঘু একটু হাসে। দেখে আরো জ্বলে ওঠে ঝিলিক। বলল,

-শান্ত সুন্দরকে অবজ্ঞা করে খুব মজা পাও, নিষ্ঠুর!

রঘু বলল।
-শ্যাওড়াগাছ চিনিস?
-না।
-দেখবি? একদিন দেখাব তোকে। লছমনের দালানের পেছনের মাঠে আছে একটা গাছ।
ঝিলিক জানেনা। বলল,
-কেমন গাছ রঘুদা? কী ফল ধরে শ্যাওড়াগাছে?
-ফল তো জানি না। তবে,
-কী তবে?
-গাছে তোর মতো চেহারার অনেকে থাকে শুনেছি।
- আমার চেহারার অনেকে থাকে মানে? কারা থাকে?
রঘু আস্তে বলল,
-পে-ত্নি!
-পেত্নি?
-ইয়েস। চুড়েইল! তোর মতো অ্যাগজ্যাক্ট।
নেল পালিশে রঞ্জিত লম্বা লম্বা নখ
রঘুর পিঠে জোরে খোঁচা দেয় ঝিলিক। বলল,
-তোমার মতো অন্ধ কেউ নেই। অপ্সরাকে পেত্নি বলে।
নিজের চেহারা দেখেছিস কালো ভূত!
-সেজন্যেই বলি।
-কী?
-ভূত আর পেত্নি।
ঝিলিকের প্রবল উদ্দীপনা। বলল,
-ফাইন, ভেরি ফাইন! মানলে তবে? মিলে গেল তো।
-কি?
-তুমিই তো বললে এইমাত্র; ভূত আর পেত্নি।
-না।
ঝিলিক বলল,
-আবার কী হল? দুজনের কোষ্ঠি তো মিলেছে!
- কী মিলে গেল?
-কালা ভূত ঔর গোরা পেত্নি।
রঘু বলল,
-নো। মিলেনি। আমার তো সুন্দরী চাই।

- আমি সুন্দরী নই?
-আয়না দেখিস। তোর সব ভুল ভাঙবে।
ম্লান হাসল ঝিলিক এবার। বলল,
-কেন শুধু - শুধু চটাও আমাকে? আমি থার্ডক্লাস, ভ্যাম্প?
রঘু বলল,
- না, না। তুই ভালো। শুধু তোর মাথাটা একটু, আর বলল না 'তুই ভালো'
শব্দদুটো টন টন হাঙ্কা ধ্বনি তুলল ঝিলিকের বুকের আনাচে কানাচে। আলতো ধরল রঘুর বলিষ্ঠ বাহু।
রঘু বলল,
-ছাড়।
-কেন ছাড়ব?
- ছাড় বলছি।
- আমি থার্ডক্লাস ঠিক আছে। কিন্তু আমার হাত আজও নোংরা নয় রঘুদা বিশ্বাস করো।
রঘু ঝিলিকের বুকের অলিন্দে ঘুরে বেড়ায় অনেকক্ষণ। টের পেল কোথাও কোনো আবিলতা নেই। যা আছে-দুরন্তপনা ও চাপল্যের বর্ণে মিলেযাওয়া বহুবর্ণ গভীরতা তাছাড়া আর কিছু নেই।
বলল,
-হাত ছাড় ঝিলিক।
ঝিলিক ছাড়ে না তবু। রঘু ভেবে পায়না-কী করবে এই মেয়েলি দামাল হাওয়াকে নিয়ে, আবার বলল,
-ছাড়।
-ছাড়ব না।
-মার খাবি।
-লজ্জা করে না তোমার?
-লজ্জা কেন?
-খুব পান্ডা হয়েছ? মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে?
রঘু হাল ছেড়ে দেয়। একসময় ঝিলিকমুক্ত করে ওর আঙুলের বাঁধন। ছেড়ে দিল রঘুর হাত।
ফিসফিসিয়ে বলে,
- কী মানুষরে, কোনোকিছুতেই মানে না কেন? অবাক লাগে!

(৬)

চারদিকে তিনতলা দালান। দুটো গেট সামনের দুদিকে। নর্থ আর সাউথ। ইস্টব্লকে লেকচারারস

কমনরুম, প্রিন্সিপালে চেম্বার, অফিস ঘর, ক্যাশ-কাউন্টার, ভিজিটার্স ওয়েটিংরুম গর্লস কমনরুম। এসব পেরিয়ে লম্বা করিডোর। করিডোরের শেষমাথায় লাইব্রেরি হল। লাইব্রেরি ডানদিকে রেখে করিডোর বাঁদিকে মোড় নিয়ে সামনে সায়েন্স ল্যাব। ওয়েস্ট নর্থ, সাউথের সম্পূর্ণ ব্লকে বিভিন্ন ক্লাস। অন্যমাথায় ডানদিকে খোলামাঠের লাগোয়া ইনডোর গেমের স্পেস। ওখানে সবসময় বেডমিন্টনের নেট বাঁধা।

ইনডোর গেমের স্পেসের পর স্টোর রুম। স্টোররুমের পরই বয়েজ কমনরুম ও ক্যান্টিন।

বারান্দা পেরিয়ে মাঠের পূর্বদিকে বিন্যাস মেনে অসংখ্য গাছগাছালির আবাদ। মালিরা কাজ করে। ফুলের বাগান লম্বা টানা ফোর্থগ্রেডের কোয়ার্টার অব্দি।

সায়েন্স ল্যাব ব্লকের মাথায় কংক্রিট ট্যাঙ্ক, জলের। ট্যাঙ্কের মাথায় লাইট্‌নিং অ্যারেস্টার।

চারদিকে দালানের মাঝখানে বড়োমাঠে অনায়াসে খেলা যায় ফুটবল-হকি-ক্রিকেট, স্কুলের সরস্বতী পুজো হয় এই মাঠেই।

এখন ঘড়িতে একটা চল্লিশ। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রিসেস চলছে। আরো পনেরো মিনিট বাকি আছে।

সায়েন্স ব্লকে ক্লাস চলছে টুয়েল্‌ভের। এই ক্লাসের রিসেসের ঠিক ঠিকানা নেই। ঝা স্যারের পিরিয়ড। তারমানে, সময় কী করে কাটবে বোঝাই যাবে না ছাত্রছাত্রীদের।

আজ পড়াচ্ছেন এনডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস। ব্ল্যাকবার্ডের পাশের বড়ো টেবিলে স্লাইড প্রোজেক্টার। কোনায় মেলে রাখা.অফ হোয়াইট প্রোজেক্‌শন স্ক্রীন।

পড়াতে পড়াতে স্যার বললেন,

-ওকে বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। লেট আস টেক রেস্ট ফর ফিউ মিনিটস ওনলি। ইউ ক্যান গো নাউ।

গোটা পঁচিশ ছাত্রছাত্রী বেরোল বারান্দায়। কেউ কেউ মাঠে। স্যার চলে গেলেন কমনরুমে।

মাঠে নামতেই দিয়া এল রঘুর কাছে।

বলল আস্তে-আস্তে,

-এত দেরি কেন?

রঘু বলল,

-ঝা-স্যারের ক্লাস জান তো। স্লাইড প্রোজেকশন ছিল। টপিক ছিলো ফাংশান অব এনডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস। দেরি হবেই।

দিয়া তাড়া দিল,

-ঠিক আছে। নাউ কুইক। চলো।

-আজ না দিয়া।

-ওঃ কাম অন।

রঘুর বাঁ-হাত আলতো ধরে টান দেয় দিয়া। রঘু জানে,কেন নিয়ে যেতে চায়। প্রায়ই নিয়ে যায়। দিয়াদের কোয়ার্টার এখান থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। রিসেসে দুপুরের খাবার খেতে যায় রোজ।

দিয়া, এই শহরে প্রথম বন্ধু। ভীষণ ফিটফাট স্মার্ট সুশ্রী। যাকে বলে আউটস্পোকেন। স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সেক্রেটারী।

দীয়াই প্রথমে যেচে আলাপ শুরু করেছিলেন এখানে অ্যাডমিশন নেবার চারদিনের দিন রিসেসে।

দিয়া বলছিল,

-হাই, হাই ড্যু ইউ ড্যু?

রঘু নর্থ ব্লকের শেষ মাথায় পোস্টে ঠেস দিয়ে আনমনে একা দাঁড়িয়েছে, অবস্থা এমন-ফিশ্ আউট অব ওয়াটার।

দিয়ার সেদিন পরনে ছিল গোলাপি জর্জেট শাড়ি। কালো লম্বাচুল পিঠে কপালে বিন্দি নেই। ধনুকের মতো ভুরু। নিচের ঠোঁটের কোনায় ছোট্ট তিল। লম্বাটে মুখ। গায়ের রং, ভোরের আকাশ, আলো আছে অথচ রোদ নেই-এমন। বাঁহাতে রিস্টওয়াচ। ডানহাতে সোনার বালা।

আঁচলে শরীর জড়িয়ে দিয়া বলল,

-মে আই নো ইয়োর নেম প্লিজ?

-ইয়েস অফকোর্স। রঘু পুরকায়স্থ।

একটু হেসে দিয়া বলল,

-থ্যাঙ্ক্যু। দিস ইজ দিয়া সান্যাল।

-গ্ল্যাড টু মিট্ ইউ দিয়া।

-থ্যাঙ্ক্যু। একা কেন? ক্যান্টিনে চলো।

-নো থ্যাঙ্কস।

-ক্ষিদে পায়নি?

রঘু হাসল। বলল,

-না । তোমার?

-পেয়েছে। চলো। ভজনলাল ফাইন পকৌড়া বানায়। চলো খাবে।

-নো থ্যাঙ্কস।

তীক্ষ্ণ চোখে রঘুর আপদমস্তক দেখে নিয়ে দিয়া বলল,

-অ্যাজ ইউ উইশ।

দিয়া চলে গিয়েছিল অন্য ব্লকে। এটাই প্রথম পরিচয়। দিয়ার একই ইয়ার, তবে স্ট্রিম আলাদা। রঘুর মেয়েটাকে ভালো লেগে গিয়েছিল। কিচ্ছু না, বন্ধুত্ব।

আজ দিয়া বলল,

-তাড়াতাড়ি চলো। মোচার ঘন্ট বানিয়েছেন মা। আমার প্রিয়।

রঘুর প্রশ্ন,

-মোচা কি?

দিয়ার জবাব দেবার আগেই সাউথব্লকের সামনে দাঁড়ানো ঝিলিক খুব জোরে ডাকল,

-রঘুদা!

রঘু ঘুরে দাঁড়ায় দিয়াসহ। ওখান থেকে হেঁটে আসছে ঝিলিক। সেই একই গলায় বলছে,

- প্লিজ একটু দাঁড়াও।

- কেন?

-একটু কাজ আছে।

দিয়া বলল,

-ক্র্যাজি গার্ল। কেন ডাকছে তোমাকে?

-ক করে জানব। তুমি এগোও। আমি আসছি। দেখি কী বলছে।

দিয়া বলল,

-ভীষণ পাজি আছে। কোনও মতলব আছে নিশ্চয়।

-দেখি কী করে।

-ওকে। তাড়াতাড়ি এসো। আমি অপেক্ষা করবো। বলেছি মাকে, আজ তুমিও খাবে।

-ঠিক আছে। তুমি যাও।

দিয়া এগিয়ে যায় মেনগেটের দিকে।

এতসময়ে ঝিলিক এসে পড়েছে বেশ কাছে।

গোটা মাঠ, দালানের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, বারান্দাজুড়ে প্রায় বারোশো ছাত্রছাত্রীর ব্যস্ততা।

কবিতা নামে এক সিনিয়র মেয়ে ছল করে ফ্লাইং রিং ছুঁড়ছে যার তার শরীরে। আর প্রত্যেকবার জিভে কাম ড় দিয়ে বা বিনয়েও বিব্রতবোধে বলছে,

- সরি, এক্সট্রিমলি সরি!

একবার ফেলল ঝিলিকের ইক্ষুর ছিবড়া চতুর্বেদী স্যারের ঘাড়ে। ঘাড়ে পড়তেই স্যার ঘুরে দাঁড়ালেন। জোর ধমকালেন,

-হেই লড়কি! কিয়া হো রহা হ্যায়?

ঝিলিকের দেয়া নাম এখানে সর্বগ্রাহ্য।

নামটা খুব ক্লিক্ করেছে। সুতরাং কবিতা ফিসফিস স্বরে বলল,
-আখের ছিবড়া, মাঠের মাঝখানে কেন তুমি বাপ?

স্যার ধমকাচ্ছেন,
- দেখতি নেহি হ্যায় কিয়া?

কবিতার আকাশচুম্বী আফসোস। মুখে বলল,
-গল্‌তি হো গয়া স্যার! আপনার লাগেনি তো?

ঘাড়ে হাত বুলোতে-বুলোতে স্যার
আবার চলে গেলেন।

এখন ঝিলিক ও রঘুর মাঝখানে অন্তত দশফুটের ফারাক। কবিতার উড়ানো রিং সাঁ করে উড়ে গেল দুজনের দূরত্ব চিরে। ছুটতে ছুটতে কবিতা
হেসে আস্তে বলে গেল রঘুকে,
-এক গাড়ি দুই পট্‌রিতে ছোটে। সাবাস! গোন-অন!

কী এবং কেন বলল, রঘু কিছুটা বুঝল,
কিছুটা বুঝেও বুঝতে চাইল না।

ঝিলিককে বলল,
-কী হয়েছে? কী বলবি?

ঝিলিকের মুখ শান্ত। দৌড়াদৌড়িতে মুখ আরো লালচে। পাতলা ঠোঁট দাঁতে চেপে ধরেছে। পরনে মিডিস্কার্ট জংলাছাপ, উপরে ব্ল্যাক টি শার্ট। হাতে আজ অন্য রিস্টওয়াচ, চৌড়া ব্যান্ডসহ। ডানহাতে কাচের কয়েকটা সবুজ চুড়ি। কপালে কিছু চুল অগোছালো।

ডানহাতে কী আছে রঘু দেখল না,
মানে দেখতে পেলনা।

কথা বলছে না দেখে রঘু শক্ত হল।
বলল,
-ডোনট ইউ হিয়ার মি?

ঝিলিক বলল,
-কী?
-কেন ডাকলি?

ঝিলিকের সুন্দর মুখে বিনয়। কোমলকণ্ঠ
বলল,
-একটু কাজ ছিল। আগে বলো কোথায় যাচ্ছ ঐ সুবেদারনির সাথে?
-ওদের বাসায়।
-এত হ্যাংলা তুমি। যে কেউ বললে গপাগপ্ খেয়ে নেবে?

-কী!
-কেন খাও ওর সাথে ওদের বাড়িতে?
- তোর কী? আমি খাই. যা খুশি করি।
-ইস্! সেদিন আমি বললাম কফি দিচ্ছি বানিয়ে। খেলে না কেন? এখন ভাত গিলতে ছুটছ। ছিঃ!
-কেন ডাকলি বল?

ঝিলিক বলল,

-তুমি না রঘু? সুবেদারনি বলল, আর তুমি ইঞ্জিন ছাড়া শানটিং বগির মতো পেছনে ছুটলে?

রঘু বলল,

-আমি চলি।
-না , না। শোনো।
-কী শুনব?
-কাজ আছে। খুব দরকারি।
-কী?

আর কিচ্ছু না বলে ঝিলিক যা করল তা এরকম;-

হঠাৎ রঘুর বুকে, ভেস্টের তলা ফাঁক করে পলকে ডানহাতে লুকোনো কিছু একটা গুঁজে দিল। আর দিয়েই চোখের নিমেষে দে-দৌড়। সাউথ ব্লক পেরিয়ে কোথায় যে পালাল বোঝা গেলনা।

মাঠ ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেকেই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল।

দিয়া দাঁড়িয়েছিল করিডোরের সামনে। সব দেখছিল এতক্ষণ। এবার এগিয়ে এল রঘুর কাছে। অন্যরা-ও। রঘুর মাথা এখন তপ্ত ফার্নেস। পেলে ছিঁড়ে ফেলবে ঝিলিককে। কিন্তু প্রবল রাগ ও বিস্ময়ে প্রায় স্থবির।

ভেস্টের ভিতর রঘুর নাভির সঙ্গে লেপ্টে আছে বড়ো একখণ্ড আধখাওয়া আইসক্রিম যা একটু আগে ঝিলিক চুষেছে। চুষতে চুষতে লক্ষ করছিল রঘু দিয়াকে। তারপরই এই এক্সিকিউশন, ঝিলিকের দণ্ড, রঘুকে।

অসিত বলে একজন সহপাঠী আর দিয়া রঘুর ভেস্টের ভেতর থেকে বের করল আইস ক্রিমের টুকরো। নিতু নামে নিচুক্লাসের একটা মেয়ে বলল,

-স্যায়রাবানু আইসক্রিম খা রহি থি কুছদের পহলে। ওহি আইসক্রিম হোগা।

দিয়া বলল,

-তুম যাও।

মেয়েটা চলে যেতেই অসিত-ও সরে গেল অন্যদিকে।

দিয়া রঘুকে বলল আবার,

-চলো

রঘু নিঃশব্দে অনুসরণ করে ওকে। দিয়ার গজগজ,

-দিনদিন আনবুলি হচ্ছে মেয়েটা। তুমি রিট্‌ন্ কমপ্লেন্ট দাও। ইউনিয়নের তরফে প্রেসারাইজ করব, যাতে মেয়েটা ক্ষমা চায় তোমার কাছে সবার সামনে।

শান্ত অথচ কঠিন স্বরে রঘু বলল,

-নো।

-হোয়াট নো! প্রতিবাদ করবে না?

-না।

-কেন?

রঘু কঠিন আর। বলল,

-আই শ্যাল হ্যান্ডেল এভরিথিং অ্যালোন।

- কী করবে তুমি?

-পরে দেখবে।

-মারবে ওকে? লক্ষ্মণকে যেমন মেরেছিলে?

-জাস্ট ওয়েট্ এন্ড সি।

দিয়ার তীব্র প্রতিবাদ,

-নো রঘু নো। ডোন্ট ডু দ্যাট। ঝিলিক, লক্ষ্মণ বা রওন না যে ঝটপট হাত চালাবে। ও মেয়ে কিন্তু।

রঘু তাচ্ছিল্যে বলল,

-ধুর, মারব কেন?

-কী করবে তবে?

-ওর সব চুল ছিঁড়ে ওরই হাতে দিয়ে দেব, এই মাঠে।

-একদম না। আমি হতে দেবনা। যা করার আমিই করব। আমি ইউনিয়ন সেক্রেটারি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

-তুমি কী করবে ঐ ভ্যাম্পকে?

দিয়া আশ্বস্ত করল,

-আমায় ডিপেন্ড করে প্লিজ! তোমার মাথা গরম। কী থেকে কী করে বসবে। ও তোমার কাছে ক্ষমা চাইবেই।

রঘু বলল,

-ও চাইবে ক্ষমা?

দিয়া রঘুকে বোঝায়,

-শোনো না। মেয়েটা এমনিতে খারাপ না। কিন্তু ভীষণ, কী বলব, কোনো কন্সিকোয়েন্স সেন্স নেই। পড়াশোনার কথা বলে লাভ নেই। ক্লাসে যার তার চুল টানে, শাড়ি দোপাট্টা টানে। সেদিন ছায়া নামে একটা মেয়ের লম্বা চুলে চিবানো চুইংগাম সেঁটে দিয়েছিল। চতুর্বেদী স্যারের শার্টের সাইড পকেটে শুকনো গোবর রেখে দিয়েছিলো। স্যার বুঝতে পারেননি। ক্যারমবোর্ড ওর সাথে কেউ খেলে না। লুকিয়ে চুরিয়ে হাত দিয়ে গুটি পকেট করে দেয়। আরও কত কিছু করে। তোমার সাথে আমি কথা বললে সহ্য করতে পারে না, আমি জানি। কেন এমন করে তুমি বোঝ?

প্রশ্ন করে একটু থামল দিয়া। রঘু বলল,

-বুঝে কাজ নেই।

দিয়া বলল,

-তোমার পাশে অন্যমেয়ে ওর কাছে, অসহ্য। এর মানে কী হল?

রঘু বলল,

-ওর মাথা হলো।

দিয়া হেসে বলল,

-ঠিক। ওর মাথা গেছে তোমার জন্যে।

-মানে?

-মানে খুব সোজা, ডোনট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?

-আমি বুঝতে চাই না। সব বুঝব ওর চুল ছোঁড়ার পর।

দিয়ার আবার প্রতিবাদ,

-নো। একদম মাথা গরম না। আমি সব দেখবো। ট্রাস্ট্ মি। এখন চলো ক্যান্টিনে। কয়েকমিনিট আছে। বাসায় আর যাওয়া যাবে না।

-তুমি যাও ক্যান্টিনে। আমি যাবনা।

দিয়াকে কিচ্ছু বলার সুযোগ না-দিয়ে রঘু এগিয়ে গেল সাউথ ব্লকের দিকে। পেট বরাবর, শাদা শার্টে লাল দাগ বরফের, ঝিলিকের কাণ্ডজ্ঞানহীন চাপল্যের, যা রঘু ছাড়া আর কারো সাথে করবেনা-এটাই বোঝাবার চেষ্টা ইঙ্গিতে বলছিল দিয়া এতোক্ষণ! আসলে অস্পষ্ট হলেও এটা বোঝাতে পারেনি রঘু নামক এক অস্থির উদ্দাম কেন্দ্রের ব্যাসার্ধে পরিক্রমণরত বহিরঙ্গে স্থির অথচ অভ্যন্তরে চাপা আরো অস্থির এক সঞ্চারণশীল পরিধির রেখা সে নিজেই। দিয়া ভেতরে প্রজ্জ্বলিত হয়।

এ কথাগুলোও বারবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দিয়া হৃদয়ঙ্গম করাতে পারেনি রঘুকে। কারণ, রঘুর এসবে খেয়াল ও মনোস্থিতি নেই। উদভ্রান্তির মেঘ যার আকাশে, তার কোনোকিছুতে কোন অবকাশ থাকে না।

চলে যাওয়া রঘুর দিকে পলকহীন চেয়ে রইল দিয়া। বলল প্রায় না-শোনা স্বরে,

-ঝিলিকের কোন দোষ নেই রঘু। এমন আমারো করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি তো ঝিলিক নই। কী করব?

পরদিন দুপুরে ডাইনিং টেবিলে দিয়া রঘু মুখোমুখি বসেছে। দিয়ার মা দুটো বোনচায়না ডিশে ভাত বেড়ে দিলেন। বাউলে অন্যান্য রেসিপি। অন্যটায় মাছের ঝোল। কাচের ব্যোলে কটিহারের বিখ্যাত দহি।

দিয়া তাড়া দিল,

-মা, কুইক। রিসেসের পর কৃষ্ণা ম্যাডামের ক্লাস। এক সেকেন্ড দেরি হলে উপায় নেই।

ভাতে আঙুল নাড়াচাড়া করছে রঘু। খাচ্ছেনা। দিয়া বলল,

-এই দেরি হচ্ছে তো!

-হুঁ।

তারপর একটু সময় নিয়ে রঘু ডাকল,

-দিয়া

-বলো।

-খিদে নেই।

- কেন? হোস্টেলে কী খেয়েছো?

রঘু স্বাভাবসিদ্ধ জবাব,

-মনে নেই।

দিয়া হাসে। বলল আনমনে,

-সো আনমাইণ্ডফুল! তুমি খাও তো।

রঘু খাচ্ছে। দিয়া বলল,

-ঝিলিককে পেয়েছিলে?

-না।

-পেলে নো ফায়ারওয়ার্ক। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?

-ইয়াহ্। কী বলব আর? একটা সরফিরা লড়কি।

একটু হেসে দিয়া বলল,

-দ্যাট ইজ দ্য স্পিরিট! এখন তাড়াতাড়ি শেষ করো। জানোতো, আপর্ণা সেনের (ছাত্রছাত্রী এ নামে ডাকে কৃষ্ণা ম্যাডামকে, চেহারায় খুব মিল খায় তাই) তাণ্ডব আছে। উনি তোমার তো আবার ফেভারিট ম্যাডাম। তুমিও ওর লাডলা বিদ্যার্থী!

কোনো জবাব না দিয়ে খেতে খেতে রঘু ভাবছে- ঠিকই, কৃষ্ণা ম্যাডামের ক্লাশ মানে আলাদা আকর্ষণ। অবশ্য ঝা স্যারের অ্যানাটমির লেকচার টপ্‌মোস্ট্ ফেভারিট।

কৃষ্ণা ম্যাডাম ডিফারেন্ট এলিমেন্ট। দার্জিলিং লরেচাটার গ্র্যাজুয়েট, যাদবপুরে মাস্টারডিগ্রি। ভীষণ স্মার্ট। পাঁচফুট সাড়ে পাঁচ। ববড়্ হেয়ার। গাত্রবর্ণ যে-কোনো রঙের

কাপড়ে মানিয়ে যায়-এমন। হাল্কারঙ শাড়ি পরেন সবসময়। পায়ে ব্ল্যাকস্যাণ্ডেল , একটু হিল। চোখে চশমা পরেন কোনোকিছু পড়তে, পড়াতে অথবা লিখতে। রোদে ডিপকফি রঙের সানগ্লাস। প্রসাধন প্রায় নেই, অথচ ভীষণ আকর্ষণীয়। সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজনীয় ব্যাপার-রক্ স্ট্যাডি পার্সোন্যালিটি। ইংরেজি শব্দগুলো এমন উচ্চারণ করেন, যেন জিহবা ও তালুতে তুলতুলে মাখন। গলার স্বর ইংরেজিতে যাকে বলে সোনোরাস। রঘু ভাবে প্রায়ই, ম্যাডাম রেডিয়োর ঘোষিকা বা কমার্শিয়াল ফিল্ম কিম্বা অ্যাডফিল্‌মে গেলেন না কেন?

ক্লাসে কোনো স্টুডেন্ট ভুলক্রমে হিন্দি বাংলা বললে উপায় নেই। সোজা ধমক,

-ইউ , নো মোর বেঙ্গালি ওর হিন্দি। স্পিক ইংলিশ। ওকে?

এই সমস্যায় রঘুকে কখনো পড়তে হয়না বরঞ্চ বাঁচে। হিমানী ঝা-র কথা মতো হড় হড় শব্দে দ্বারিকার বাসন কোসনে জল ঢালায় স্বাচ্ছন্দ্য অনেক , রঘুর কাছে।

পড়াতে পড়াতে লক্ষ্য রাখেন ম্যাডাম সবদিকে, রঘু স্বভাবঅন্যমনস্ক। বাইরে তাকিয়ে থাকে, জানালার পাশের সিটে ওর জায়গিরদারি।

সুতরাং ম্যাডামের ক্লাসে অন্তত তিন-চারবার শুনতেই হয়,

-ইউ রঘু, ডু ইউ হিয়ার মি কাম অন, কাম - অন

তারপর বাইরের দিকে আঙুলে দেখিয়ে বলেন,

-হু ইজ দেয়ার?

রঘুর কাঁচমাচু জবার,

-নো বডি ম্যাম।

-দেন হোয়ার ইউ আর?

রঘুর দোষ স্বীকার করে উঠে দাঁড়ায়। বলে,

-আয়াম সরি ম্যাম!

ম্যাডামের হাল্কা ভৎর্সনায় ধমক,

-ইট্‌স্ ওকে! সিট ডাউন বি অ্যাটেনটিভ।

-ইয়েস ম্যাম। আয়াম সরি ওয়ান্স্ এগেন্!

কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব আছে, যাদের সান্নিধ্যে মাথা বা মন অমনি অবনত হয়। এরা খুব একটা ধমকান না। কটু কথা বলেন না। হিংসাদ্বেষ মোটেও করেন না। আবেগ দেখান না। তবু ব্যক্তিত্বে অদ্ভুত এক শক্তি, শক্তি না সম্মোহন! তাও না। একেবারে অন্যকিছু-শান্ত, অনুগত, অবনত করে দেয় রঘুর মতো রগচটা, সময়ে অশালীন যুবককে। কৃষ্ণা ম্যাডাম, সেই বিশাল নগরীর আরো একজন যাকে বলে স্টাইলিশ স্কুলের যোশীম্যাডাম। সেই বিদ্যাদাত্রীর অস্পষ্ট আভাস দেখে এখানে, এই কৃষ্ণা ম্যাডামের মধ্যে।

তাই, তিরস্কৃত হয়েও গমগমকণ্ঠে প্রকৃত বিনয়ে বলে দেয় রঘু ,

-ফরগিভ মি ম্যাডাম। আই কন্‌ফেস আয়াম আনমাইণ্ডফুল

কৃষ্ণা ম্যাডাম একটু অবাক চোখে লক্ষ করেন রঘুকে। ভাবেন,এতটা বলার প্রয়োজন নেই। তবু অন্য গাম্ভীর্যে ও অস্পষ্ট গভীরতার এতটুকু বলল কেন ছেলেটা? যখন বলল, এমন অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে কেন ওর গভীর মায়া মায়া চোখে। এমন যার বিষন্ন চোখ সে এত মারকুটে কেন?

পরমুহূর্তেই ম্যাডাম হয়তো বললেন যা অবাক হওয়ার ব্যাপার, বিশুদ্ধ বাংলায়,
-ঠিক আছে, তুমি বসো। ক্লাসে অমনোযোগী হতে নেই।

সবাই অবাক। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের দুই তুখোড় প্রতিনিধি একে অপরের সাথে বাংলা বলছে।! ফাজিল কবিতা আস্তে আস্তে বলে,
-নো মোর বেঙ্গালি, ইউ অপর্ণা সেন এন্ড রঘু। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার। নাহলে ঘাড়ে ফ্লাইং রিং আছড়াবে!

কবিতার কথা অসিত শুনতে পেয়েছে।
বলল,
-ম্যাডামকে বলব?

কবিতা বলল,
-তোর নিজের জন্যে মায়াদয়া নেই? শালা, আমার নামে লাগাবি?

কৃষ্ণা ম্যাডাম শুদ্ধ সুন্দর উচ্চারণে পড়াতে থাকেন। কোনোদিন ওয়ার্ডসওয়র্থ কোনোদিন ব্রাউনিং, শেলি, কিম্বা কিট্‌স্।

কৃষ্ণা ম্যাডামের উচ্চারণের ধ্বনি অনুসরণ করে নিজের কল্পিত বিশেষ এক দৃশ্যকল্প নির্মাণ করে রঘু আনমনে,বর্ণিত কাব্য ও কাব্যানুসারী ব্যঞ্জনায় দৃশ্যমান ছবি বা চলচিত্র।

রঘু তখন ক্লাসের পরিবেশ ভুলে যায়। অন্যমনস্ক হাটে- ইয়র্কশায়ার, ল্যাঙ্কশায়ার, শেরউডের বনানী, স্ট্যাডফোর্ড তখন- অ্যাবোন, এমনই ইংল্যান্ডের বিভিন্ন 'ভিলে'-যেখানে এর আগে কোনোদিন যায়নি রঘু। ও অনুভব করে, আসলে পুরোনো ইংলিশ কবিরা এমন লিখতেন-যাতে ভিস্যুয়ালস বেশি। ছোটো ছোটো গল্প বা গাথাও ভিস্যুয়ালস্ এক মোহাচ্ছন্নতা আনে,যা পরিষ্কার বোঝাতে পারেনা রঘু কাউকে। কবিতার পরতে পরতে আবার নিজের মতো করেই খুঁজে পায় অন্য ব্যাপ্তি ও এপিসোড। একে এপিসোড বলা যায়।

রঘুর অবিশ্বাস্য লাগে, এমন কবিদের দেশ থেকে রবার্টক্লাইভ নামে এক বজ্জাত এসেছিল ভারতে? এমন কবিতা কবিতা ভাষায়ও রোমহর্ষক অজস্র আদেশের প্রণয়ন করেছিল ব্রিটিশ। সবই সম্ভব। না হলে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বাংলাভাষা, মুন্সি প্রেমচন্দের ঐশ্বর্যময় হিন্দি ভাষায়-ও কতো কুৎসিত কটু বাক্যে ভাষার মর্যাদা বিনষ্ট করে কতোজন, এ চিন্তাগুলো ভীষণ ভাবায় রঘুকে।

ঠিক তখনই হয়তো অতল থেকে তুলে আনে দিয়া,
-রঘু, তুমি আবার অন্যমনস্ক। ম্যাডাম লক্ষ করছেন সব।

বয়েজ ও গার্লস সিটিং আরেঞ্জমেন্টের মাঝখানে আড়াই ফুটের ফারাক।

এই ফারাকেও শব্দ দুকানে ঠিকই পৌঁছায়। দিয়ার শব্দ রঘুর কানে, রঘুর দিয়ার। রঘু একইভাবে বলল,

- আই নো। ডোন্ট্ ওরি। আমি সব শুনছি ম্যাম্ কী বলছেন।

দিয়া বলল,

-বাইরে কী দেখছ?

রঘুর হাল্কা ভাসা ভাসা স্বর আবার,

-নাথিং।

ম্যাম বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। ডাকলেন,

-রঘু।

রঘু উঠে দাঁড়ায়। বলল,

-ইয়েস ম্যাম?

একইভাবে বইয়ে দৃষ্টি রেখে ম্যাডাম বললেন,

-আই হ্যাভ রিবিউকড্ হার সো মাচ! অ্যা ক্রাজি গার্ল।

প্রথমে রঘু বুঝতে পারেনি। বলল,

-হু, ম্যাডাম?

চশমা খুলে রাখলেন ম্যাডাম। তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঘুর দিকে। বললেন,

-ঝিলিক মৈত্র। আই হ্যাভ উইটনেস্ড্ এভরিথিং। এনিওয়ে, এ স্টুডেন্ট শ্যুড বি মোর অ্যাটেনটিভ ইন দ্য ক্লাসরুম, ওকে?

আর কিচ্ছু না বলে কোনোকিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পড়াতে শুরু করলেন, কবিতার তলায় একগাদা টেক্সচুয়াল গ্রামার।

মিনিট পাঁচেক পর কবিতাকে জিজ্ঞেস করলেন,

-ইউ ইয়াং লেডি, প্লিজ স্ট্যান্ড্ আপ।

চারদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে মৃদু কামড় দিয়ে কবিতা দাঁড়াল। আন্দাজ করেছে, ম্যাডাম ওকে কিছুটা শানটিং(ঝিলিকের ভাষা) করাবেন।

বলল,

-ইয়েস ম্যাডাম?

চোখে চশমা আবার পরেছেন কৃষ্ণা ম্যাডাম। জিজ্ঞেস করলেন,

-ডু ইউ নো দ্য মিনিং অব্ সিনিউজ্?

সবাইকে রিং মেরে আপ্যায়ন করনেওয়ালি খেলুড়ে কবিতা শানটিংএ পড়ল। আমতা-আমতা স্বরে বলল,

-ইয়েস ম্যাম, নো ম্যাম, ইয়েস ম্যাম।

-হোয়াট!

-আই নো ম্যাডাম, দ্য মিনিং অব,

বাক্য সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে ম্যাডাম শীতল কঠিন আদেশ দিলেন,

-ফ্রেম এ সেনটেন্স্ ইউজিং দ্য ওয়ার্ড সিনিইজ।

কবিতা বেলাইনে শানটিং করল,

-মাই সিনিউজ ইজ স্ট্রং।

ম্যাডাম গর্জালেন,

-শাট আপ, ইউ নোটোরিয়াস গার্ল!

দাপটের চোটে কবিতার সব বগি কামরা আউটলাইনে ছত্রাখান! কবিতার বাবা রেলের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের বরিষ্ঠ প্রকৌশলী। কিন্তু সব প্রকৌশলের পাঠ হয়তো এখনো নেয়নি পিতার কাছে। তবু যেমন -তেমন পারে পরিত্যক্ত লাইন থেকে ক্ষীণ হুইসল দিল,

-ম্যাডাম, লেট মি কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স।

-আই সেইড্ শাট্ আপ!

-ইয়েস ম্যাম।

কৃষ্ণা ম্যাডাম আবার বললেন,

-ডোন্ট্ টাচ্ ফ্লাইং রিং এগেন। আই উইট্নেস্ড দ্য পাওয়ার অব ইয়োর মাস্ল্স্। এ-ডে -বিফোর ইয়েস্টার ডে ইউ হিট মি. চতুর্বেদী ডেলিবারেটালি, ইজনট ইট?

কবিতা প্রতিবাদ করে,

- নো ম্যাম, বিলিভ মি।

কোনো পাত্তা না দিয়ে

ম্যাডাম বললেন,

-নাউ সিট্ ডাউন। ইউ আর লাইং!

এই হলেন কৃষ্ণা ম্যাডাম। একবার রায়গঞ্জ গিয়েছিলেন কী এক কাজে নিজেদের গাড়িতে রাস্তায় নামতেই অনেকে ঘিরে ধরেছিল- অপর্ণা সেন' বলে-এমন গল্প রওন সংগ্রহ করেছে। কীভাবে করল সে-ই জানে। এমন গল্প রওন আরো কতো বানায়, শেষ নেই।

ক্লাসের পর রঘুকে করিডোরে ডেকে পাঠালেন কৃষ্ণা ম্যাডাম। বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন,

-রঘু শোনো।

-ইয়েস ম্যাম?

-ওঃ নো মোর ইংলিশ!

-সরি ম্যাম।

-আবার?

একটু বিব্রত হেসে রঘু বলল,

-বলুন ম্যাম।

-একদিন এসো।

-কোথায়?

-কোয়ার্টারে। চেনো কোয়ার্টার কোথায়?

-শুনেছি। অফিসার্স্ কলোনিতে আপনি থাকেন আপনার স্বামীসহ।

-ঠিকই শুনেছ। কলোনির জি ব্লকের চারনম্বর।

-কোন কাজ ম্যাম?

-হ্যাঁ।

-ক্যান্ আই নো দ্য রিজন,

কথা শেষ করতে না দিয়ে কৃষ্ণা ম্যাডাম বেশ জোরেই বললেন,

-আছে। আমার জন্ম পুনায় হয়েছিল। বাবা ডিফেন্সে ছিলেন, সাত বছর অব্দি ওখানে ছিলাম আমরা। আউন্দের স্পাইসারস্ কনভেন্টে পড়তাম। পাশেই পুনার বিখ্যাত ফ্রুট্ গার্ডেন। তুমি ও তো পুনায় ছিলে, তাই না?

-আপনি জানেন ম্যাম?

-জানি। মি. ঝা বলছিলেন সেদিন।

দীর্ঘ করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিল। কৃষ্ণা ম্যাডামের পাশাপাশি হাঁটছে রঘু। একবার মৃদু ঘষাঘষি হল রঘুর উর্দ্ধবাহু ও ম্যাডামের কাঁধে। রঘু মৃদু স্বরে বলল,

-সরি ম্যাম।

উনি বললেন,

-ইট্স্ ওকে।

তারপর আবার বললেন,

-যেদিন আসবে আমার ওখানে, এর আগে ফোন কোরো।

নাম্বার তো তোমার জানা নেই?

-নো ম্যাম।

-ছুটির পর এসো কমনরুমে। লিখে দেব।

-আপনি বলুন। আমি পামে লিখে নিচ্ছি।

একটু হেসে কৃষ্ণা ম্যাডাম বললেন,

-ভালো রাইটিং প্যাড্ পেয়েছ।

রঘু হাসল। বলল,

- পরে কাগজে তুলে নেব।

-তুলে নিয়ো।

এরপরই প্রায় আকস্মিক, একেবারেই ভিন্ন কথা বললেন, কৃষ্ণা ম্যাডাম,

- হাতের চেটোয় কত কিছু লেখা যায় রঘু।

কিন্তু সব, প্রায় সব মুছে যায় একদিন।

বলেই কমনরুমে চলে গেলেন। করিডোরের পথে ফিরে আসছে রঘু একা। নিজের চেটো মেলে ধরল চোখের সামনে। ওখানে টেলিফোন নাম্বার, আর কানে ম্যাডামের উচ্চারিত ভিন্ন বাক্যের ভিন্নতর মর্মার্থ- 'প্রায় সব মুছে যায় একদিন।'

রঘু ভাবে,কই না তো! চেটো থেকে মুছে গেলেও বুকের অতল গভীরে সেই অবুঝ, তপ্ত নিরালা কত মানুষের কতো উচ্চারিত ধ্বনি চিরকালীন লিপি হয়ে যায়।

আইসক্রিম ধরা নেহার চেটো আমার গোপন চেটোয় এখনো ধরা, এ বৃত্তান্ত তো আর অপর্ণা সেনকে বলা যায় না।

ম্যাডাম এমন কথা কেন বললেন কে জানে? রঘুকে আর কিছুই বললেন না।

পরের সপ্তায় নর্থ ব্লকে সিড়ি যেখানে টার্ন নিয়ে কয়েকধাপ উপরে উঠেছে, সেখানে পেয়ে গেল ঝিলিককে। আজো ইউনিফর্ম ছাড়া ফিটফাট ক্লাস টেনের নামজাদা ছাত্রী।

যেন দেখতে পায়নি, রঘুকে পাশ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। রঘু ডাকল,

-এই শোন।

এমনভাবে ঘুরে তাকাল ঝিলিক, এক্কেবারে নতুন দেখছে রঘুকে। ডানহাতের তর্জনী বুকের মাঝখানে রেখে নিঃশব্দ ইঙ্গিত করল। বলল যেন,

-আমি? আমাকে ডাকছ?

জবাব জেনে নেমে যাচ্ছিল ঝিলিক। রঘু আবার ডাকে। এখন থার্ড পিরিয়ড চলছে। সবাই যে যার ক্লাসে। চাপরাশি লতিফ নেমে গেল গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঝিলিক রঘুর পাশ ঘেষে। একবার চেয়ে দেখল, কী হচ্ছে, গুজুর ফুজুর এখানে। বলতে সাহস করল না কিছুই। ঝিলিক আর রঘুকে হাড়ে হাড়ে চেনে। ঝিলিক , রঘু অহংকারী আর দাদা,পান্ডা।

ফাইল হাতে চুপচাপ নেমে গেল লতিফ। ঝিলিক আস্তে, সাবধানে সিঁড়ি নামে। রঘু ধমক দিল,

-এই মেয়ে, তোর কান নেই?

মুখ ঘুরিয়ে ভ্যাব্‌লির মতো তাকাল ঝিলিক। বলল,

-আমাকে বলছেন?

-আর কাকে বলব?

শুনতে না পাওয়ার ভান করে অন্য কথা বলল ঝিলিক,

-কী বললেন? আপনি বলবনা? কিন্তু আমি সব সিনিয়রদের আপনি আপনি বলি।

রঘু তখনো ধরতে পারেনি,ঝিলিক কি করছে। বলল,

- চোপ ইডিয়ট।

-কী?

-দাঁড়া।

ঝিলিক দু কানে আঙুলে ঢোকালো। খোঁচাল এমন যেন কানে তালা। বলল,

-কোন পাড়া?

-দাঁড়া বলেছি। পাড়া নয়।

যেন কিছু বোঝেনি, ঝিলিক বলল,

-হ্যাঁ।

-সেদিন এমন করলি কেন?

ঝিলিক পুরোপুরি বধিরের ভূমিকায়। বলল,

-সর্দি ছিলো? আপনার?

-ধ্যাৎ!

-রোদ? রোদে বেরুবেন না। কমে যাবে।

-হেই ফাজলামো না। মার খাবি। মারব ঝাপড়।

ঝিলিক না শোনার ভান করেছে। অতএব ওকে শোনায় কার সাধ্য। বলল,

-পাঁপড় খাবেন? ক্যান্টিনে সাবুর পাঁপড় আছে। খাবেন?

-চুল ছিঁড়ব তোর।

দুদিকে মাথা নেড়ে বলল ঝিলিক,

-কুল নেই। এখন তো সিজন্ নয় কুলের।

রঘু আগেই বোঝেছে ত্যাঁদড় মেয়ে কী করছে। বলল,

-গরম লোহার রড ঢোকাব তোর কানে। তখন সব শুনবি।

ঝিলিক বানানো বোকা বোকা হেসে

বলল,

-ধরম? এখানে এ নামে কোন ছাত্রকে আমি চিনিনা সত্যি। এক আছে ধর্মেন্দ্র। তা-ও সিনেমায়। ফুল ঔর পত্থর দেখেছো? মীনাকুমারী কত কাঁদল। লিটার লিটার চোখের জল!

রঘু আরো এগোয়। ঝিলিক কয়েকধাপ আরো পিছোয়। ভরসা নেই। রওনের চোয়ালে যেভাবে ঝেড়েছিল। তেমন ঝাড়লে সব দাঁত খুলে টুলে বিশ্রী অবস্থা হবে। কেউ আর সায়রারানু বলবেনা।

রঘুর চাপা গর্জন,

-ওভারস্মার্ট হয়েছিস না?

ঝিলিক একনাগাড়ে চালায়,

-না। স্কার্ট পরিনি আজ। সালোয়ার কামিজ সুন্দর না? দ্যাখো দ্যাখো কী কালার!

হুইটিশ ইয়েলো। তোমার কোন কালার পছন্দ? ব্ল্যাক না ডিপ গ্রিন?

দুজন স্যার এলেন সিঁড়িতে

ওরা উপরে যাবেন।

একজন অর্থাৎ কেমিস্ট্রির সিনহাস্যার বললেন,

-কি হলো? তোমাদের ক্লাশ নেই? ক্লাশে যাও তোমরা।

ঝিলিক এবার ঠিকই শুনলো।

বলল,

-যা রহিঁ হুঁ স্যার। নেসফিল্ডের গ্রামারটা আমার নেইতো। তাই ওর কাছে চাইছিলাম। ও নাকি দিয়াকে দিয়েছে। আমি বলছি আমায় এনে দিতে। খুব দরকার আমার। দো-চার দিন মে লৌটা দুঙ্গি শায়দ।

দুজন স্যারই ভাবলেন,ঝিলিক এতো পঠনপাঠনশীলা হল কবে থেকে! সিনহা স্যার সিঁড়ি বাইতে বাইতে বলে গেলেন,

-রঘু দো দো উসকোজো মাঙ্গাতি হ্যায়।

ঝিলিক বলল, আস্তে,

-এতোদিন থেকে আমিও এই বোঝাচ্ছি গুড়িয়াবাবু (ঝিলিকের দেয়া নাম)

এরা উপরে উঠে যেতেই ঝিলিক বলল,

-কেন ডাকছিলে?

-কেন করলি এমন সেদিন?

ঝিলিকের স্পস্ট উত্তর,

-দিয়ার সাথে কেন যাবে তুমি?

-কী?

-ইয়েস সুবেদারণিকে বলো শুধু গল্পটল্প করতে। আরো এগোলে দিয়ার বাতি নিভিয়ে দেব। আয়াম ঝিলিক

-তোর মাথা খারাপ।

-তোমার জন্যে।

-কী আমার জন্যে?

-যেদিন জ্বল কয়লা ঢালব তোমার বুকে সেদিন বুঝবে বেকুফ

সব কক্ষে অধ্যয়ন চলছে। এই সিঁড়ির ধাপ ফাঁকা। এখানে দুই বিদ্যার্থী অন্য অধ্যয়নের বুননে রত। বুনন করে ঝিলিক আরওতে জড়াতে চায় রঘুকে।

ঝিলিক বলল,

-তোমাকে খুঁজছিলাম।

-আমাকে? আবার কী ফেলবি?

-কিচ্ছু না।

-তো?

-ক্ষমা চাইতে।

-ক্ষমা?

-হ্যাঁ। দিয়ার সাথে যেই তোমাকে দেখলাম, মাথা বিগড়ায়।

-কেন?

-জানি না, এত সব জানি না।

-এখন পালাচ্ছিলি কেন?

ঝিলিক বলল,

-ভয়ে।

- কেন?

- যদি মারে মাথাগরম ছেলে।

-মারবনা। তুই মেয়ে। আচ্ছা যা।

ঝিলিক বলল,

- সুবেদারনি প্রিন্সিপালকে লাগিয়েছে। প্রিন্সিপাল খুব বড় ঝাড় দিয়েছে আমায়। বলেছেন, আর যদি এমন করি বের করে দেবেন ইনস্টিট্যুট থেকে।

ঠিকই বলেছেন। দেবেন তো!

ঝিলিক মারমুটে চেহারা ধরল,

-এঃ। কারো বাপের সম্পত্তি, বের করে দেবে? পাটনা অব্দি হিলে যাবে। এছাড়া তুমি তো আছ।

-আমি! আমি কী করব?

-বাঃ! তোমার ঝিলিকের উপর ঝড় বইবে। তুমি কিচ্ছু করবেনা সেল্‌ফিশ?

-আমার ঝিলিক?

চোখ টিপে ঝিলিক আস্তে বলল,

-ইয়াহ। এখন যাই।

প্রায় দৌড়ে নেমে গেল গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

রঘু একা সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিল, এই জঙ্গলি চলমান লতানে উদ্ভিদকে সামাল দিতে হলে খুবই সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত ছক কষতে হবে ঠান্ডা মাথায়। তবু, 'তোমার ঝিলিকের উপর ঝড়' এই চারটা শব্দ বহু, অজস্র ধ্বনি হয়ে ছিতরে গেল রঘুর মগজ ও অন্য কোথাও।

ক্লাসে না গিয়ে ক্যান্টিনে এল এখন। এ পিরিয়ডে রঘুর স্ট্রীমে কোন ক্লাস নেই। অন্যদের ক্লাস চলছে এ ব্লকে। বাকিরা কমনরুমে বা ক্লাসে এমনি বসে আছে। রওন আসিত

লাপাত্তা নির্ঘাৎ। থিয়েটারে কী এক হিট হিন্দি ছবি আজ রিলিজ হচ্ছে। রঘু একবার ভেবেছিল-চলে যায়। অন্যথিয়েটারে ম্যাটিনি চলছে- প্যারাডাইন কেস'। গ্রেগরি পেক্ গোয়েন্দা, আগাথা ক্রিস্টির গল্প। এর মানে জবর কেমিস্ট্রি।

কিন্তু গেল না। অন্যদিন দেখলে চলবে, এরপরই ঝা স্যারের ক্লাস। বিশেষ এক বস্তু পড়াবেন আজ। বোন-মেরো। এ ক্লাস ছাড়া যায় না।

চেয়ারে বসতেই ক্যান্টিনওয়ালা বলল,

-কী দেব রঘু ভাইয়া?

রঘু বলল,

-চা হবে?

-একটু অপেক্ষা করতে হবে। নতুন লিকার হচ্ছে। আর কিছু দেব? বুমালি রেটিওর কাচ্চা টমাটর কা সবজি ভি হ্যায়।

-না। আপাতত এককাপ কড়কদার চা।

-ঠিক আছে। দিচ্ছি।

ক্যান্টিনওয়ালা ডাকল বয়কে। ভজন। নামে তো বয়। বয়স অন্তত তিরিশ। মণিহারি ঘাটে বাড়ি গঙ্গার পারে। গঙ্গা ভেঙে নিয়ে গেছে খেত - জমিন, ঘর-বসত। বন্যা ও বাতাসে যখন প্রবল ঢেউ ওঠে নদীতে -দুপারেই গঙ্গা একনাগাড়ে মাইলের পর মাইল ভেঙে দেয়। মণিহারী ঘাটে নদী ভীষণ চৌড়া। কোশী আরো খ্যাপা, গতি বদলায়। এভাবেই সবকিছু খোয়ানো অনেকে স্রেফ গঙ্গাজির কৃপায় ঘরবার খুইয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে ছিটকে যায় রোটির সন্ধানে। ভজনও তেমন একজন। তিরিশবছরের ক্যান্টিন বয়। ভজনকে সবাই ডাকে ভজনুয়া।

ভজনুয়া চা দিয়ে গেল। একবার হাসল রঘুরদিকে চেয়ে। বলল,

-ঠিক বা রঘুভাইয়া?

রঘু ও ভাজনুয়ার খুব মিলাপ্। যেদিন প্রথম চা খেতে এসেছিল রঘু সেদিন থেকেই। একগ্লাস জল রেখে দাঁড়িয়েছিল ভজনুয়া।

রঘু বলেছিল,

-কিয়া বাত হ্যায়? কুছ কহোগে?

-ঔর কুছু চাহিয়ে ক্যা?

-চা এককাপ। শক্কর কম।

-জি বহুৎ আচ্ছা।

তবু দাঁড়িয়েছিল ভজনুয়া।

রঘু জিজ্ঞেস করেছিল,

-কুছ বোলোগে?

-জি সাহিব।

-কিয়া হ্যায় বোলো।

-পিছ্‌লে হপ্তা আপ গয়ে থে মণিহারী ঘাট?

-হাঁ, কিউঁ?

-অপকো দেখা হুঁ হম। হোটেলুয়া মে খানা খা রহেথে দোস্ত কে সাথ।

-হাঁ। ফির?

-নেহি, কুছ নেহি। চায় লাতা হুঁ। আপ বৈঠো।

এভাবেই পরিচয় ও আলাপ। রঘু গিয়েছিল গত সপ্তায় মণিহারীঘাট এমনি। মিরচাইবাড়ির প্রথম বন্ধু বিশ্বনাথ ছিল সেদিন।

বেশি দূর তো নয়। মাত্র দুঘণ্টা। ট্রেনে বাসে, ট্যাক্সিতে, তিনচাকা টেম্পোয় যাওয়া যায়। দুজনে গিয়েছিল মণিহারীঘাট প্যাসেঞ্জারে। সকাল নটায় পৌছে গিয়েছিল মণিহারীঘাট স্টেশনে। ধূ-ধূ বালুচর। শুকনোর দিন। ওপারে সুক্রকলিঘাট। মাঝখানে বিশাল গঙ্গা। অস্পষ্ট হলেও ওপারে দাঁড়িয়ে আছে-শিয়ালদা প্যাসেঞ্জার। মনে হয়, ঐ দূর নদীর বিস্তার পেরিয়ে অনেকদূরে সাদা বালুকা প্রান্তর ও দিগন্ত যেখানে মিলেছে, সেখানে খয়েরি চকের অঙ্কিত রেখা। রেখার একমাথায় কালো ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের মাথায় ধোঁয়া ওড়ে। তীক্ষ্ণ হুইসল এপারে ভেসে আসে গাঙেয় হাওয়ার ডানা ভর করে-হু-ই-ই-ই।

নদীর বুকে জাহাজ। জাহাজের আকাশমুখী বয়লারে গভীর কালো ধোঁয়া। বড়ো ভারিক্কি ডাক তোলে- ভোঁ-ও-ও-ও।

অর্থাৎ দাঁড়াও আসছি। নদী পার করে দেব। ঐ দ্যাখো ওপারে আছে বাষ্পের দীর্ঘশকট।

পৌছে দেবে তোমার মনমতো জনপদ-বোলপুর বর্ধমান, দমদম, শেষঅব্দি শিয়ালদা।

রঘু একমনে ওপারে চেয়ে-চেয়ে এসবই ভাবে। ট্রেন ও জাহাজের সাথে সখ্য করতে কার না মন চায়। একজন কোন দরিয়ায় ভেসে যায়। অন্যজন দিন নেই, রাত নেই কোথায় কোথায় যে ছুটে যায়।

নদীর পারে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে,তখন বাস বড়জোর নয়-দশ। এই ঘাট থেকেই জাহাজে নদী পেরিয়েছিল ওরা সকালে, তখন সূর্য উঠেছে। তখন মা ছিলেন।

সেবার নদী পেরিয়ে আবার বালুচর। ট্রেনে ভিড়। তবু জায়গা জুটে যায়। ফাস্ট ক্লাস বগি। টিকিট ঐ ক্লাসের। ট্রেন ছেড়েছিল দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ। ট্রেন যতই এগোয়, পাশের গঙ্গা সরে যাচ্ছে দূরে বা ট্রেনের দিক বেঁকে যায়। ট্রেনের পথ সরতে সরতে গঙ্গা সরে গেল অনেকদূরে, নদী আর দেখা যায় না।

ছুটন্ত ট্রেনের দুদিকে লালমাটির খোলা প্রান্তর। উদাম আকাশ আর মাঠ। প্রান্তর শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কী, এমন ভূগোলে না এলে ঠিক বোঝা যায় না। হা হা মাঠ। মাঠের

বুক চিরে আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ। পথ ধরে দুলতে দুলতে বয়ে নিয়ে যায় চারজন এক পালকি। ছুটন্ত ট্রেন থেকে বোঝা যায়নি পাল্কিতে কে যায়। কোনো অন্তঃপুরবাসীনিই হবে, এমন অনুমান করেছিল রঘু সেদিন। পাল্কি বয়ে নিয়ে যায় বাহক দূর কোন গ্রামে। চলন্ত ট্রেন থেকে কতদিন আগে দেখা এ-দৃশ্য এখনো মনে গেঁথে আছে। কড়া রোদ তখন। খোলা প্রান্তরে দূরে মিলিয়ে যাওয়া পাল্কিবাহী কাহারদের ছবি তুলেছিলেন বাবা কোঁডাক ক্যামেরায়।

এমন ট্রেন, প্রতিটি স্টেশনে কুশল বিনিময় করে, থামে। কখনো ছোটে মিলখা সিং যেমন। মর্জি হলো তো কচ্ছপ। আবার কোনোসময় থেমে যায় ধূ ধূ প্রান্তরে, স্টেশন উশন কিচ্ছু নেই। লালমাটির পথ দেখে নেয় হয়তো। ঐ পথে যেতে মন চায়। কিন্তু গমন রেখা তো বাঁধা, পাশাপাশি দুটো লোহার লাইন। কী আর করবে, একটু দম নিয়ে, চারদিকের রুক্ষ সৌন্দর্য দেখে নেয় পলভর।

আবার এক ছুটে আরো কয়েক মাইল। ছোটো ছোটো খেলনার মতো নদী পড়ে মাঝে মাঝে। এদের নদী না বলে, নদীর স্মৃতি বলা যায়। জল নেই, জলকেলি নেই।

সেই সময়টা ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি কোনো একদিন। সাল ১৯৫৯।

ট্রেন পেরোয় ভায়াডাক্ট্। সময় গড়ায়, ট্রেনের চাকা গড়ায়,পথ পেরুতে পেরুতে দূরত্বের রেখা অঙ্কিত হয়। যাত্রীদের চোখ ভার হয়, ঘুমঘুম লাগে।

এভাবেই মর্জিমাফিক ছুটতে ছুটতে হাঁটতে হাঁটতে , গড়াতে গড়াতে, খামখেয়ালি ট্রেন পৌঁছায়। এমন এক জনপদে যার ভুবনজোড়া নাম- শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

রেলের প্ল্যাটফর্মের দুমাথায় গাবদা-গোবদা সিমেন্টের হলুদ পটে কালো অক্ষরে বোলপুর শব্দের পাশে প্রথম বন্ধনীর পরিসরে আঁকা, শান্তিনিকেতন।

কেন যে এমন গান লেখা হয়েছিল-'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ'-এখন , এই বয়সে বোঝে রঘু। তখন বোঝেনি হাওয়ায় ধুলো তো নয়, আধপোড়া হলুদবর্ণ আবির ওড়ে।

বিখ্যাত জনপদ পেছনে ফেলে ট্রেনের আবার হাঁটা বা ছোটা। বিকেলের পর ক্লান্ত পায়ে বর্দ্ধমান। মা সেবার মিহিদানা কিনেছিলেন।

রঘু বুঝতে পারেনি ওখানকার মিহিদানা কেন বিখ্যাত। খেয়ে দেখেছে-এত মিঠে, ধুর!

শান্তিনিকেতন কেন বিখ্যাত বোঝা গেল, ওখানে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ।

বর্ধমানের মিহিদানার চেয়ে কাটিহারের টকদই আর খুদে সমোসা অনেক স্বাদিস্ট।

রঘুর এখনো মনে আছে,যখন রোদ পড়েছে, তখন ট্রেন পেরোয় বালিব্রিজ। বাঁদিকে দূরে স্পস্ট দক্ষিণেশ্বরের গ্রামবাংলার কুটিরের নমুনায় মন্দিরের চুড়ো।

ছোট্ট স্টেশন দমদম পেরিয়ে গেল একসময়। স্টেশনের পাশে মাইকে গান বাজছিল তখন-'ও নদীরে/একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে/ বলো কোথায় তোমার দেশ/তোমার নেইকো চলার শেষ।' রঘুর তাও মনে আছে।

যে ভরাট কণ্ঠের গান সর্বত্র শোনা যায় হেমন্ত। এমন কণ্ঠ কটা আছে?

তখন সন্ধে মিলিয়ে গেছে। শ্রান্ত অবসন্ন, শুকনো খরবাতাসে আরো শুকিয়ে শন হয়ে যাওয়া এক গাড়ি যাত্রীসহ ট্রেন পৌঁছায় শিয়ালদহ। ঐ স্টেশান সংলগ্ন এলাকায় সন্ধের ভীড় ও ব্যস্ততা মানে যে কী! ভাবটা এমন, বিরাট কোন ত্রাস বা আপদ দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই নগরী ছেড়েস্টেশনের দিকে ভাগোরে! মহানগর জুড়েই কি একই ব্যস্ততা!

একটা মরাভিখিরিকে দেখেছিল রঘু। পড়ে আছে। কেউ তোলেনা। সবাই ডিঙিয়ে যায় ভ্রূক্ষেপহীন।

পুলিশ দেখেও তোলে না। এর সৎকার কে করল রঘু আজ জানল না।

মা বলছিলেন,

-কী দেখছিস?কী রে?

-ডেডবডি অব অ্যান ওল্ডম্যান। কেই সরায় না কেন?

বাবা বলছিলেন,

-বেওয়ারিশ।

বালক রঘুর জিজ্ঞাসা,

-হোয়াট ইজ বেওয়ারিশ?

বাবা টাঙ্গা ডেকেছিলেন। জবাব পেলনা রঘু আর। ইচ্ছে করেই টাঙ্গা নেয়া হয়েছিল যাতে অনেক সময় ব্যয় করা সন্ধের ঝলমলে কলকাতা দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। তখন বিভিন্ন দোকান ও নানা জায়গায় সাইন বোর্ডে কলকাতাকে লেখা হত কলিকাতা। যেতে হবে হাওড়া স্টেশন। হ্যারিসন রোড্ ধরে টাঙ্গা ছুটছিল। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানোর একটু আগে বিখ্যাত পোল পেরোয়। হাওড়া ব্রিজ।

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ে রাত সাড়ে ন-টায়। পরদিন ভোরে মুরি জংশনে ব্রডগেজ ট্রেন পাল্টে ন্যারো গেজ।

ছোটোলাইনে আরো তিনঘণ্টায় রাঁচি। রাঁচি পৌঁছতে দুপুর এগোরোটা।

আজকাল দ্রুতগামী হাতিয়া হাওড়া কাকভোরে পৌঁছে যায় রাঁচী জংশন। রাঁচিতে ব্রডগেজ বসেছে ১৯৬০ সালে। রঘুরমনে আছে জগজীবনরাম এসেছিলেন। ওঁকে দেখে রঘু ভাবছিল-আমিও কালো। কিন্তু এ যে আমাকে ছাড়িয়ে গেল। জগজীবন হাসছিলেন। সাদাদাঁত স্পষ্ট, মহাশয়ের গাত্রবর্ণ আরো প্রকট। রঘু নিজের বর্ণমিলিয়ে হেসেছিল।

বিশ্বনাথকে নিয়ে স্নান সারে গঙ্গায়। অনেকেই করছে। স্নান সেরে নদীর চরে হোটেলে খাওয়া। ইলিশমাছের ঝোল আর গরম ভাত। পাতলা মুসুরীর ডাল, মাছভাজা, পুদিনা টমেটোর সালাড। খিদেয় এমন খাদ্য উপাদেয়।

হোটেল বলতে পাতায় ছাওয়া একচালা ঘর। নদীর চরায় কাঠের বেঞ্চ।

স্নানের পর প্রত্যেকের আগুনজ্বালা খিদে পায়। রঘু বিশ্বনাথের তাই।

রঘু লক্ষ করল- সবাই বেঞ্চে বসে এমন খাচ্ছে, যেন জীবিত অবস্থায় এটাই অন্তিম খাওয়া। গপাগপ-সুড়ুৎ-সাড়ুৎ গিলছে রে বাবা। তৈজস বলতে টোকোপাতা। পাতাফাতা খেয়ে ফেলবে নাকি? একজন এতটা ভাত নিয়েছে, উল্টোদিক থেকে ভক্ষণরত ওকে দেখাই যায় না।

রঘু একটু জোরেই হাসল। বিশ্বনাথ বলল,

-হাসছ কেন?

-হাসছি না। ভাবছি।

-কী?

-খাওয়া ছাড়া মুখের আরো তো ব্যবহার আছে।

-কী?

-খেতে দেখলে কি মনে হয় বল তো?

-কী মনে হয়?

-কিছুদিন আগেও হিউম্যান স্পাশিস জন্তু ছিল। সবাই কেমন খাচ্ছে দ্যাখো না।

বিশ্বনাথ খেতে খেতে বলল,

-খাবার তো খাবেই। ফেলে দেবে নাকি?

একটু হেসে নিজেও খেতে শুরু করল রঘু।

বলল,

-রাইট। খাক যার যেমন খুশি। এই বিশ্ব, জব্বর ঝাল দিয়েছে।

-টেস্ট হয়েছে যতোই ঝাল হোক।

-নদীর চরায় সবকিছু জব্বর। চিকেন খাবে?

-না। ইলিশ সব জায়গা জুড়ে বসেছে। তুমি খাও।

-না না। দাঁতে কিচ্‌কিচ্‌ করে। বাতাসে নদীর বালু উড়ছে যে

মাঝগঙ্গায় মালবাহী এক জাহাজের ভোঁ যাত্রীবাহী জাহাজ ওপারে, সুক্রকলিঘাটে। ট্রেন চলে গেছে। পোড়া ইটে আঁকা রেখা দেখা যায় দূরে, নদী পেরিয়ে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

মালগাড়ি দেখলে রঘুর মায়া হয় ছোটোবেলা থেকেই। এ গাড়িতে কেউ থাকেনা কিছু জড়বস্তু ছাড়া। যেন নিঃসঙ্গ কর্তব্যনিষ্ঠ রেল ছুটে যায় দূরান্তে পিঠে মানুষ নেই, মানুষের কলরব নেই। কিন্তু মানুষেরই একান্ত প্রয়োজনীয় সব আছে। এমনকে কার না মায়া হয়? একটু কথা বলার কেউ নেই। ড্রাইভার গার্ড তো আর তেমন কথা বলে না। যাত্রীবিহীন রেলগাড়ি কি মানায়!

বিশ্বনাথ বলল,

-কী ভাবছ? খাও।

-ভাবছি না। দেখছি।

-কী

-গুড্স ট্রেন।

-কোথায়।

- ওই ওপারে।

খাওয়া শেষ। বিশ্বনাথ সিগারেট ধরাবে। গঙ্গার হাওয়ার অশালীন দাপট, দেশলাই নিভে যায় বারবার, বাতাস বুখে দাঁড়াল রঘু। পেছনে উল্টোমুখে বিশ্বনাথ সফল হয়। মুখে অগ্নিদগ্ধ সিগারেট। বলল,

-খাবে?

-নো থ্যাঙ্কস্!

-সরি, তুমি তো এক্সারসাইজ করো। ব্যায়ামের প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল রঘুর।

-কী?

-আমাদের শরীরে নাকি অনেকগুলো মাসলস্?

-হুঁ।

-কতটা?

একটু চিন্তা করে রঘু বলল,

- ছোটোবড়ো মিলিয়ে টোটাল সিক্স্ হান্ড্রেড থার্টিনাইন।

-মাই গড্!

বলেই নিজের চিমসানো পেশি দেখে নেয় বিশ্বনাথ। বলল,

- এতগুলো মাসলস্ আমার? দেখি না কেন?

- বাইরে যত, এর চেয়ে অনেক বেশি শরীরের ভেতরে।

-মানে!

- হার্ট, স্টমাক, ইনটেসটাইন সবখানেই মাস্‌লস্। আর মজা কি জান?

-কী মজা আবার?

- এ স্কোয়ার ইঞ্চ্ মাসল্ ক্যান্ লিফ্ট টুয়েন্টি সিকস কেজি টু সিক্সটিফাইভ কেজি ওয়েট্যাজ।

বিশ্বনাথ বলল,

-ডাক্তারবাবু ইলিশ হজম হোক আগে। তারপর আপনার মাস্‌ল্‌স্।

চারদিকে তাকাতে তাকাতে রঘু বলল,

-তোমার মাসল্‌সের এই এনার্জি নেই।

-কেন?

-তুমি সিগারেট খাও। সিগারেটের টার নিকোটিন থাকে। দুটোই বিষ। তুমি তাই খাচ্ছ।

-সবাই খাচ্ছে তো।

-দ্যাট্স্ ইট্। সবাই বিষ খাচ্ছে।

বিশ্বনাথ আরো জোরে সিগারেটে টান দিয়ে বলল,

-কিছু একটা না হলে চলে না। কী খাব?

হেসে রঘু বলল,

-হাওয়া খাও।

এখানে অনেকগুলো পানদোকান। সব দোকানে বড়ো সাউন্ডবক্স সহ রেডিয়ো। রেডিয়ো পাটনা। পাটনায় গান -'গাতা রহে মেরা দিল/তুহি মেরি মঞ্জিল

বাকি লাইন পূর্ণ করে ইলিশ খাওয়া বিশ্বনাথ উপাধ্যায় -কঁহি বিতে না ইয়ে রাতেঁ/ কাঁহি বিতে না যে দিন।'

সিগারেট ফেলে না। বারো পয়সার বস্তু তাও আবার ফিল্টার টিপ্ড্।

রঘু এখন জলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বনাথ ডাকে,

-রঘু!

- রঘু শোনেনা। বিশ্বনাথ অবাক। কোথায় হারিয়ে যায় মাঝেমাঝে ছেলেটা। এখন যেমন। পাশে এল, কাঁধে হাত রেখে ডাকল,

রঘু।

একটু থমকে রঘু ঘুরে তাকাল। বলল,

-বল।

-কী ভাবছ?

-ভাবছিনা। দেখছি।

-কী?

-জল।

-জল!

-হুঁ।

-কী জল?

-নদীর ।

-নদীর!

-হুঁ।

-কী আছে জলে? জল তো জলই।

রঘু বলে,

-সব জল, জল না রে বিশ্বনাথ।

-মানে?

রঘু স্তরীভূত, পাললিক আবেগে বলল,

- যে জলে প্রিয়জনের অবশেষ মিলিয়ে যায়, একে জল বলে না।

রঘুর উচ্চারিত সকল শব্দ বিশ্বনাথকে ছুঁতে পারে না। বিশ্বনাথ বলল,

-প্রিয়জন, জল! কী বলছ রঘু!

নদীর পার বরাবার হাঁটতে হাঁটতে উনিশ কুড়ির রঘু উচ্চারণ করে অতিশয় ভার শব্দমালা। বলল ভাসা ভাসা স্বরে, কিম্বা অন্যের স্বরে,

-মা-সহ এই গঙ্গা পেরিয়েছিলাম অনেক আগে। আবার একদিন একই গঙ্গায় জলে ভাসিয়েছিলাম মার অস্থি। দুই গঙ্গায় কত প্রভেদ! কত আপনজনের অস্থি আছে এই জলে! তাই না?

শন্ শন্ হাওয়া বয় রঘুর কণ্ঠের সমান্তরাল। সব ধ্বনি স্পষ্ট শোনে না বিশ্বনাথ।

গঙ্গার হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া স্বরে রঘু বলে নিজের মনে, এবারো ভিন্নার্থ,

- যে জলে প্রিয়জন লীন, একে জল বলে না কেউ। আমি তো না।

বস্তুত, বিশ্বনাথ বোঝে না কিছুই। হয়তো রঘুও না। নিজেরই উচ্চারিত ধ্বনির মর্মমূল সবসময় নিজে কি বোঝা যায়?

আসলে প্রতিবারই অস্পষ্ট অন্যজন বলে দেয় পার্থিব জিহবা ঠোঁঠ ও কণ্ঠকে। স্বরের ধ্বনি নিমিত্তমাত্র।

বিশ্বনাথ বলল,

-বুঝিয়ে বলো নারে ভাই।

রঘু ওপারের দিকে পলকহীন। বলল,

-কখনও প্রিয়জন হারিয়েছ?

-না, কেন?

-কখনো অতিপ্রিয় কারো দেহের শেষচিহ্ন জলে বিসর্জন দিয়েছ?

-না তো!

-হারিয়ো না। দিয়ো না। যদি তেমন হয় কোনোদিন, সেদিনই বুঝবে সব জল, জল নয়।

এখন উচ্চারণ রঘুর অভ্যন্তরের জমাট অন্য রঘুর। সেই প্রকট হল রক্তমাংসের রঘুর কণ্ঠে, বলল মন্দ্রিত গমগম স্বরে,

-মায়ের শরীরে নদীর শরীরে কোনো ভেদ নেই। সব নদীকে আমার মা মনে হয়। কিম্বা সব মাকে একেকজন বহমান নদী।

বিমূর্ত রঘুর সাথে কারো কোন পরিচয় নেই। বিশ্বনাথেরও নেই। সুতরাং একেবারেই

বুঝল না রঘুর ভিতরে নিরালা রঘুর ব্যবহৃত অন্তর্ভেদী শব্দাবলি।

অন্য রঘু আবার নিশ্চুপ হয়ে গেল। কথা বলল মণিহারীঘাটে বেড়াতে আসা-ডিপ নেভি ব্লু স্কিনটাইট্ পেন্ট ও শাদা টিশার্ট পরিহিত পায়ে কোলহাপুরি চপ্পলধারী পরিচিত মূর্ত রঘু,

-চল বে ইয়ার, অভ্ ঘরকো লোট্ চলে।

বিশ্বনাথ বলল

-তুম বোলে থে, শাম কো লৌটোগেঁ:

- ও দেখো, শাম হোনে কো হ্যায়। সুরজ ঝুঁক গয়া, ধূপহাল্কা হো রহা হ্যায়। অপনে অপনে সায়া (ছায়া) লম্বা হো রহেঁ হ্যায়। চল।

স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে দুজন। বেশ ভিড়। কী এক তিথি পড়েছে আজ। গঙ্গায় স্নানার্থী এসেছে অনেক। স্টেশন বাসস্ট্যান্ডে এরই রেশ। কোলাহল।

হাঁটতে হাঁটতে রঘু বলল,

-এই ঘাটের আশপাশ কোথাও নদীতে একটা সিনেমার শুটিং হয়েছিল অনেক আগে।

-কবে?

-ঠিক জানিনা। সিক্সটি, সিক্সটি ওয়ানে হবে।

-কোন সিনেমা?

রঘু বলল,

-বিমলরায়ের বন্দিনী।

-তুমি দেখেছ?

-হ্যাঁ।

-কোথায়?

-পুনায়।

বিশ্বনাথ বলল,

-আমি দেখিনি। কেমন পিকচার?

রঘু বলল,

-তখন এত বুঝিনি। কিছুদিন আগে আবার শো দিয়েছিল হরদয়াল টকিজে। দেখেছি। কী মনে হয়েছে জান?

-কী?

-অ্যাক্ট্রেস নুতন ওঁর জীবনের সেরা অভিনয় করেছেন। অশোককুমারও। ইনফ্যাক্ট, এ ওয়েল ডিরেক্টেড্ ম্যুভি অব ইন্ডিয়ান কমার্শিয়াল ফিল্ম। আর শচীন দেববর্মনের তো জবাব নেই। প্লেব্যাক করেছেন শচীন দেববর্মন নিজে। বিখ্যাত সেই-গান 'তু বন্দিনী পিয়া কি'... লং-শটে,দূর গঙ্গার বুকে জাহাজ। জাহাজের চিমনির মাথায় ধোঁয়া। সূর্য ডুবছে।

ইন্টারন্যাশন্যাল স্টান্ডার্ডের যে-কোনো কম্পোজিশন। দুর্দান্ত। বিমল রায় ইজ গ্রেট ডিরেক্টার। মাস্টারলি ডিরেকশন।

একটু সময় নিয়ে রঘু বলল,

-বিশ্ব।

-বলো।

-বড়ো ইচ্ছেরে ভাই। ঠিক ইচ্ছে নয়। জুনুন মতলব অবসেশন কহ্ সকতে হো।

-কিস্ চিজ কা?

- একটা ফিল্ম্ বানাই।

-ফিল্ম?

-হুঁ। ছোটোবেলা থেকেই এই ঘোর। ফিল্ম। মনেরমতো একটা ফিল্ম।

- তোমার ফিল্ম কেউ দেখবে না। দেখলেও বুঝবে না। থিয়েটারের সব সোফা-চেয়ার ভাঙবে, পর্দা ছিড়ে দেবে দর্শক। বুঝবে না তো দেখবে কি পয়সা খরচা করে? তারপর তোমার শির ফাটাবে ডিরেক্টার সাহেব।

রঘু হেসে বলল,

-বুঝবে না কেন?

-কেন বুঝবে? ঐ যে জলের পাশে দাঁড়িয়ে উটপটাং কী বলছিলেন তখন? নদী, মা, প্রিয়জন! সরফিরা আছ তুমি। তুমি বানাবে ফিল্ম? সুপার ফ্লপ!

আরো জোরে হাসে রঘু। বলল,

-ওয়েল সেইড! ওয়েল সেইড মেরে ভাই। ফ্লপ্। মাই এভ্‌রিথিং ইজ সুপার ফ্লপ। বাট আয়াম ডেজায়ারাস। উমিদ্। উমিদ্ কে সাহারে জিন্দা হ্যায় হমসব। প্রত্যাশা প্রত্যাশায় ভরপুর ছবি বানাব একদিন।

-টাকা?

-হিয়ার লাইজ্ দ্য প্রবলেম। টাকা তো নেই। কমসে কম বারা-চৌদা লাখ। কাঁহা মিলেগা ইতনা পৈসা?

বিশ্বনাথ বলল,

-ইসিলিয়ে বোলা, ফিল্ম ছোড়ো। গানা গাও। বহুৎ বড়িয়া গলা হ্যায় তুমহরা, সচ্ মানো।

ক্যান্টিন থেকে ক্লাসে ফিরে যাচ্ছে রঘু। এখন সব ক্লাস সায়েন্স ব্লকে। পাশেই ল্যাব। হলের মতো প্রায় বর্গাকার শ্রেণিকক্ষের এককোণে কাঁচের বিরাট আলমিরা। ওতে ক্ল্যাম্প করে ঝোলানো ছফুটের হিউম্যান স্কেলিটন।

রঘু প্রায়ই লক্ষ করে স্কেলিটনের রং আস্তে আস্তে, দিনে দিনে পাল্টে যাচ্ছে। আগে অফ হোয়াইট ছিল। এখন ডিপ ক্রিম দেখায়। পেলভিক বৌন, বাঁ পায়ের টিবিয়া ফিবুলা দুটো হাড় দুহাতের রেডিয়ো অ্যাল্না হাড় রং বদলাচ্ছে। রঘু ভাবল,স্যারকে বলতে হবে। কয়েকদিন আগে ডেমোনেস্ট্রেটরকে বলেছিল। বোম্বের কোম্পানিকে নাকি জানানো হয়েছে। ওরা জানিয়েছে- কেমিক্যাল পাঠানো হচ্ছে। ইমালশন মাখিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে আর ডিসকালার হবেনা।

আসলে জীবন্ত সবকিছুর মতো, মৃতেরও রেস্টোরেশন প্রয়োজন। বরঞ্চ মৃত যে, তার আরও বেশি। এ কথা রঘুকে ভাবায় খুব। কঙ্কালে রোদ পড়ে বিকেলে। পাশেই জানালা। রং পাল্টাবার এটাও একটা কারণ হতে পারে। স্যারকে বলতে হবে,

-স্যার, কয়েকবছর পর জুনিয়রা যখন দেখবে, ওরা ধরে নেবে হিউম্যান বৌন ফেডেড ইয়েলো। ভুল কনসেপ্ট হয়ে যাবে স্যার।

জবাবে ঝা-স্যার কী বলবেন, তাও জানে রঘু। হয়তো বলবেন,

-তুই বলছিস হলুদ? মানুষের জীবনে কত যন্ত্রণা! হলুদ কি, হাড় কালা হয়ে যায় কোনও কোনো সময়। আরো বড়ো হ বুঝবি। হিমানিজীর সাথে দেখা হয়েছে এর মধ্যে?

কঙ্কালের সামনে দাঁড়াল রঘু। করোটি দেখলে মনে হয়-ফাজিলের মতো দাঁত বের করে হাসছে। আসলে, মাংসহীন হিউম্যান হেডের ফ্রন্টাল প্রোজেকশন্ এমনই , মনে হয়, প্রয়োজনের চেয়ে মুখ বেশী প্রসারিত করে হাসছে আর বলছে,

-কী রে, তোরা এখনো বেঁচে আছিস কীভাবে? আমার ক্যাটাগরিতে চলে আয়। দ্যাখ তোরা, এই হচ্ছে আমার তোমার সবার ভিতরের প্রকৃত রূপ। সব ফাঁকা আর শূন্যতা ভরাট করে রেখেছিল মূল মাংসের কুশন। আসলে আমরা কেউ কিচ্ছু না। আমাদের ইচ্ছা, কামনা বাসনা ক্রোধ, ঘৃণা সবই মাংসভিত্তিক। দ্যাখো তোমরা, আমি এখন মুক্ত। কোন আড়ম্বর নেই আমার। হাড়েরা নিশ্চুপ। এদের কোন প্রত্যাশা নেই, ইচ্ছা নেই, স্বপ্ন নেই। হাড় তো হাড়। অন্য নাম অস্থি। খটখটে, শুকিয়ে যাওয়া অতি জটিল কাঠিন্য।

একমনে দেখছে রঘু। একে পাওয়া গেল কোথায়? কেউ কি ছিলনা এর? সেই কবে বাবা বলেছিলেন শিয়ালদা স্টেশনের এক ভিখিরির মৃতদেহ দেখে বেওয়ারিশ। বেওয়ারিশরাই কি একদিন ঝুলন্ত কংকাল হয়ে যায়?

ও কি ছিল? হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান, পার্সি? নাকি কিচ্ছু না? কে জানে। আপাতত এটাই জানা, ও আমাদের টিচিং এইড্। মানুষের কংকালের বাস্তব প্রদীপন।

কাঁধে হাত রাখে কেউ। ঘুরে তাকায় রঘু। সুস্মিতা। ভীষণ ব্রিলিয়ান্ট। গম্ভীর সুশ্রী,

স্বল্পবাক। সুস্মিতার পেছনে রিয়া, লক্ষণ, সুরজকান্ত।

কাঁধে হাত রেখেই সুস্মিতা বলল,

-সরি, টু ডিসটার্ব, ইউ!

- নো, নো। নট অ্যাট অল্।

-কি দেখছ রঘু?

-না এমনি।

- প্রায়ই লক্ষ করি, একমনে কংকাল দেখছ?

-এমনি দেখি আর কী

সুস্মিতা বসেছে এবার রঘুর পাশে। বলল,

-কোথায় কোন বৌন, লেংথ কত, ওয়েট কত, স্ট্রাকচার কম্পোজিশন সব তোমার জানা। তবু এত কী দ্যাখো বলো না? আমার তো অনেকসময় কনফিউশন হয়। ভের্টাব্রা ডিস্কগুলো ক্যাচ্ করতে পারিনা। একটু বলে দেবে?

রঘু বিপন্ন। বলল,

-আমি? তোমাকে?

-হ্যাঁ, কেন?

রঘু একইস্বরে বলল,

-সুস্মিতা প্রসাদকে বোঝাব আমি?

সুস্মিতা বলল,

-বাঃ রে! কেন নয়? অ্যানাটমি ফিজিওলজি দুটোই এমন বলছিলে সেদিন স্যারকে। আমি ভাবছিলাম, রঘু ওসব কি নিজেই বানিয়েছে। মনে নেই তোমার, সেদিন বৌন মেরো পড়াচ্ছিলেন স্যার?

একটু থেমে সুস্মিতা আবার বলল,

-আচ্ছা রঘু, একটা ব্যাপার বোঝাও তো।

-কী ব্যাপার?

- ক্লাসে নোট নিতে দেখি না। তবু সব বলে দাও কী করে?

রঘু বলল হাল্কা গলায়,

- স্যার কী পড়াচ্ছেন, তলিয়ে শুনলেই সব ম্যানেজ হয়ে যায়।

-কই তা তো শোনো না তুমি রঘু।

- শুনি তো।

- কই শোনো। যখনই দেখি, জানালার বাইরে তাকিয়ে আছো। অথচ সব টেস্টে হাইয়েস্ট পাচ্ছ বারবার।

রঘুর আবার নির্লিপ্ত জবাব;

-কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। কেমিস্ট্রিতে তোমার মার্ক কেউ ছুঁতে পারে না।

সুস্মিতা বলল,

-তুমি ছোঁও না কেন? ইচ্ছে করলেই তুমি আমার ছুঁতে পার।

-কী?

-ইয়েস, আই মিন ইট।

স্যার এখনো আসেননি। মিনিট পাঁচেক বাকি। সবাই বসেছে যে যার মতো।

সুস্মিতা বলল,

-রঘু।

-ইয়েস?

-উড্ ইউ অ্যাপ্লাই ফর আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ?

শার্টের স্লিভ গোটাতে গোটাতে রঘু বলল,

-আই ডোন্ট নো।

- হোয়াট ডু ইউ মিন্! তো এই সাবজেক্ট পড়ছ কেন?

- এমনি। বাবা বললেন, তাই।

সুস্মিতা বলল,

- এসব নিয়ে তোমার কোনো টেনশন নেই, তাই না!

- এগজ্যাক্টলি্।

- কেন নেই?

- এগজাম ইজ এগজাম। পাশ হলেও সমস্যা নেই। ফেল হলেও কেউ শুট্ করবে না।

-পরীক্ষা দাও কেন ?

- দিই আর কী? হাইয়েস্ট যে পাওয়া তেমন কিছুই না এটা বুঝতে।

সুস্মিতা হেসে বলল,

-ইউ প্রাউডি বয়! আই লাইক ইট। রিয়েলি, আই লাইক ইট!

কথা আর এগোয়না। স্যার ঢুকলেন ক্লাসে। সবাই উঠে দাঁড়াল। নিজের সীটে ফিসফস স্বরে, সুস্মিতা আবার বলল,

-সব সাবজেক্ট তোমার পেট্-ডগ। এন্ড ইভেন মাই কেমিস্ট্রি। প্লিজ গো অন। সামনে তোমার বিরাট ফিউচার। প্লিজ অ্যাকোম্পানি মি। এন্ড বী অ্যাটেমনটিভ, মোর।

একটু পরেই রঘু স্থান পাল্টায়। শুধু এই ক্লাসের সিট না। অন্য স্থানও। আর মনে মনে বিস্ময়-

-এই গর্জিয়ান কোত্থেকে, কবে টপকাল রে বাপ-!

লক্ষ্মণের পাশে বসল রঘু। বলল,

-ওটার দিকে কেন তাকাই জানিস এত বেশি?

লক্ষ্মণ বুঝতে পারেনি। বলল,

-কোনটার দিকে?

কংকালটা চোখের ইশারায় দেখাল রঘু। বলল,

- ওই, ঝোলানো। দেখছিস না?

-কেন তাকাস এত?

- বলব?

- ইয়াহ্।

- বলি?

- বল।

- তোকে দেখি।

- আমাকে?

পকেট থেকে চ্যুইংগাম বের করে মুখে দিল রঘু। এখন বাইরে দেখছে। উল্টো ব্লকের বারান্দায় হেঁটে যায় ঝিলিক। রঘু ভাবে, এসময় কোথায় যায়? একটাও ক্লাস রীতিমতো করে না মেয়েটা।

ঝিলিক এদিকেই দেখছে। দুজনে চোখাচোখি হলো। ঝিলিক হেসে হাত নাড়ল কী যেন বোঝাতে চাইল। দেখে মনে হলো ক্লাস বাদ দিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছে দারার বড়ো বা ছোটোবোন।

রঘু দৃষ্টি ফেরায়, যাক যেখানে খুশি ওর। প্রোজেক্টরে স্লাইড বসাচ্ছেন স্যার। একবার তাকালেন সবার দিকে। বললেন,

-জাস্ট আ মিনিট বয়েজ অ্যান্ড গর্লস্।

কয়েকজন বলল,

-ইয়েস স্যার।

প্রোজেক্টার ঝামেলা করছে। স্লাইডভরা রিভলভিং ডিস্ক্ ঘোরে না। স্যার এ নিয়ে ব্যস্ত বিরক্ত।

লক্ষ্মণ বলল,

-কংকালে আমাকে মানে?

রঘু বলল,

- মানে সিম্পল।

-কি।

- ওটা তুই।

লক্ষ্মণ চটছে। বলল,

-আমি স্কেলিটন?

রঘু আশ্বস্ত করল,

-আরে না না। তুমি ওয়ানটন।

লালচে গাবলু বাবলু লক্ষণ দুহাতে চর্বিবহুল মাংস পেশি দেখিয়ে বলল,

-আমি ওয়ানটন্?

রঘুর আফসোস,

-ওঃ নো। আয়াম রং। ইউ আর টন্‌টন্ ইনডিড্।

সবাই জানে লক্ষণদের ডায়েরি ফার্ম আছে ডানকুনিতে। অনেক মহিষ ওখানে। সুতরাং সবাই ধরে নিয়েছে,লক্ষণ কেবল ভৈঁসা দুধ খায়, আর পাম্প বালিশের মতো ফুলে ফুলে ওঠে। শরীরে দুধ দুধ গন্ধ পায় রঘু। প্রায়ই বলে,

- এ লছমন।

- কী?

- ভৈসার বাঁটের তলায় বসে গোসল করিস নাকি রে?

- কী?

- গন্ধ। বাসি দুধের। গায়ে পারফিউম দিস।

লক্ষণ আরো চটে তখন। বলে,

-মারুঙ্গা এক ঘুষা।

রঘু শান্ত করে,

- মারিস। আগে দুধের গন্ধ দূর কর।

প্রজেক্টার বোধহয় চালু হবেনা। দপ্তরী খুটখাট করছে। স্যার ড্রয়িং দেখছেন।

দুধের চোটে ফুলে ওঠা লক্ষণকে আরো একটু ফোলায় রঘু। ডাকে,

-লছমনুয়া রে।

- কী?

- তোহর ইত্‌না ফাস্‌কিলাস নসিব্ হরে।

-কিয়া মতলব্?

রঘু পাম্প দেয় জোরে। বলল,

-সুস্মিতা তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।

ফুলানো লক্ষণ সম্পূর্ণ ঘুরে যায় রঘুর দিকে। বলল,

-আমার কথা? কী কথা? কী বলল সুছ্‌মিতা? (লক্ষণের উচ্চারণ)

রঘু তাতায় ফোলায়। সব করে। বলল,

- তোকে ভালো লাগে ওর। এই তো একটু আগে বলেছে।

গাবলু লক্ষণ চট করে বিশ্বাস করেনা। বলল, ঝুট!

-তুই জিজ্ঞেস করিস ওকে। আমি থাকবে তোর সাথে।

-আচ্ছা বলতো ঠিক-ঠিক কী বলেছে?

রঘু বলল,

- বলেছে, তোর সামনে বিরাট ফিউচার।

-কী ফিউচার?

- জানি না। ও বলল, তাই বললাম।

- আর কী বলল?

- আর কী বলবে? তোর ওর এতে দুধ খাওয়া পছন্দ নয় এইসব।

লক্ষণ জেরা করে,

- আমাকে স্ট্রেট বলে না কেন?

রঘু বোঝায়,

- মেয়ে তো। সোজাসুজি কীভোবে বলবে। লজ্জা পায় আর কী!

এবার পুরোপুরি ফুলানো লক্ষণ বলল,

-সারাজীবন তোর কাছে ঋণী থাকবে।

- কেন?

- বা! যদি সব ফিট করে দিস।

রঘু মনেমনে বলল, আমি ঋণী থাকব বেটা ওইে নয়া অভিভাবকের পল্লু থেকে যদি তুই আমাকে মুক্ত করে দিস।

মুখে বলল,

- সব ফিট আছে। তুই চালিয়ে যা। দুধ এতে খাবি না, কসরৎ কর। মেয়েরা পাতলা পুতলা লাইক করে। তেল মেখে রোদে ঘুরবি। গায়ের রং একটু তামাটে হোক ব্যস্, হয়ে গেলো। তু ডটে রহনা বেটা।

রঘু জানে— সুস্মিতার জন্যে ডেয়ারিফর্মের অপার টান। কতভাবে যে ওর দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। রোজ পোশাক পাল্টায়। স্কুটার পাল্টায়। চুলে নানান ডিজাইন ধরায়। কিন্তু লক্ষণের তরী গঙ্গায় পেরোয় না। জলেই ভাসে না, তো আর পেরুবে কি? সুস্মিতা অন্য ধাতু। মাথায় একই চিন্তা—পড়া। লক্ষ্য একটাই, ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার। কিন্তু গার্জিয়ানি কেন? আমি কি পড়ব না পড়বে। জেব্ খাটেবে, না ওয়াগন ব্রেকার হব—সেটা আমি জানি। তুই কেরে লৌন্ডি? লক্ষণকে দ্যাখ। বেচারা দিওয়ানা তোর জন্যে।

এসব ভাবছ রঘু—সুস্মিতার ফিউচার টিউচার বলার পর থেকে।

রঘুর প্রত্যয়—একা আছি, বেশ আছি। কেন সবাই জড়াও আমাকে? আমি কেউ নই। কারো নই। আবার বলছি তো, লক্ষণকে আরো লেলিয়ে দেব। আমি আর্মড্ ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে পড়ব না থানাবিহপুরিয়ায় সুরাই বেচব— আমার ব্যাপার। তোকে

অ্যাকোম্পানি করব আবার কীরে? যাকে ঠিক ঠিক সঙ্গ দিতে চাই যার সান্নিধ্য মনেপ্রাণে চাই—সে কতদূর জানিস? অনেকদূর কোথায় আছে, কেমন আছে, কী ভাবে আছে, আমায় কি ভুলে গেছে—তাও জানিনা। এতোটাই জানি, ওকে ভুলিনি। ওর বারণ আজো মেনে চলি। কোনোদিন আইসক্রিম স্পর্শ করিনি আর। সেই' ৬৩ সাল থেকে।

নেহার চেটোর মতো আর কারো তেমন চেটো নেই—যে চেটোর আইসক্রিম আমি চাখব আবার। এসব কাউকে বোঝানো যায় না। বলা যায় না। সুস্মিতা তোমাকে না, দিয়াকে না। ঐ বিশৃঙ্খল ঝিলিককেও না। দ্যাখো সুস্মিতা, কেউ কারোকে সঙ্গ দিতে পারে না। নিজেই নিজেকে সঙ্গ দিতে হয়। স্মৃতির চেয়ে বড়ো সঙ্গী আর কেউ নয়। আমার আছে, বিপুল অসংখ্য খণ্ড-খণ্ড স্মৃতি। কতো দেশ, কত পথঘাট, কত পথ, কত নদী, কতো বৃষ্টি, কত মেঘ, কত পাহাড়, কত জোনাকি—আর জোনাকির নিভন্ত-জ্বলন্ত আলোর মানবিক ওম। কত মানুষের কত কথা। 'হাজার মায়ের মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে নিতে হয়রে রঘু'—সেই কবে বলেছিলেন চাড্ডা আন্টি। আন্টির তপ্ত বুক, গভীর স্তব্ধতা, বাৎসল্য, এমন কে দিতে পারে, আর নিপাট নিজের জন্মদায়িনীর অন্তিম আগুনের তপ্ত শিখার দহন যার বুকে। গুজ-গুজ করে অ-ফোটা জ্বরের মতো—তার কোনও সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। সে কাউকে সঙ্গ দেয় না। আয়াম সরি সুস্মিতা, আই ক্যাননট অ্যাকোম্পানি ইউ অর এনিবডি।

প্রোজেকশন স্ক্রীনে বৌন-মেরোর কম্পোজিশন। মজ্জা রক্ত, অস্থি—একাকার পর্দায়। চটাক্ শব্দে স্লাইড পাল্টালেন স্যার। পর্দায় আর বি সি—লাল রক্তকণা। স্যার ডাকছেন,

—রঘু, ইউ রঘু? হোয়াট হ্যাপেন্ড?

রঘু ফিরে আসে ক্লাসরুমে আবার, বেশ কিছু সময়ের মনোভ্রমণের দূরত্ব অতিক্রান্ত করে। খেয়াল হয়। তাই উঠে দাঁড়ায়। স্যার রঘুকে জানেন। বলেন,

—এত অমনোযোগী তুই ইডিয়ট! ডিসপ্লে ঠিক হচ্ছে নো পর্দায়। দ্যাখ তো কী হল। হ্যাজি প্রোজেকশন হচ্ছে। এখন বিমনা রঘু বলল,

—লেন্স্ বোধহয় অ্যাড্জাস্ট হয়নি স্যার। লতিফকে ডাকি?

—না। তুই আয়।

রঘু লেন্সহোল্ড নাড়াচাড়া করে। আলো জ্বালাতেই পর্দায় স্পষ্ট ছবি—প্ল্যাজমা, রক্তের অনু। এবার ছবি স্পষ্ট।

স্যার বোঝাচ্ছেন পাঠ। কিন্তু অন্য পাঠ নেয় সুস্মিতার মতো মনোযোগী তুখোড় ছাত্রী। সুস্মিতা প্রোজেকশান স্ক্রীনে কেবলই দেখে রঘুর মুখ, শ্রান্ত চোখ।

সুস্মিতা তাকায় রঘুর দিকে। রঘু সুস্মিতাকে। রঘু স্পষ্ট দেখে—সুস্মিতার ঠোঁট নিঃশব্দে কথা বলে। প্রতিধ্বনি হয়—আমায় সঙ্গ দাও, সঙ্গ দাও, সঙ্গ দাও। দুচোখ দিয়ে

রঘুর চোখকে আরো বিপুল কথা বলে দেয় সুস্মিতা—রঘু, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই।

সুস্মিতা এখনো তাকায় রঘুর দিকে। পঠিতব্য পাঠে দুজনেই অমনোযোগী।

রঘু ওর চোখ, ওষ্ঠ, আর জিহ্বায় শব্দহীন বলে দেয় স্পষ্ট,

—নেহার সমান্তরাল তোমরা কেউ নও, কেউ নও, কেউ নও। যার গভীরে সেই বালিকার চেটো সম্বলিত শীতল আইসক্রিমের নিবিড় উষ্ণতা, যার একমাত্র দোসর একই বালিকার স্মৃতি—সে আর কারো নয়। না সুস্মিতার, না দিয়ার, না ঝিলিকের।

স্যার বললেন,

কী— গো ব্যাক টু ইওর সিটে। কি হয়েছে তোর! বলছি স্লাইড ঘোরা, তবু বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছিস। শরীর ঠিক আছে তোর?

সিটে ফিরে যায় রঘু। সুস্মিতার দৃষ্টি ক্যামেরার লেন্সের মতো অনুসরণ করে ওকে।

সিটে বসলো ঠিকই, মন আরো উন্মনা। ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় দুই কিশোর-কিশোরী। কিশোরী যখন দৌড়োয়, কাঁধ অবধি মেপে কাটা রেশমি কালোচুল আন্দোলিত হয়। ফর্সা মিষ্টিমুখে-শিশিরের মতো হাল্কা ঘাম। বাঁহাতে রিস্টওয়াচ। ঐ হাতেই ছোট্ট শাদা রুমালে মুছে নেয় আলতো, ঘাম। একটু দূর থেকে, হরিণীর মতো ধীর ছুটন্ত সুবর্ণা কিশোরী ডাকে,

—র-ঘু-উ-উ। কাম্! কুইক! ইট ইজ মেল্টিং সুন।

কিশোরী ডানহাত তুলে দেখায়। হাতে শুভ্র তুষারখণ্ড।

সেই কিশোরীও কি আজ, ঠিক এইসময় নিজের শ্রেণিকক্ষে বসে বুঝে নিচ্ছে রক্ত, ধমনী, মজ্জার পাঠ?

সেই কিশোরী, যে আজো এই যুবকের রক্তমজ্জা শ্বাস প্রশ্বাসে অদৃশ্যে প্রতীয়মান—একথা কাকে কী ভাবে বোঝাবে রঘু, ভেবে পায় না। বোঝানো যাবে না, বলাও যাবে না। সব উপ খ্যান যত্রতত্র বলতে নেই। আখ্যানের মাহাত্ম্য বিঘ্নিত হয়।

নেহার কথা কাউকে বলবে না কোনোদিন। নেহা তুমি কোথায়? আজ এই মুহূর্তে তোমার মনে পড়ছে কিছু—সেই ইউক্যালিপটাসের তলা, যেখানে তোমার দেয়া আইসক্রিমের উষ্ণতা। তোমাদের সেই হলঘর—যেখানে একদিন নূপুর পরিয়ে দিয়েছিল এক কিশোর?

তোমার মনে পড়ে নেহা—সেই মুলোভেলা নদীর পারের পাওয়ার হাউসের চত্বরে দুজনে বসে আছে। ওরা তখন তেমন কথা বলতেও শেখেনি তবু কিশোরী বলত,

—রঘু; কাল ছুটির পর কোথায় ছিলে? স্কুলবাসে সবাই উঠল। তুমি নেই। কি করো তুমি? একা-একা এতটা পথ কেন হাঁট?

কিশোর বলত,

—হাঁটতে ভালো লাগে। কী হবে বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি? কেউ নেই ওখানে। বাবা

ট্যুরে। মা নেই প্রায় আটমাস। একা লাগে নেহা!

কিশোরী পিঠে হাত রাখতো কিশোরের।

বলত ধীরস্বরে,

—তুমি একা নও। আমি আছি। ঠিক, আমি আছি।

এর বেশি কিছুই বলতে পারত না ওরা। কারণ, তেমন সাজানো গোছানো বলার তখন কথাও নয়। তবু দুজনের বুক গুম্‌গুম্‌ করত ভেতরে ভেতরে সাজানো গোছানো অসংখ্য কথায়। ভেতরের কথা ফোটাতে হলে কিছুটা সময় পেরোতে হয়—সে বোধ তাদের তখন ছিল না।

তবু, তুমি একা নও। আমি আছি। ঠিক, আমি আছি—এমন নিবিড় বাক্যই আজ গোপন ও স্থাবর ঐশ্বর্য আমার, নেহা। তোমার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে বলেই সুস্মিতা, দিয়া, ঝিলিকের আগমন আর বেশি দূরে সরিয়ে, ঐ ইউক্যালিপটাস বৃক্ষের তলায় নিয়ে যায়।

কেমন আছো তুমি নেহা? যেখানেই থাক, ভালো থেকো।

লম্বা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় রঘু। বলল,

—স্যার, ক্যান আই গো আউটসাইড?

স্যার পূর্ণদৃষ্টিতে দেখলেন ওকে। বললেন, —ইয়েস, ইউ ক্যান্।

— লম্বা করিডোরে হাঁটছে রঘু। মস্তিষ্ক পুরোপুরি মেঘলা হয়ে গেছে। কোন আকাশের তলায় ছুটে গেলে এই মেঘ কাটবে ভেবে পায় না। এভাবে তাড়া করে প্রায়ই ওকে। তারপর ছুটে যাওয়া আর দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া। দিক না জেনে আবার ছুটে যাওয়া। কার কাছে, কোথায়—জানা নেই।

ক্লাসে পড়ে রইল বইপত্র। রঘু করিডোর অতিক্রম করে এখন পেছনের গেট পেরিয়ে সোজা আমবাগান, চামারবস্তি, তাড়িমুহল্লায়।

মাথায় ও বুকে টনটন ব্যথার মতো একই রোখ্ যে রোখ্ অনেক পুরাতন—সেই পুনা রেলস্টেশনে উৎপন্ন বিষাদে দোসর হারিয়ে বারবার খুঁজে বেড়ানোর মতিচ্ছন্ন রোখ্—এটাওয়া ঠিক কোনদিকে? মা-সহ নেহা কি আজওে ওখানে আছে? নেহার থুত্‌নির ছোট্ট তিল কি এখনো একই রকম আছে? নেহার ভেজা-ভেজা দীর্ঘ চোখের পাতায় কি আজো ছায়া-ছায়া দীঘির নিরিবিলি আছে? নেহা কি আজো হাঁচি এলে তিন আঙুলে কপাল টিপে ধরে? যে নূপুর ওকে একদিন পরিয়েদিয়েছিলাম—ওটা কি এখনো সযত্নে আছে? না ছিন্নদিনগুলোর মতো সব ঘুঙুর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে? সালোয়ার কুর্তা পরা কোমরে ওড়না বাঁধা-ছিপছিপে নেহা আজওে কি ভারতনাট্যমের মহড়া দেয়?

কিম্বা, ওর নিখোঁজ বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আজ কি চোখের জল ফেলে? কেঁদো না নেহা। তুমি কষ্ট পেলে আমি এতোদূর থেকে, এতদিন পরে-ও ঠিক টের পাই।

দুহাতে মাটির ভাণ্ড তুলে ঢকঢক, গলায় তাড়ি ঢালে রঘু।

পেছন থেকে প্রায় জোরেই বলে ঝিলিক,

—আর খেয়ো না প্লিজ! এই রঘুদা।

পেছন পেছন কখন ঝিলিকও এখানে এলো, খেয়াল করেনি রঘু। খাওয়া বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। বিরক্তি ও বিভ্রান্তিতে তীব্রস্বরে ধমকাল,

—গো অ্যাওয়ে, ইউ ন্যাষ্টি গর্ল। গো অ্যাওয়ে।

ঝিলিক ক্ষীণ কণ্ঠে বলল,

—ফিরে চলো লক্ষীটি।

তাড়ির ছোটো ঘড়া দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুঙ্কার দিল প্রায় জান্তব রঘু,

—গেট লস্ট।

—শোনো না।

—আই সেইড, গেট লস্ট এণ্ড লিভ গি অ্যালোন। গো। কিছুটা ঘাবড়ে যায় ঝিলিক। তবু বলল প্রকৃত অনুনয়ে,

—বিকেল হচ্ছে। খালিপেটে ওগুলো খেতে নেই। ক্ষতি হবে।

—ভাগ এখান থেকে। শালি!

সুরতিয়া এসে দাঁড়িয়েছে দাওয়ায় রঘুর চিৎকারে। ভেতরে ছিল এত সময়? ঝিলিককে বলল,

—আপ যাইয়ে বিটিয়ারানি। উসকো মৈঁ সাম্ভালুঙ্গি।

কয়েক ফোঁটা জল এলো ঝিলিকের চোখে। মুছলে না। বলল বসে যাওয়া গলায়,

—এতো বক কেন রঘুদা? আমি কী এমন করি?

ঝিলিক চলে গেছে। সময় গড়ায়। পশ্চিম আকাশ ফাঁকা। একটু আগে ওখানে ডুবন্ত সূর্যছিল। এখন অর্থহীন খণ্ড-বিখণ্ড মেঘ, এমনি ওড়ে। গাছ গাছালির মুখেবুকে সর্বত্র ঘুসঘুসে অন্ধকার। নির্দিষ্ট নিবাস আছে নিশ্চিতই, তাই পাখিরা উড়ে যায় নিজ-নিজ নীড়ে। দারা কুয়োতলায় অলস শুয়ে আছে। ভাণ্ডু এখনো ফেরেনি। কোন সকালে বেরিয়েছিল—বারসই গেছে।

সুরতিয়া মগে চা দিল। সঙ্গে দেশী বিস্কুট। বলল,

—চায় পিলে বেটা।

দাওয়ায় খোঁটায় ঠেস দিয়ে বসেছে রঘু এতোক্ষণ। তেমনি বসেই তাকাল উত্তর কোণে, দূরে। ওদিকে ছুটে যায় যোগবানি-কাটিহার প্যাসেঞ্জার। ট্রেন মিলিয়ে যায় আরো দূর। আকাশে পথের চিহ্ন ধরে কালো ধোঁয়া, ইঞ্জিনের। সেদিকে তাকিয়ে রঘু বলল,

—খাচ্ছি। তুমি খাও।

—তুলে পহলে। সুবহ কিয়া খায়া থা বেটা?

একটু হাসে রঘু। হায়রে মায়ের জাত! যাকে স্নেহ করো তোমরা—সে কখন কী খেল, কখন কোথায় গেলে, কখন কোথায় শুল—একই চিন্তা।

রঘু বলল,

—তু সোচ মত্ মাঈ। সকালে রাক্ষসের মতো খেয়েছি।

সুরতিয়া একটু হাসে। বলল,

—একটা কথা বলি রে বাবা? খারাপ পাবি না তো?

—খারাপ পাব কেন তোমার কথায়? তুমি বলো?

একটু থেমে সুরতিয়া বলল,

—মেয়েটাকে এমন দূর-দূর করিস কেন? ও তোর মঙ্গল চায়।

সন্ধ্যা হচ্ছে। অদূরে শঙ্খের ধ্বনি। মন্দিরে মঙ্গালারতি শুরু হবে একটু পরই। কুয়োতলায় পুরোহিতজির অবগাহন শেষ। শঙ্খে ফুঁ দিয়েছে অন্য সেবাইত।

এদিকে পাখিরাও নিজেদের মতো সন্ধ্যারতির তোড়জোড় ব্যস্ত। গাছে-গাছে কুজন তোলে শুধু।

রঘু সুরতিয়ার কথায় জবাব দেয়না। সুরতিয়া উঠে যায়। বলে,

—তু বৈঠ বেটা। আলো জ্বেলে দিই। শিবজিকে একটু ধূপ দেখাই।

সুরতিয়া ভেতরে যায়। ফিরে আসে আবার। সস্তা ধূপ জ্বেলে দেয়। মিহিন নীল ধোঁয়া ওড়ে।

সব সারা হয়ে গেলে সুরতিয়া বসে আবার রঘুর পাশে। বলল,

—ওকে আজ বড়ো দুখ্ দিয়েছিস বেটা।

ফেলে রঘু বলল,

—জানি। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু কী করব। কাকে বোঝাব?

—কী বোঝাবি বেটা?

—কতকিছু।

—কী কতকিছু?

—তুমি শুনে কী করবে?

এবার সুরতিয়ার পরিসীমা থেকে সুরতিয়া বেরিয়ে আসে। সেই একই ও শাশ্বত জননী যেন বলেন, তেমনি বলল,

—আমাকে মা বলিস তো। তোর যাতনার কথা আমায় বল বেটা। এতে কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।

তবু কিছুই বলে না রঘু। চুপচাপ বসে থাকে। বলার ইচ্ছে হলেও বলা যায় না। কারণ, সব বলা গোছানো যায়না, বলা তো দূর। শুধু বলল,

—আমার চা জুড়িয়ে গেছে। একটু গরম করে দাও।

সুরতিয়া আবার চা এনে দিল। চা খায় রঘু। হঠাৎ খেয়াল হয়—বইপত্র সব রয়েগেছে ক্লাসে। স্যারের ধমক খেতে হবে। দপ্তরী অবশ্য তুলে রাখবে বইখাতা-কলম।

সুরতিয়া বলল একসময়,

—ও বড়ো ভালো রঘুবেটা।

—কে?

—ডাক্তারসাহেবের মেয়েটা। একটু পাগলি আছে আর কিচ্ছু না। কিন্তু ঝিলিকরানি সত্যিই ভালো।

এবার রঘু বলল কঠিন প্রত্যয়ে কিম্বা অসহায় বিষণ্ণতায়,

—সবাই ভালো আমি জানি। কিন্তু সব ভালোকে আমার ভালো লাগতে হবে এমন কোনও কথা নেই।

একথার জবাব সুরতিয়া দিতে পারল না স্বভাবতই। শব্দগুলো এই রঘুর নয়, যাকে সুরতিয়া চেনে ও প্রায় রোজ দেখে।

এ বাক্য যে বলল একটু আগে, তাকে খুঁজে পেতে হলে, যেতে হবে সেই মহানগরীর বিরাট স্কুল ক্যাম্পাসের ইউক্যালিপ্টাসের ছায়ায়। এ বাক্যধারীকে চিনে নিতে হলে যেতে হবে মুলাভেলা নদীর তটে শ্মশানের উত্তপ্ত চিতার পাশে, যে চিতা ওর গর্ভধারিণীর।

এই শব্দধারীকে দেখে নিতে হলে ওকে খুঁজতে হবে চাড্ডা আন্টির কবোষ্ণ মধ্যবুকে?

যে বুক ভিজিয়েছে ঐ বিষাদবালক তপ্ত চোখের জলে কতো বিনিদ্র রাতে। এতসব মাঠঘাট কে আর খুঁজে যেতে পারে, বা যায়? সুরতিয়া কেন, কারও যাওয়া হয় না। সুতরাং, জানা হয় না, দেখা হয় না, অনুভূত হয়না, বর্ণ বোঝা যায় না— কে বলে এমন সংলাপ রক্ত মাংসের রঘুর দেহে বিলীন দ্বিতীয় কেউ—যে কারো নয়।

আজ ঝা স্যার রতনকে বের করে দিলেন ক্লাস থেকে। পড়ানো হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম। ক্লাসে তেরোজন ছেলে আর আটজন মেয়ে আজ। স্যার পড়াচ্ছেন সৃষ্টিরহস্য জটিলতা, প্রক্রিয়া ও নির্দিষ্ট সময়ের ভূমিকা। প্রজনন প্রক্রিয়ায় দেহের ম্যাকানিকাল মেটাবোলিক স্থিতি।

রওন, হঠাৎ ফিক্ করে হেসেই আবার চুপ। স্যারের দৃষ্টি ছিলো চার্টের ডায়াগ্রামে। ঘুরে তাকালেন বললেন,

—কে হেসেছে?

বলতেই রতন আর হাসল। স্যার বললেন অত্যন্ত শীতল স্বরে,

—হোয়াট মেক্স্ ইউ লাফ?

রওন কথা বলেনা। দাঁড়ায়ও না। বাকি কুড়িজন ছাত্রছাত্রী নোট নিচ্ছিল। ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে বিরাট চার্টে রিপ্রোডাকটিভ অর্গ্যানের ছবি। ডানদিকে সাদা চৌকো পর্দায় স্লাইড ডিসপ্লে।

ক্লাশ চলছিল গভীর মনোযোগে। এমন সময় হোঁচট রওনের ফাজিল হাসি সবাই জানে—ঝা-স্যার মানে সবসময় শীতল বাতাস। মেজাজ বিগড়ালে টিসকোর ব্লাস্ট ফোর্নেস।

স্যার এগোলেন রওনের কাছে বললেন,

—স্ট্যান্ড্ আপ অ্যান্ড লিভ ইওর সিট।

মারকুটে রওন কিচ্ছু বলে না। এরপর মুঠোয় ধরলেন ওর শখের চুল। খুরপির অভাবে

যেমন ঘাস তুলতে মালি ধরে ঘাসের ঝোপ, ঠিক তেমন টানলেন রওনের কেশ-বিন্যাস। একই ভাবে টেনে আনলেন ক্লাসের বাইরে। এক ধাক্কায় ঠেলে দিলেন বারান্দায়। ঠান্ডাস্বরে বললেন,

—একবিন্দু বিষ পুরো তালাও নষ্ট করে দেয়। আর কোনোদিন আমার ক্লাসে যদি তোমাকে দেখি; এই ক্লাস কেন, এই শহরে তোকে আর দেখা যাবে না। ডু ইউ আন্ডারেস্ট্যান্ড?

এই রওনের সাথে কিছুদিন আগে লফ্ড়া হয়েছিল রঘুর। ঘটনাটা এরকম—

পেছনের গেট পেরিয়ে টিফিনে আওয়ার্সে বাইরে যাচ্ছে রঘু। নিম্বুয়া গাছের তলায় দাঁড়ানো রত্তন ডাকল,

—এ রঘু সুন।

ওর কাছে আসতেই রত্তন আবার বলল,

—মিরচাইবাড়িকা দাদা হ্যায় রে তু?

রঘুর মগজে আগুনের ঘোড়া ছোটে খটাখট। তবু সামলে ধরে রাশ। বলল,

—কিউঁ, কিয়া হয়া?

—মেরা এক কাম করে গা রে তু?

রঘু বলল,

—কিয়া কাম?

রওনের স্পষ্ট জবাব,

—ঝিলিক কো উঠানা হ্যায়? মদত্ চাহিয়ে তেরা। আধা-আধা বাট লেঙ্গে দোনো মিলকর।

রঘুর অগ্নি-অশ্ব রণক্ষেত্র দাপায়। সলতেয় আগুন পড়েছে। গোটা শরীর তখন মলোটভ-ককটেল।

রঘু ওর বিখ্যাত গমগমে স্বরে বলল বাক্য কেটে কেটে,

—তুনে কভি এক্স্‌রে মেশিন দেখা হ্যায়?

রত্তন বলল,

—কিয়া মতলব?

—মতলব অভ দেখেকা।

বলেই, ঝটপট অ্যাকশনে প্রবলবিশ্বাসী পঁচিশ-পঁচিশ পাউন্ডেরে প্রেস্-নেয়া রঘুর কালো বলিষ্ঠ হাত বা হাতুড়ির পাঞ্চ স্প্রিঙের মতো আছড়ে পড়ে রওনের ডান চোয়ালে। ছিটকে যায় রত্তন দূরে। উল্টে পেড়ে মাটিতে। চোখের সামনে বেশ কয়েকজন রঘুকে দেখে। ঠোঁট লাল তরল রক্তে। থুতনি ফুলে যায় মুহূর্তে।

দূর থেকে দেখতে পেয়ে লাঠি হাতে ছুটে আসে রঘুর প্রিয়তম দোসর—ভাঙ্গাড্ডু। বলল,

—টেটুয়া দাবা দিই ক্যা ভোঁস্ড়ীওয়ালেকা?

রঘু বলল,

—ছোড় দে।

—তুম বোলো, শির ফাড়কে কুইয়া (কূয়ো) মে ফেঁক দেই।

রঘু নিজে টেনে দাঁড় করায় রওনকে।

বলল,

—সুন্ রওন, থুবড়া কা এক্স্-রে করওয়ালেনা সরকারি হাসপাতাল মে। ইয়ে থা কোয়ার্টার পাঞ্চ। পুরা মারুঙ্গা তো খুদকো পেহচান নেহি পায়েগা। বাকি রহা ঝিলিক কি বাত। উসকি তরফ ফির দেখেগা ভি তো, এ.টি.মেল কি নিচে সুলা দেঙ্গে তুঝে।

রত্তন গর্জায়,

—ছোরা ভখুঙ্গা পেট মে।

রঘু শান্ত স্বরে বলে,

—সার্জারি শিখলে পহেলে।

তড়পায় পায় তবু। বলল,

—মরেগা তু রঘু।

রঘুর সলতেয় তখনো আগুন। বলল,

—মরনা মৈঁ ভি চাহতা হুঁ। জিনা কৌন চাহতা হ্যায়, ঔর সুন, জ্যাদা বোলেগা না, ইয়ে ভাঙ্গাড্ডু তেরে কো কাটকর কোশীমে ফেক দেগা। অভ ঘর যা। তেরা সুরেন সুনীত কুছ নহি কর পায়েগা।

আসলে ক্লাস আর করবে না স্থির করে রঘু যাচ্ছিল ওয়েস্ট কলোনির পেছনে পরিত্যক্ত গোডাউনের ভাঙা চত্বরে। বুলন প্রসাদ, চেতন, ইনারদেউ, টাক্লামুনির সবাই আসবে রঘুও যাবে। বুলন প্রসাদ তমঞ্চা (পিস্তল) দেখাবে জার্মান-মেড। বেগর লাইসেন্স কা হাতিয়ার। রঘুর খুব শখ পিস্তল হাতে নেয়। নাড়াচাড়া করে। বলেটলে যদি বুলন প্রসাদ মানে, তবে আজ এক রাউন্ড চালাবার খুব ইচ্ছে। দিতে পারে চালাতে।

এই বুলন প্রসাদ—অনেক কিছু অপারেট করে। ওয়াগন ব্রেকিং, কন্ট্রাব্যান্ডপেড্লিং

আর কতও। চলন্ত ট্রেনের দুকামরার ফাঁকে বেশকিছুদিন ওদের উল্টো দলের একজনকে ফেলে দিয়েছিল। কেটে টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। উপায় ছিল না। না হলে বুলনকে মরতে হত। প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করেছিল ঐ লোক। গুলি ফসকায়। দুবারা মারার আগেই বুলন লাথি মেরে ঠেলে দিয়েছিল ছুটন্ত দুটো বগির ঠিক মাঝখানে। বুলনের-ও উপরতলা আছে। ওদের দেখেনি রঘু কখনও।

আরও ভিড়তে চায় ওদের দলে। বুলনপ্রসাদ বাধা দেয়। বলে,

—ভাগ। তেরা দিমাক কাঁহা রে? এত তেজ মগজ তোর। ফিরভি।

রঘু বলে,

—কিয়া ফিরভি?

—লিখাই-পড়াই কুছ নেহি, মন লাগাকে পড়। কাহেকা কাম ইস জগহ্ তেরা?

রঘুর একটু বিস্ময়,অন্ধকার দুনিয়ার অন্যতম চালিকাশক্তি ওকে বলছে —'মন দিয়ে পড়াশোনা কর। এত মেধাবী তুই।

রঘু ভাবে—মেধা কী, আর ওর তা আছে, এসব বোঝে কিকরে বুলনপ্রসাদ।

রঘু হয়তো আব্দার করে,

—এ বুলন ভাইয়া, আমাকেও নাও না তোমাদের দলে।

—কিয়া বাত করতা হ্যায় রে তু?

—কিঁউ?

—মরনা হ্যায় তেরে কো?

পরিণামজ্ঞানহীন মানসিকতার রঘুর স্পষ্ট জবাব,

—মরনা হ্যায় তো মরুঙ্গা জিনা মে কিয়া রখ্খা হ্যায়।

বুলন স্থির দৃষ্টিতে জরিপ করে রঘুকে বলে,

—কিয়া চাহিয়ে তুমে রঘু? রুপল্লি?

—নেহি।

—ফির?

—থ্রিল।

—উ ক্যা, হ্যায় রে!

রঘু বলে অকপট,

—মজা। বুলন প্রসাদ অবাক ও বিরক্ত। বলল,

—জান জোখিম মে ডালকর মজা? তেরা মাথা ঘুম গয়া হ্যায় রে বুড়বক। কোশী কা পানিমে ডুবকি লাগা সৌ বার।

—কিঁউ। মজা করনে মে কিয়া হরজা হ্যায়।

রঘুর কাঁধে হাত রেখে বুলন প্রসাদ বলল,

—বহুৎ সরফিরা হ্যায় তু। হোস্টেল কো লৌট যা। নেহিতো খায়েগা ঝাপড়।

আর এই ভাবেই, সুতো দিয়ে বুলন ও রঘু বুনন করে এমন এক রেশমি বস্ত্রখণ্ড মানবিক,— যে খণ্ড ধীরে ধীরে আরো ব্যাপ্ত বিস্তৃত হয়ে দৈর্ঘ্যে পড়ে। যে বস্ত্রখণ্ডের বর্ণ সফেদ, আঁধার ও আলোর কোনো পরিসীমা নেই এতে।

তাই, একদিন বুলনপ্রসাদকে বলল রঘু,

—বুলন ভাইসাব, সুনো তো।

—বোল্ ছোটকাভাইয়া?

রঘু বলল,

—ফিল্ম বনানা হ্যায়।

—কিয়া?

—ফিল্ম।

—সিনেমা রে?

—হুঁ।

—কাহে?

—তুমলোগ যো-যো করতে হো উসব লেকর ফিল্ম।

বুলনপ্রসাদ হাল্কা থাপ্পড় মারে রঘুর গালে। বলল,

—বহুৎ লু চল রহা হ্যায় তেরা মাথা মে। কভি কহতা হ্যায় চোর-বাজার করেগা, কভি কহতা হ্যায় ফিল্ম বনায়েগা। আসল মে করেগা কিয়া তু? পড়াই কভ্ করেগা রে উল্লু?

রঘুর একই জবাব;

—পহ্‌লে ফিল্ম। বাদমে সব।

বুলন বলল,

—পহলে ফিল্ম, বহুৎ আচ্ছা।

রঘুর উৎসাহ প্রবল। বলল,

—অভ সমঝগয়ে তুম?

বুলনপ্রসাদ ধমকায়,

—খাক্ সমঝা হুঁ মৈঁ। সবকো মারেগা তু। নিজেও মরবি। প্রাণের জন্যে কোনও ভয়-ডর নেই তোর?

রঘু, জোর ধমকায়,

—এতো ডরাও যদি, এ লাইনে কেন তুমি? সরহদ মে ফৌজ লড়তা হ্যায় ডরকর কিয়া? আমি ফিল্ম দিয়ে লড়বো এসবের। আই ওয়ান্ট টু ফাইট।

রঘুর কথার সব মর্ম বর্ণে-বর্ণে বুঝল বুলন। রঘুর আক্রোশজনিত চিৎকারে

আশ্চর্যজনকভাবে স্থিমিত হয়ে যায় এ এলাকার অন্ধেরা দুনিয়ার ত্রাস। বলল মায়া-মায়া স্বরে,

—বহুৎ লাচার হ্যায় রে হেমসব। এ রঘুভাইয়া, কিস্-কিস্ সে লড়েগা তু? তোকে মেরে ফেলবে রৌশন আলি আর ললিত নারায়ণ?

রঘুর কৌতুহল বাড়ে। বলল,

—ইয়ে কৌন হ্যায় দোনো?

বুলন বলল,

—সবকা আকা। অস্‌লি নাম ঔর কুছ হ্যায় দোনো কা। জানবর সে ভি বত্তর হ্যায়। বহুৎ পৈসা। পাটনা ঔর দিল্লিমে বহুৎ দবদবা দোনো কা। এম.এল.এ -মন্ত্রী সব কাঠ-পুতলি। বম্বই, দিল্লি, মাদ্রাজ, কাঠমান্ডু, আসাম, পাকিস্তান সব জগহ পে উনকা আদমি, জাল। লাচার হ্যায় হম।

রঘু সমাধান সহ উপায় দিল। বলল,

—এক কাম কর সকতে হো ভাইসাব তুমসব মিলকর।

—কিয়া?

—তুম সব মিলকর দোনো কো বরাবর কর দো।

—মতলব?

রঘু বাঁহাতের তর্জনী দিয়ে নিজের গলা চিরে দেখায়। পলকহীন চেয়ে থাকে বুলন ওরদিকে। বলল,

—বহুৎ সাহসী তুই আমি জানি। কিন্তু এসব সোজা নয়। এলাইনে আমরা মিলেমিশে থাকি না। সবসময় সন্দেহ ও চাপা বিবাদ। এতে ঐ দুজনের লাভ। ওরা আমাদের কলহ জিইয়ে রাখে।

অর্থহীন কিম্বা অর্থপূর্ণ অন্য তাৎপর্যে কিছুটা সময় আরো কাটে। চত্বরে এখনো রঘু ও বুলন প্রসাদ। আর কেউ নেই। থাকলে এতো কথা বলত না দুজনে। এসবের প্রকাশ্যে আলাপচারিতা–চলে না।

বিকেলের রোদ পড়ে দুজনের ছায়া এত দীর্ঘ হয়েছে— ঐ দূরের নাম না জানা বৃক্ষের কাণ্ডকে ছুঁয়েছে।

লম্বা গুড্‌সট্রেন পেরিয়ে গেলো দীর্ঘ রেল ইয়ার্ড। ট্রেনের সব বগি টেনে নিয়ে যায় ডিজেল লোকোমোটিভ। এমন ট্রেন দেখলে রঘুর অনুভূতি হয় না। যা হয় কয়লার ইঞ্জিনে টানা রাতের দীর্ঘ ট্রেন দেখলে। এখন হল না।

বলল, উদ্দেশ্যহীন,

—কোথায় যায় ওটা বড়কা ভাইয়া?

—কী জানি।

একটু থেমে রঘু বলল,

—আমার ফিল্মে রেলগাড়ি, নদী, মাঠ, বন, পোল, ভূমি, মানুষ ও মানুষের স্বপ্নের বিশেষ ভূমিকা থাকবে।

সেসবে না গিয়ে বুলন বলল,

—ফিল্মে টাকা কত লাগে রে?

একটু ভেবে রঘু বলল,

—আমার তো এতো আইডিয়া নেই। তবু ধরো, দশ বারো লাখ।

রঘু এমনভাবে বলল, এ অঙ্ক তেমন কিছু নয়। বুলন ফিসফিস করে বলল,

—হায় রাম! ইতনা পৈসা!

রঘু ভীষণ বুঝদার এখন। বোঝাল,

—আরে ভাইয়া, নামকরা হিরো-হিরোইন সব পয়সা খামচে নেয়। খচ্চর সব। এরপর আরো কতো খরচ। নামীদামি হিরোহিরোইন না নিলে ফিল্ম কেউ দেখবে না।

বুলনপ্রসাদ নিরুৎসাহ করে রঘুকে বলল,

—কোন নামীদামি হিরোহিরোইন তোর ফিল্মে কাজ করবে না।

—কেন?

—কেন করবে? সবাইকে বানাবি স্মাগলার, চোর-উচাক্কা। কে করবে উসব কিরদারি?

রঘু আনমনা আবার। মনে মনে বলে,

—শুধু কি এইসব ধুরো! কত মানুষের কত রোল আছে, কাউকে তো বলিনি আজো। চাড্ডা আন্টির রোল যে কেউ করবে। প্রীতমজি, চুন্নি, হিমানী, সুরতিয়া, ভাঙ্গাড়ু, ঝা-স্যার, যোশী ম্যাডাম, কৃষ্ণা ম্যাডাম, দিয়া, সুস্মিতা, ঝিলিক-এরা কি রোল নয়, তুমি নিজে বুলন ভাইয়া? আর তোমার, কি বলব ওকে? ভাবিজি বলা যায়? রেড্‌লাইট এরিয়ায় এখনো কেন ফেলে রেখেছ তুলসীকে? তোমাদের দুজনের অস্পষ্ট অসহায়ত্ব কি আমার ফিল্মের উপজীব্য নয়? সবশেষে, ঐ দূর এটাওয়াবাসিনী নেহা। ও-তো এখন উনিশ-কুড়ি। ওর রোলে অভিনয় করতে যে-কোনো অভিনেত্রী উদগ্রীব হবে, আমি জানি। কিন্তু কথা হচ্ছে, সবাইকে এক সুতোয় সাজাব কী করে? সাজাতে হলে চাই জববর স্ক্রিনপ্লে। কিন্তু ওটা লিখবে কে? আমি? ভালো করে দু-ছত্র চিঠি লিখতে পারিনা গুছিয়ে। তবু, বানাতে হবে বড়কাভাইয়া। বানাব ফিল্ম।

বুলন প্রসাদ বলল,

—ক্যা রে, কা সোচ্‌তয়ে? নিদ আইলে হ ক্যা?

হোস্টেলকো যা।

রঘু বলল অন্যকথা,

—জান ভাইসাব?

—কী?

—আমার ফিল্মে সব আনকোরা নয়া মুখ নেব। আমি-ও নতুন, এরাও নতুন।

আরো সময় যায়। সন্ধে উতরে গেছে। বুলনপ্রসাদ সিগারেট ধরায়। রঘু মুম্‌ফালি চিবোয়।

আকাশে জোনাকির মতো নিভে-নিভে জ্বলে দূরান্তের নক্ষত্র। পূব থেকে পশ্চিমে ছুটে যাওয়া আকাশ গঙ্গায় ঝাপসা সব তারার দল ধোঁয়ধোঁয়া ভীষণ অস্পষ্ট। সেদিকে তাকিয়ে সবার মতে সরফিরা রঘু ডাকে,

—এ ভাইসাব।

—কী?

—একটা কথা প্রায়ই মনে হয়। জিজ্ঞেস করছি এখন। স্পষ্ট জবাব দিয়ো।

বোল্ না রে ছোটকাভাইয়া।

রঘু তাকায় বুলনপ্রসাদের দিকে। বলল,

—তুলসী তোমার কে হয়?

বুলনপ্রসাদ আকাশ দেখে। সিগারেট দু-আঙুলে জ্বলতে থাকে। খায় না। বলল,

—আগে একটা কথা বল।

—কী?

—ঝিলিক তোর কে হয়?

—কী?

সুন্ ছোটকা, মুঝে সব মালুম।

কিন্তু ও আমার কেউ নয়।

বুলন প্রসাদ বলল ভাসাভাসা স্বরে,

—তবে তুলসীও বোধহয় আমার কেউ নয়।

—ও কেন বলে এত তোমার কথা? ওকে জানো, ঐ এলাকার ডার্টি উওম্যান মনে হয় না।

—কিয়া মতলব?

—মতলব গন্দি ঔরত। ও কেন ওখানে বড়কা ভাইয়া?

ওকে তেমন মনে হয় নাতো।

আকাশের নক্ষত্রের মালা কোনো আলো দেখায় না। এমনি তাৎপর্যহীন দহনে নিঃশেষ হয় সব। আলোহীন অন্ধকারে শূন্য পূর্ণতার দিকে তাকিয়ে বুলন প্রসাদ বলল,

—সব লাচারি। হম সব লাচার হ্যাঁয় রে রঘু

লাচার শব্দ উচ্চারিত হতেই রঘু মনে মনে তৈরি করে নেয় ওর কাঙ্ক্ষিত ফিল্মের কল্পিত কিছু ফুটেজ্।

'হম সব লাচার হ্যাঁয়'—চারটি শব্দ গমগম করে রঘুর নির্মিত সাউন্ড ট্র্যাকের মাল্টি চ্যানেল স্টিরিও-য় ও রঘুর কল্পনার থিয়েটারে বিশাল স্ক্রিন জুড়ে আরো কল্পিত, কৃষ্ণবর্ণ তুলসীর মুখ। ম্রিয়মান নক্ষত্রের আলোয় দীপ্যমান হয়। রঘু, বুলনপ্রসাদ ও তুলসীর সান্নিধ্যের অসহায়ত্বকে আরো অনেক বেশি দীর্ঘ করে।

সহসা, চলচ্চিত্র নির্মাণকারীর বুকে কন-কন কষ্ট হয়। বলে অস্পষ্টে,

—তুলসীদিদি বহুৎ প্যারা হ্যাঁয়। উসদিন বহুত ডাটে থে মুঝকো। বলেছে, আর যেন কোনোদিন ভুলক্রমেও ঐ মুহল্লায় না যাই। গেলে আমার ঠ্যাং ভেঙে দেবে।

বুলন বলল,

—ঠিকই বলেছে তুলসী। কী যে তুই! কেন যাস যেখানে সেখানে? আর গেলে আমিও ঠ্যাং ভাঙবো তোর।

রঘু বলল,

—ধুর। কেউ বোঝে না। আমার মানুষ চাই, স্রেফ মানুষ। তোমরা দুজনে ঠ্যাং ভেঙে দিলে যাই কী করে মানুষের কাছে! বুরবক সবাই!

রঘু চটে গেছে। আসলে যা বোঝাতে পারেনি তা হল—তুলসী যেদিন ওকে বলেছিল 'ঠ্যাং ভাঙবো তোমার আর এখানে এলে'—এই নিবিড় বাক্যের ধ্বনিতে জমাট বাঁধা ছিল কৃষ্ণবর্ণা ঐ নগর-নারীর সফেদ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত অন্তরের প্রকৃতরূপ--যা ঐ পরিবেশে প্রায় বিরল।

তখনই, হড়-হড় করে ফিল্মে ফুটেজ বাড়ায় রঘু তুলসীকে নিয়ে। বাড়ায়, আরও বাড়ায়, বাড়াতেই থাকে। যেদিন জুকাম লাগা রঘুকে আদা ছেঁচে গরম চা খেতে দেয় তুলসী আর নাক ও কপালে লেপে দেয় মাথা ব্যথার মলম, —সেদিন সঙ্গত কারণেই ওর সাধের চলচ্চিত্রে আরো ফুটেজ দিতে বাধ্য হয়। একসময় খেয়াল হয়—এহেঃ! ছবি অনেক লম্বা হয়ে যাবে রে বাবা! কিন্তু কমানোর কোনও উপায় নেই। কাউকে বা কোনও ঘটনা ও আপাত তুচ্ছ সংলাপকে কেটেছেঁটে বাদ দেয়া যাবে না। কী আর করা? এই ফিল্ম অবশ্য তিনঘণ্টা সময়ের পরিসরে দেখে শেষ করতে পারবেনা কেউ।

অনেকদিন ধরে, অনেক সময় ব্যয় করে বারবার উন্মনা হয়ে, কখনও হেসে, কখনও একটু একটু বুক উথলে এই দীর্ঘ ছবি দেখে যেতে হবে। কেউ কি দেখবে—কে জানে।

এতো মাপজোখ করে কি সব ছবি তৈরি হয়? তবে বানাবই—এ প্রত্যয়ে আরো দৃঢ় হয় রঘু।

সেদিন শুধু বলেছিল রঘু ওকে,

—আমি এখানে গন্দা কাম করতে আসিনা তুলসীদিদি। তোমাদের দেখতে আসি। ব্যস।

তুলসীর স্তিমিত উচ্চারণ ছিল,

—জানতি হুঁ। ফিরভি মত আনা ইধর।

তুলসীর রোল কাকে দিয়ে করাবে রঘু ভেবে পায়না। গায়ের রং শ্যামলা হলেও নাকমুখ-চোখ-চিবুকে আকর্ষণ আছে তুলসীর। দীর্ঘাঙ্গী। লতার মতো দেহসৌষ্ঠব। চুলের ঢল কোমরের নিচ অবধি। নাকে বিন্দুর মতো সাদাফুল—নাকছাবি।

তুলসীকে যতদিন দেখেছে রঘু—লিপস্টিক রঞ্জিত ঠোঁট দেখেনি। চোখে কাজল নেই। বড়ো-বড়ো চোখে স্নিগ্ধতা—এমন চোখের আলাদা পরিচর্যার কী প্রয়োজন? খুবই আস্তে কথা বলে। সাধারণ কাপড়-চোপড়ে থাকে। কোন চটুল বেশে কোনোদিন দেখেনি রঘু। হাল্কা ছাপার শাড়ি, কিম্বা, ভব্য সালোয়ার কামিজ। একে কারো সাথে মেলাতে পারে না রঘু। ফিল্ম বানালে নতুন অভিনেত্রী খুঁজে নিতে হবে।

তবু ধন্দ রঘুর—এখানে কেন তুলসীর মতো মায়া-মায়া স্ত্রীলোক?

তুলসীর সাথে পরিচয়টা একটু মজার। কি-সব অষুধপত্র কিনে বেরোচ্ছে দোকান থেকে। রঘু জোরে সাইকেল বা মোটর বাইক চালায় সব সময়।

বাঁদিকে ঘুরে যেই-না মোড় নিয়েছে মঙ্গলবাজারের দিকে, সাইকেল সামলে নিলেও দে-ধাক্কা তুলসীর বাঁদিকে। তুলসী পড়ে যায়নি, তবে ছিটকে যায় ফুটপাতের ওপর। হাত থেকে পড়ে অষুধের শিশি চুরমার। রঘু ভ্যাবাচ্যাকা।

তেমন চোট পায়নি তুলসী কনুই আর কাঁধে আঁচড়-ছাড়া।

রঘুর মুখে একই কথা বারবার,

—মাফ কিজিয়ে, মাফ কিজিয়ে মুঝে। গলতি হো গয়া!

পিন আটকানো রেকর্ডের একই কথা শুনে রাগ বা বিরক্তির পরিবর্তে একটু হাসল তুলসী। কনুইয়ের আঁচড়ে আঙ্গুল বোলালো। একবার দেখল রঘুকে।

বলল শান্ত ধীর গলায়,

—মাফি বাদমে হোগি। পহলে মদত তো করো মেরি।

রঘু বলল,

—জি হাঁ, জি হাঁ।

রঘু তুলে দিল অষুধের প্যাকেট। কিন্তু শিশি! ওটা তো কিছু করা যাবে না। ছিতরানো অষুধের গন্ধে বুঝলো কোনো এক্সপেক্টোর‍্যান্ট।

বলল অপরাধী-অপরাধী গলায়,

—শিশিটা ভেভে গেছে। আমি কিনে দিচ্ছি আরেকটা, তুলসী বলল,

—লাগবে না। আমি কিনে নেব।

রঘু আবার বলল,

—মুঝে মাফ কিজিয়ে। জ্যাদা চোট তো নেহি লগা আপকো?

হাসে তুলসী চাপা। কনুইয়ের আচড় দেখতে-দেখতে বলল,

—আমার কথা ছাড়ো। এতো স্পিডে সাইকেল চালাও কেন? তোমারও কিছু হতে পারতো।

—জি?

—জি কিয়া। সাইকেল ধীমা চালায়া করো, সমঝে?

—জি।

সাইকেল-সহ রঘু এলো তুলসীর আরো আছে? আরো একটা শিশি কেনা হল না। রিকশার খুঁজে রঘু ডাকে,

—এ, ইধর আ। উন্‌হে পৌঁছা দে।

রিকশায় বসে তুলসী বলল চালককে,

—থোড়া রোকো।

তারপর রঘুকে বলল,

—তুমারা নাম কিয়া হ্যায়?

—আমি রঘু।

তুলসী অবাক। হাসি থেমে যায়। বলল,

—কৌন রঘু?

—কোন রঘু মানে? আমি তো রঘু!

তুলসীর একই স্বরে বলল,

—তাজ্জব কি বাত!

—জি?

—কাঁহা রহতে হো তুম? মিরচাইবাড়ি হোস্টেল মে?

রঘুর আরো অবাক। বলল,

—আপকো কৈসে মালুম?

তুলসীর মুখে কোনো হাসি নেই। বরঞ্চ গম্ভীর ও বিস্ময়। বলল,

—ইওেফাক। কাকতালীয়। এমন হবে ভাবতে পারিনি।

—কী এমন হবে!

—আমি তোমাকে জানি রঘু।

—জানেন?

—হ্যাঁ, তোমার ও নাম অনেকবার শুনেছি।

—কোথায়? কার কাছে?

—আছে একজন। তোমার কথা গল্প করেছে।

রঘু বলল,

—আমার গল্প করেছে? কে সে?

এবার একটু হাসল তুলসী। বলল,

—তোমার বড়কাভাইয়া।

—কৌন? বুলন প্রসাদ?

—হুঁ।

—কী গল্প করেছে?

—তুমি কে, কোথায় থাকো, কী পড়, কী কী করো, প্রায় সব।

রঘু বলল,

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি কে?

—আমি তুলসী।

—কোথায় বাড়ি আপনার?

এবার তুলসী চালককে স্তিমিত স্বরে বলল,

—চলো। তেজ চালাও। দের হ গয়া।

রঘু আবার বলল জোরে,

—কাঁহা রহতে হ্যাঁয় আপ তুলসীজি?

কথার কোন জবাব না দিয়ে, যেন ভীষণ তাড়া আছে, তেমনি বলল তুলসী,

—এ, জলদি চালাও।

রঘুর অবাক হওয়া আরো বাড়ে। এমন করে চলে যায় কেন মহিলা?

রঘুর স্বভাবসিদ্ধ রোখ ওঠে। আর কোনও কিছু জিজ্ঞেস না করে একটু তফাতে অনুসরণ করে তুলসীর রিকশা।

প্রায় কুড়িমিনিট পর নানান পথ ও গলি পেরিয়ে যে গলিতে রিকশা ঢুকল—গলিটাকে রঘু চেনে, জানে, বোঝে। ভাবে —এই স্ত্রীলোক এখানে কেন? ভুল করে চলে গেল কি ঐ গলির ভিতর পিছু ডাকব? ডাকেনা। কিন্তু, কেন গেল ওখানে? রঘু দাঁড়িয়ে থাকে নানান ভাবনার ভার মাথায় নিয়ে।

এই হল প্রথম পরিচয়।

রঘুর মাথায় কোন কিছু ভর করলেই হয়ে গেল। শেষ না দেখে শান্তি নেই।

সুতরাং পরদিন বিকেলের একটু আগে এই অবুঝ রোখ্ রঘুকে নিয়ে গেল এক দালানের তিনতলায় তুলসীর ঘরে।

তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে। দরজা খুলেই তুলসী যেন ভূত দেখছে। প্রায় চেঁচাল চাপাস্বরে,

—তুমি এখানে কেন?

রঘু বলল,

—আগে বলুন, আপনি এখানে কেন?

তুলসীর অস্পষ্টস্বরে জবাব,

—আমি যেখানে খুশি থাকি, তোমার কী?

—আমার কিচ্ছু না। তবু, আপনি এখানে কেন?

—আমি এখানেই থাকি। আর কোথায় যাব আমি?

না বললেও রঘু গেল ঘরের ভেতরে, তুলসী বাধা দিয়েও দিল না। বলল,

—এই, ভেতরে কেন তুমি? বাইরে যাও এক্ষুনি।

রঘু যেন শোনেনি। বলল,

—এখানে বসতে পারি?

এবার তুলসীর তীব্র প্রতিবাদ,

—না। না। যাও তুমি এখান থেকে। কেন এসেছ? ছিঃ!

রঘু তখন ভীষণ বুঝদার। বলল,

—যে জায়গায় ছিঃ, সেখানে আপনি কেন তুলসীজি?

বলল,

—যাও তুমি। তোমার মতো ছেলেকে এখানে আসতে নেই।

রঘুর এটাই মুস্কিল। মাথায় কিছু চাপলেই জেদ বাড়ে। বলল,

—চলুন, আপনাকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

তুলসী বিপন্ন পুরোপুরি। বলল,

—কোথায়?

রঘুর প্রত্যয়ী স্বর। বলল,

—কোথায় জানিনা, কিন্তু এখানে আর নয়।

প্রচণ্ড বিপন্নতা ও কষ্টে হেসে ফেলল তুলসী। গলার স্বরে হাল্কা মেঘ ও ছায়া। বলল,

—তুমি সত্যিই সরফিরা। একদম পাগল।

রঘু বলল,

—আর জেনে রাখুন। আমি বাজে, লেখাপড়া করি না,

দাঙ্গা করি, তাড়ি খাই। কতকিছু করি।

তুলসী আস্তে বলল,

—সব জানি।

রঘু সহজ করে দেয়। যদিও রেগে যায়। বলে,

—জানেন যখন, না বলছেন কেন? চলুন তাড়াতাড়ি।

—না।

—না কেন?

—ইচ্ছে হলে-ও তোমার সাথে যেতে পারবনা রঘু।

—কেন?

তুলসীর দিঘল চোখে জল টলটল। স্বরে অদ্ভুত রৌদ্রছায়া। বলল ভাসাভাসা স্বরে,

—লাচারি! আমরা সবাই অসহায় রঘু। আমিও।

তুমি ফিরে যাও, হাতজোড় করে বলছি।

—আমিও খারাপ। আমি যাব না। আপনি চলুন আগে।

তুলসী বোঝায়,

—না, তুমি অন্যরকম।

—অন্যরকম মানে?

তুলসী বোঝাতে চেয়েও পারেনা। বলল, অন্যরকম মানে অন্যরকম। তোমার দুটো চোখ বলে দেয় তুমি আলাদা, রঘু। যাও, তুমি যাও। কী করছ এখানে?

রঘু বলিষ্ঠ দু-হাত রাখে তুলসীর কাঁধে। দুজন দুজনের চোখে যাবতীয় ভর রাখে। দুজনের স্তব্ধতা এখন গভীর থেকে গভীরতর।

সহসা, জোর ধাক্কায় রঘুকে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দরোজা বন্ধ করে দেয় তুলসী।

রঘু ডাকে,

—মেরে বাত সুনিয়ে তো। তুলসীজি।

চাপা কান্নাসহ তুলসীর জোরালো ধমক শুনে বাইরে দাঁড়িয়ে। তুলসী অবিরাম ধমকায়

—ভাগো, এখান থেকে! ভাগো! উন্মাদ কোথাকার!

রঘু এই প্রথমবার ডাকল ওর নিজস্ব মানবিক সম্বোধনে। বলল ধরাগলায়,

—আমি গন্দাকাম করতে এখানে আসিনি তুলসী দিদি! তোমাকে নরক থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। এখানে তোমাকে মানায় না গো!

আর কিছু না বলে তিনতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে একতলা, একতলা থেকে গলির পথে বেঁকে যায় রঘু। আর মনে-মনে ফুটেজ বাড়ায়। এবার নিজেকে নিয়ে আরো কিছু ফুটেজ।

রঘুর শেষডাকের পরই দরজা হাট করে খুলে দেয় তুলসী। দু চোখে জল, বলেই অস্পষ্ট দেখে সব। সুতরাং দৃশ্য হয়না—রঘু বেরিয়ে গেল গলি ছেড়ে। চাপাস্বরে একবার ডাকে তুলসী,

—রঘু ভাইয়া, লৌট আও মেরে পাস!

মজা করে বুলন প্রসাদ বলল,

—এ রঘু।

—বোলো?

—কভি সিনেমা বানায়া তো হিরো-হিরোইন কৌন হোগা রে?

রঘু তেমনি হাল্কা গলায় বলল,

—এখনও ঠিক নেই। তবে ভিলেন ঠিক করা আছে?

—কে, প্রাণ?

—আরে না না। ও বহুৎ আচ্ছা ভিলেন।

—তো আর কে?

রঘু ফাজিল হেসে বলল,

—ইয়ে টাকলামুনির।

—কিয়া?

জোরে-জোরে হাসে সবাই। টাক্‌লা মুনির-ক।

রঘু বলল,

—টাকলা মুনিরের মাথা ক্যারম্‌বোর্ড। মোঁছ আছে। দেহটা হাতির মতো। শেষ সিনে থাকবে—হিরো হাত দিয়ে না, কারণ পারবেনা। রোড রোলারে পিষে মারছে মুনিরকে।

আর হাসির তোড়। বুলন বলল,

—ক্যারে টাক্‌লা, ভিলেন বনবে হ ক্যা?

টাক্‌লা মুনির বলল,

—বন জাই। লোকিন এ রঘু।

রঘু বলল উত্তরবিহারী,

—ক্যা ভইলে।

শরীরে যেন বিষধর সাপের বিষ, তেমনি কাঁপিয়ে বলল টাক্‌লা মুনির,

—তোহর ফিলমুয়া মে অংরেজি মত ঝাড়িয়ো। হম নেহি কহ পাউঙ্গা তোহর অংরেজি। ভিলেন বননে মে হর্জা কাহে?

এবার গম্ভীর হয়ে যায়। রঘু মেজাজের তো অন্ত নেই। এই রোদ, এই ছায়া, এই মেঘ।

দূরে-দূরে জ্বলে উঠেছে নিউকলোনির আলোর মালা। কোয়ার্টারের সার-বন্দি, মাথা ধরে নিওনের পোস্ট। সব জ্বলজ্বল করে।

আরও দূরে দীর্ঘ রেলইয়ার্ডের পুর্বদিকে সুদীর্ঘ মাস্ট। মাস্টের মাথায় অসংখ্য ফ্লাডলাইট।

আকাশে তারায় তারা। দিকে-দিকে সন্ধ্যারতি। কোয়ার্টার থেকে শব্দ আসে, কারও গৃহে উলুধ্বনি। পিদ্দিমের মতো, সন্ধ্যার আকাশে,আলো দেয় লালচে গ্রহ মঙ্গল।

রঘু আনমনা। বুলন বলল,

—কী হল ডাইরেক্টর সাহিব?

—উঁ?

—কী হল তোমার বস্‌?

একটু সময় নিয়ে রঘু বলল বলকোচিত আবেগে, যদিও গলার স্বর ভরাট, গম্ভীর।

—আমার ফিল্মে কেউ ভিলেন থাকবে না। বড়কাভাইয়া। সবাই হিরো, সবাই হিরোইন। কোনও মানুষ কোনওদিন ভিলেন হয় না। ওকে সাজিয়ে দেয়া হয়। বাট হিয়ার লাইজ এ প্রবলেম, ইউ নো?

কেউ কিছু বলে না রঘুর কথায়। রঘু নিজের মনে বলে যায়,

—আই নিড এ স্ক্রিন প্লে অ্যাট ফাস্ট। দেন ফাইনান্স। কোথায় পাব এ দুটো?

বুলন বলল,

—কী বলছিস?

রঘু বোঝায়,

—আরে পৈসা ঔর লেখ্ চাহিয়ে মুঝে? কাঁহা মিলেগা?

বুলন সমাধান দেয়,

—তুই লেখাপড়া জানিস, লিখে নে।

—আমি?

—কেন? তুই না কেন?

রঘু বলল,

গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারি না।

বুলন ধমকায়,

—কী পড়াশোনা করলি এতবছর? মন দিয়ে পড়। এখনও সময় আছে। যখনই দেখি চক্কর মারে পুরা জিল্লা।

ওদের কথা কেটে ইনারদেও বলল,

—কতো পৈসা লাগে ফিল্লম বানাতে? আমি দেব।

বুলন বলল,

—তু দেগা পৈসা?

—হাঁ। মগর একঠো শর্ত।

—কী শর্ত?

—হিরোইন আপনা পসন্দ কা হোনা চাহিয়ে।

টাকলা মুনির বলল,

—কৌন হোগি হিরোইন? তোর ঘরওয়ালি?

বুলন বলল,

—এ বুড়বক, পহলে বোল কিতনা পৈসা দেগা তু?

প্রযোজক ইনারদেও-র ঝটপট জবাব,

—তিন হাজার পুরা। দরকার হলে ডানকুলির খেত বেচে দেব।

বুলন বলল,

—হবে, হবে। তোর পসন্দের হিরোইন কে?

ইনারদেওর পটাপট জবাব। কাঙ্ক্ষিত নায়িকার নাম বলল,

—সাধনা।

ডিরেক্টার-সাহেব বোমার মতো ফাটলেন,

—শাটআপ এভরিবডি! কিয়া বকো যা রহে হো তুমলোগ। যে হিরোইনের নাম বললে ওর একজোড়া চপ্পলের দাম এর চেয়ে বেশি। ডু ইউ নো?

ফাইন্যান্সার কাঁচুমাচু। ভাবল—আমরা এতো গরিব। ধুর! এতো দামি চপ্পল কেউ পরে?

—রঘু সাময়িক হতাশায় বলল,

—বুলন ভাইয়া।

—কিয়া?

—বিশ পঁচ্চিশ লাখ। ইতনি বড়ি ফাইন্যান্স কাঁহাসে মিলেগা? ফিল্ম বনেগা নেহি।

হতাশায় মানুষের আফসোস বাড়ে। আর আফসোসে বাড়ে ক্রোধ। এই নির্বল ক্রোধে সবাই বলল,

—সব কাজ আমরা করি। ওয়াগন তোড়না, সামান উঠানা, ধামাকা করনা। কভি কভি মর ভি জানা। ও আর সব শুষে চুষে খেয়ে নেয় মুনিমজি ঔর আকা। হম ক্যা হ্যাঁয় রে?

রঘু তাতায়,

— পাপেটস্

বুলন বলল,

—কিয়া মতলব?

রঘু ভোল্টেজ বাড়ায়। বলল,

—কাঠের পুতুল তোমরা সবাই। ওরা খিলাড়ি। জান খতরায় দিয়ে ওদের মুনাফা করাচ্ছ। নিজেদের আলাদা টোলি (দল) বানাও বড়কাভাইয়া। না হলে শুকিয়ে মরবে সবাই।

পরিবেশ গম্ভীর হয়ে যায়। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। রাত হচ্ছে। কোটি-কোটি মাইল দূরের লালমাটির গ্রহের আলো আরো উজ্জ্বল। এই অন্ধকারেও কিছুটা আলোকিত চত্বর।

বুলন তাকায় রঘুর দিকে। বুলনের সারামুখে বসন্তের পুরনো দাগ। গ্রহের আলোয় স্পষ্ট দেখে রঘু, বুলনের দুচোখ জ্বলেই আবার নিভে যায়। পরিবর্তে নিদারুণ অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে।

রঘু বলল,

—ঠিক বলছি তো আমি।

বুলন বলল,

—না। ঠিক বলিসনি।

না কেন?

রেললাইন ধরে খাগারিয়া-বারৌনির দিকে ছুটে যায় লম্বা গুড্‌স্‌ট্রেন। কয়লা ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া অন্ধকার আকাশে দেখা যায় স্পষ্ট। গ্রহের আলো সত্ত্বেও আকাশের মালিন্য বাড়িয়ে দেয় বাষ্পীয় শকট।

ক্ষীণ চটাক-চটাক, চটাক-চটাক শব্দ আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যায় অনেক দূরে। পোড়া কয়লার গন্ধ ভাসে বাতাসে, এতে ভার হয় আরো সবকিছু। আর যাবতীয় মালিন্য ভর করে বুলনের মুখাবয়বে।

বুলন শান্ত ম্রিয়মাণ গলায় বলে প্রকৃতই লাচার কণ্ঠে,

—ঠিকই বলেছিস। আমরা সবাই কাঠ-পুতলি। যেভাবে নাচাবে, তেমনি নাচতে হবে আমাদের।

রঘু বলল,

—বিদ্রোহ করো। একাট্টা সবাই মিলে বিদ্রোহ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুলন বলল,

—তা হয় না রে ছোট্‌কাভাইয়া। বিদ্রোহ করতে হলে শক্তি চাই। ওদের শক্তির মোকাবিলা হয়না।

—কেন?

বুলন স্পষ্ট বোঝায়,

—রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, কারবারি সবাই ওদের পেছনে আছে ঢালের মতো। সব ওদের হাতে। টাকার এমন জোর। এছাড়া,

বুলন থামে। রঘুবলল,

—এছাড়া কী?

বুলনের অসহায় কণ্ঠ। বলল,

—এরা ভীষণ নিষ্ঠুর আর শঠ।

—হোক। তোমরা একট্টা হও। খাল্লাস করো ওদের।

—তোহর দিমাক মে গর্মি জ্যাদা। বুদ্ধি আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই।

—মানে?

—আমাদের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রাখে ওরা, যাতে কেউ কারো সাথে মিলে কোনও ষড়যন্ত্র করতে না পারি। বুঝেছিস?

নিজেদের অসহায়ত্বের বাখান নীরবে শোনে ইনারদেও আর টাকলা মুনির।

পাখিদের কিচিরমিচির অশান্ত করে নৈঃশব্দ, ইনারদেও সিগারেট ধরায়। অন্ধকার

দুনিয়ার তিনজন চুপচাপ বসে থাকে ভাঙ্গা চত্বরের মেঝেয়।

তারার কোনো আলো এখানে আসেনা। সন্ধ্যা হয়েছে সেই কবে। এখনো সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ অন্ধকারের কঠিন রাত।

বুলন ডাকল একসময়,

—রঘু রে!

—জি বুলন ভাইয়া?

—তুই আমাকে কিছুটা ইজ্জত করিস তো?

—কেন এমন বলছ?

একটু থেমে বুলন বলল,

—আর আসিস না আমাদের কাছে।

রঘু অবাক। বলল,

—কেন ভাইসাব?

বাকি দুজন বলল,

—ঠিক। আসিস না আর।

রঘু বিপন্নস্বরে বলল,

—কেন মুনিরভাই? এ ইনার ভাইয়া, কিয়া মুঝপর ভরোসা নেহি? বিসোয়াস খো চুকা হুঁ কিয়া?

এবার তিনজন সমাজবিরোধীর সম্মিলিত কণ্ঠে বাজে অন্য ধ্বনি। যে ধ্বনি শুনতে অনেকপথ, অনেক দুর্গমতা অনেক বিপদ শঙ্কাহীনভাবে অতিক্রম করতে পারে রঘু।

ওরা বলল সমস্বরে,

—নেহি রে ভাই। আমাদের রক্তের চেয়ে-ও বেশি বিশ্বাস করি তোকে। তুই আমাদের ছোটকা ভাই।

এবার বুলন বলল,

—তু মনমৌজি, দিলের, সিধা ইন্সান। হম-সব্ চোর-উ চাক্কা, লুটেরা, খুনি। কিঁউ আয়েগা হামারে পাস?

রঘুর বুক ওথলায় সহসা। তীব্র অভিমান ভার করে ওকে। বলে কাঁপা-কাঁপা গলায়,

—তোমরা না চাইলে আর আসব না। এখানে এলে কী মনে হয় জানো?

তিনজনেই বলে,

—কী?

রঘু বলল স্পষ্ট শব্দে,

—আমার আপনজন আছে এখানে।

হাতিসদৃশ ভয়ঙ্কর চেহারার টাকলা মুনিরের দুচোখ ভিজে যায় অবিশ্বাস্যভাবে।

রঘুর বাক্যের মহিমা তাড়া করে ইনারদেওকে। বলে,

—হমলোগ অপনা আদমি? ফিরসে বোল্। বহুৎ পাগ্‌লা হ্যায় রে তু, রঘু!

বুলন একটাই শব্দ বলে কেবল,

—আপনা আদমি!

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

প্রায়ান্ধকার, শান্ত, সবাই জানে এ দূষিত স্থান; কিন্তু কেবল চারজন, জোনাকির আলোয় আলোকিত অন্য পৃথিবীতে বসে রঘু বলে,

—এসব নিয়েই তো আমার ফিল্ম, বুঝেছ তোমরা?

তবু ওরা বসে রইলো নির্বাক, আচ্ছন্নের মতো। 'আপনা আদমি, 'আপনা আদমি'—দুটো নিছক শব্দ' পাথর চিরে জল বের করে দেয়।

একসময় বুলন বলল,

—ফিরভি। মত আনা। হমসব কিসিকা আপনা আদমি নেহি হ্যায়। তু ঘর কো লৌট যা রঘু। কভি মত্ আনা। যা ভাগ, ভাগ যা।

গলায় ক্রোধ নেই বুলনের। ক্ষোভ আছে অন্য জ্বালা আছে। এই জ্বালা জন্ম দেয় রঘুর প্রতি অপার স্নেহ।

ইনার দেও-টাকলা মুনির বলল একই কথা,

—কী পাবি এখানে তুই? যা, পালা। বুলনজি ঠিক বলছে।

রঘুর বুক আবার টনটন করে। কী করে বোঝাবে—ওই চত্বরের ঝোঁপঝাপের ফাঁকফোকরে আছে আঁধার দুনিয়ার তিনজন মানুষের বিকিরিত নিবিড়তা? কে কী করে বড়ো কথা নয়। সময় ও পরিস্থিতিতে কত কাজ কতজন করে ফেলে বেনিয়ম। এই টাকলা মুনির ইনারদেও আর বুলনভাইয়া-ও কারও গর্ভে জন্মেছে একদিন হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদেছে, হামাগুড়ি দিয়েছে, আদুল-আদুল কথা বলেছে—তারপর বড়ো হয়েছে। না, মায়ের পেট থেকে খসে পড়েই শাণিত শস্ত্র হাতে হানাহানি করেছে? ওয়াগন ভেঙেছে চলন্ত ট্রেনের? এমন কি কেউ করতে পারে? মানুষের বুনিয়াদ কী? মাতৃজঠরের মায়াময় অন্ধকার ও শৈশব—যেখানে কোনো কুটিলতা নেই। কুটিল মাতৃস্তন বলে কোনোকিছু আছে কি? ধুর! কাকে বোঝাব। সব মূর্খের দল। বলছি তো, এসব নিয়েই আমার ড্রিম ফিল্ম। আমি স্বপ্ন দেখি, অন্যকে দেখাতে চাই। কোনো অবাস্তব অকল্পনীয় স্বপ্ন নয়। মানুষের হাতে বিলিয়ে দেওয়া মানুষেরই স্বপ্ন।

প্রত্যাশা আর স্বপ্ন ছাড়া মানুষের সম্পূর্ণ জীবন কি মানায়? ঐ যে লুসি গ্রে? কী করত? বরফে ঘুরে বেড়াত একা-একা। খুঁজে বেড়াত নিজের মৃত সহোদর-সহোদরাকে। জানে—পাবে না। তবু যদি পাই—এ আশায় তো অন্বেষা আর অন্বেষাই জীবন। এসব ছাইপাশ নিয়েই আমার ফিল্মের লম্বা-লম্বা ফুটেজ। কিন্তু কাকে বোঝাব? গবেট সব।

বীতশ্রদ্ধ রঘু সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ায়। বুকে টনটনানি আছে। দুই ঠোঁট চেপে ধরে

আবেগে। তাকাল ওদের দিকে। ওরাও ওকে দেখে।

বুলন বলল,

—চললি?

—হ্যাঁ, চললাম আপাতত।

—আপাতত মানে?

—আবার আসব।

উঠে দাঁড়ায় বুলন। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অন্ধকারেই কুড়িয়ে তোলে ছোটো ছোটো পাথর। ছুঁড়ে দেয় রঘুর দিকে। বলে ভাঙা গলায়,

—কিছু বোঝেনা। ভাগ! ভাগ এখান থেকে। বুড়বক।

পেছন মুড়ে রঘু হাঁটতে থাকে। বুকের বাতাস চোখের জলে বদলে যায়। বলে বসে যাওয়া গলায়,

—কোথায় ভাগবো বড়কাভাইয়া? ভাগতে ভাগতে আবার মানুষের কাছেই তো ফিরে আসতে হয়। কোথায় যাবো? কেউ বোঝেনা!

রঘু অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ইনারদেও বলল,

—এ তুমি কি করলে বুলনজী। রঘুভাইয়া নারাজ হ গইল, বুলন কাঁপা-কাঁপা বলল,

—হোক। এতে ওর মঙ্গল হবে!

টাকলা মুনির বলল,

—বহুৎ তেজ রঘুয়াকে।

কিছুটা সময় কাটে। বুলন আরো একটা সিগারেট নেয় মুখে। ইনারদেও-টাকলামুনির বোতলের কর্ক খোলে। জলছাড়া ঢেলে দেয় গলায়। দুজনেই। বোতল দেয় বুলনের দিকে। বুলন বলে,

-নেহী।

টাকলামুনির বাদাম চিবোতে চিবোতে বলল,

—খাবে না?

—না।

একসময় ইনারদেও ডাকে,

—এ বুলনজী।

অন্যমনস্ক বুলন বলে,

—কিয়া?

—রঘু কী নিয়ে ফিল্ম বানাতে চায় ঠিক বুঝলাম না।

বুলন বলল,

—তুই বুঝবিনা। আমি-ও স্পষ্ট বুঝিনি। এতোটা জানি—রঘুকে বোঝা এতো সহজ

নয়। ও অন্যরকম।

ইনারদেও আবার বলল,

—এ বুলনজী।

—কি?

—রঘুর কি কেউ নেই?

—মতলব?

—হেস্টেলে থাকে। রহনসহন উঁচেলোগ জৈসা। লেকিন, মা-বাবা বাকি সব কাঁহা?

বুলন বলল,

—এতটা জানিনা। শুধু এটাই জানি, ওর মা নেই। ওর বাবা বড়ো সরকারি চাকরি করেন বাইরে। ও লিখাপড়ায় খুব তেজ। জববর ক্রিকেট খেলে। গান গায়। ঝিলিক নামে একটা মেয়ে ওর দিওয়ানি। ঝা-জি ওর খুব কাছের লোক।

টাকলামুনির বলল,

—আর ক জানো ওর সম্বন্ধে?

একটু থেমে বুলন বলল,

—মাথাটা গরম আছে ওর। তেজ্ দিমাক, তবু লিখাই পড়াই করে না শুনেছি। ফরবেসগঞ্জ থেকে ফিরছিলাম ট্রেনে। একই কামরায় ছিলাম দুজন। কথাবার্তা হল, পরিচয় হলো। নিজের পরিচয় কী আর দেব। রঘু ও তেমন কিছু বলেনি। স্রেফ বলল, 'আবার নাম রঘু। এমনি এমনি ঘুরতে মজা লাগে। বিরাটনগর গিয়েছিলাম।' ছেলেটা মনমৌজি টাইপ। লেকিন দিল বিলকুল সাফ।

এতটা কথা বলে থামে বলুন। ওরা বোঝে রঘুর জন্যে অবর্ণনীয় টান বুলনের? ওর যদি কিছু হয়, বা কেউ কিছু বলে বা করে, বুলনপ্রসাদ চিরে রেখে দেবে সবাইকে। ছোটকাভাইয়া এমনি বলেনা।

টাকলামুনির বলল,

—একটা কথা।

বুলন সিগারেট ফেলে দেয়। বলল,

—কী কথা?

— মাতৃভাষাটা কী?

—কেন? আমি জানি ও বাঙালি। কেন একথা বলছিস'

টাকলামুনির বলল,

—খালি তো অংরেজিই বলে। কী বলে কিছু বুঝি না।

বুলনের হঠাৎ গর্ব হয় হাল্কা। বলল,

—আমাদের রঘু অংরেজি, হিন্দি, উর্দু, মারাঠি, ভোজপুরি পাঞ্জাবি, মাদ্রাজি সব

বলতে পারে। বললাম না, তেজ দিমাক। না হলে কি ঝা-ড়ীর মতো মানুষ ওকে এত খাতির করেন। শুনেছি ওর বাড়িতে রঘুর অবারিত দ্বার। কিন্তু মুস্কিল, ঔর শির গরম আছে। মগর বহুৎ প্যারা হ্যায় হামার রঘুয়া।

আরো কিছুটা সময় গড়ায়। এখন অবসর। আজ কাজ হবে মাঝরাতে।

বোতল প্রায় শেষ। বুলনপ্রসাদ এক ফোঁটা ছোঁয়নি।

নেশার ঘোরে টাকলামুনির বলল,

—ওর যদি কিছু হয়ে যায়, তো

বুলন তাকায়। বলল,

—কিয়া মতলব?

টাকলামুনির বলল।

—আমাদের কাছে আসে তো। বিরজুর পার্টি যদি ছোরা-ঔরা চালিয়ে দেয় কিম্বা আর.পি.এফ গোলি-উলি মেরে দেয় যদি?

ইনারদেও বলল,

—সচ্চা বাত বুলনজি। বেকসুর মর যায়েগা রঘু।

উঠে দাঁড়ায় বুলন এবার। ছ-ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চির গ্র্যানাইট পাথর। বত্রিশ বছর আগে, সেই গোরখপুর শহর থেকে তিন কোশ দূরে এক ঘুম-ঘুম গ্রামে জন্মনেয়া মালাহ্ সম্প্রদায়ের বালক বুলনিয়া—যে নামে আদরে ডাকত ওর বাপ-মা সেই কবে—যার হাতে একজন লোক প্রাণ খুইয়েছে দুবছর আগে, যে হাত লক্ষ-লক্ষ টাকার 'সামান' এধার-ওধার করে নেপালসহ এই দেশের বিভিন্ন কোণায়—সে, কী এক দুর্বোধ্য মায়া ও আবেগমথিত গলায় চাপা গর্জন করল এই অন্ধকারে,

—রঘু ভাইয়া কো কিসিনে কুছ কিয়া তো জিন্দা গাড় দুঙ্গা সব কো সালে! সুনা তুম লোগ? ঔ হামার ছোট্‌কা ভাইয়া। ইয়াদ রখ্‌না হরবক্ত।

একথাগুলো উচ্চারণ করে প্রমাণ করে দিল বুলন—কঠিন উপলখণ্ডেও জল আছে—যেখানে কচি অশ্বত্থ চারা জন্মায় নিশ্চিন্তে। এও প্রমাণিত হল মরুভূমির উষরতায় মরুদ্যান থাকে। গর্জনশীল বজ্রের নির্ঘোষেই নরম নিলাভ আলোর ছটা থাকে।

ঝিঁঝি ডাকে এখানে। আরো এক মেলট্রেন বেরিয়ে গেল দিল্লিগামী। ট্রেন চলে যেতেই আবার সব সুনসান। সামনেই মাঠ। মাঠের পর ওয়েস্টকলোনির অফিসার্স কোয়ার্টারের আলো। ওদিকে বিস্তৃত আমবাগান।

দূর, পশ্চিমে একগ্রাম। গ্রামের নাম লখাইশরিফ। যেখানে কাচ্চা হোলিপ্যাড। কিছুদিন আগে নয়া জেনানা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির উড়ান পাখি নেমেছিল। রঘু গিয়েছিল ওখানে। গান্ধি দেখতে নয়। কপ্টার দেখতে।

এখান থেকেই গ্রামের তির তির আলো দেখা যায়। কেউ খোলা আকাশের তলায়

পোয়াল জ্বেলেছে। মাইক বাজে ঐ গ্রামে। শব্দ ভেসে আসে, 'ও গঙ্গা মাইয়া তোহে পিয়ারি চড়াইবে ...।'

উত্তর বিহারের বিখ্যাত লোকগীত, যে-গান প্রায় প্রতি ঘরে বাজে সকাল সন্ধ্যা রোজ।

টাকলামুনির বলল,

—সিগ্রেট পিবে হ ক্যা বুলনজি?

—নেহি।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় বুলন। টাকলামুনির দেশলাই জ্বালায়। সিগারেট খাবে।

আঁধার চিরে আলো কাঁপে চারধারে। কেবল একটাই জ্বলন্ত কাঠির তুচ্ছ শিখা অনেক অন্ধকার সরায় দুহাতে।

দুহাত কোমরে রেখে দাঁড়ায় বুলন। বলে খরখরে কঠিন গলায়,

—সুনো তুমলোগ।

—ক্যা বুলনজি।

—অগর কিসিদিন হম না রহে তো আমার ছোটকাভাইয়া রঘুকা খেয়াল রাখিয়ো। বড়ো পরিষ্কার ওর মন; যতোই মারকুটে হোক।

বুলনের কণ্ঠ থেকে শব্দ তো নয়, বেরোয় এমন সব ধ্বনি, যে-ধ্বনি অন্ধকার অস্থির কুটিল পরিসরের বুলনপ্রসাদকে আবার বুলনিয়া করে দেয়। ধ্বনি রিনরিন বাতাসে ভাসে—"অগর কিসিদিন হম না রহে তো ......।'

বুলনিয়া আর বুলনিয়াও থাকে না। অবারিত, অনাবিল আলো হয়ে দ্যুতি ছড়ায়। শান্ত, স্থির, মায়ার দ্যুতি। এখন এখানে রঘু নেই। থাকলে ওর ড্রিম ফিল্মের আরো কয়েকশোফুট ফুটেজ বাড়াতো নিশ্চিতই।

যেখানেই কোনও উষ্ণতার ওম, সেখানেই রঘুর ফিল্মের বেহিসেবি ফুটেজ। যে ফুটেজে রঘু কোন এডিটিং করবে না—এ তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও প্রত্যয়।

রঘু বলল,

—বুলন ভাইয়া।

—ক্যা হ্যায় বে?

—আমিও যাব।

—কোথায়?

—তোমাদের সাথে।

—কোথায় যাবি?

—মাল আনতে যাবে তো পরশু তোমরা?

—তোকে কে বলল?

—কেউ বলেনি। আমি শুনেছি জাসুসি জুবানে কথা বলছিলেন তুমি আর গণপৎ।

বুলন তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ করে রঘুকে। একটু হাসে। বলল,

—কী বলেছি আমরা?

রঘু বলল,

—পশুপতি কা নিচে।

—এতে কী হয়?

রঘু জট খোলে,

—এর মানে নেপাল। তবে কাঠমান্ডু না।

—কী?

—ইয়েস। বিরাটনগর বা অন্য কোথাও হবে, নিচে যখন।

বুলন তাজ্জব, অবাক। প্রশংসা ও তীব্র শঙ্কায় বলল,

—আর কী বুঝেছিস রে জাসুস?

রঘুর উৎসাহ প্রবল। বলল,

—বিড়ি নিয়ে যাবে তোমরা, তাই না?

—মানে?

—বিএসএফ বললে যে।

—তাতে কী?

রঘু আরো জট ছাড়ায়। বলল,

—বিএসএফ এর পোশকের রং আর বিড়ির রং একরকম।

বুলন ফিসফিস স্বরে বলল,

—চোপ্ বে। মার ডালেগা তু। নিজেও মরবি।

রঘুর কাছে অপঠিত পাঠ সহজ হয়ে গেছে। সব কোশ্চেন কমন। তেমনি উল্লসিত ছাত্রের মতো বলল,

—তোমরা গাঁজা আনবে ওখান থেকে, আমি জানি।

রঘুর মুখ চেপে ধরে বুলন। বলল,

—মার ডালেগা সবকো। ইতনা তেজ খোপড়ি কাহাঁ সে মিলারে তেরেকো? ইতনা ভি আচ্ছা নেহি। মরেগা।

সজোরে বুলনের হাত সরায় রঘু। বলল,

—বোলনে দো ন ইয়ার। হাত সরাও। মরনা হ্যায় তো মর যাউঙ্গা।

—ঔর কিয়া বোলেগা রে উস্তাদ?

রঘুর কাছে সব জলবৎ তরলং। মৃত্যুভয়কে ছাপিয়ে যায় জাসুসি জুবানের রহস্য ভাঙার মাত্রাধিক উৎসাহ। কিন্তু বুলনের স্বরে শঙ্কা ও চিন্তা। বলল,

—কী করে বুঝলি এতসব?

—কী ভাবে বুঝলাম জান?

উৎকণ্ঠিত বুলনের প্রশ্ন,

—কী ভাবে?

—গণপৎ যখন বলল।

—কী বলল?

—ফটাফট ফাটনেওয়ালা শুকনো পাতা।

—এতে কী হয়?

—খুব সোজা হয়। শিবমন্দিরে দেখেছি সাধুরা যখন গাঁজা খায়, চিলিমে বিচি ফাটে ফটাফট। আই টুক্ এ পাফ্ দেয়ার।

—কী?

—এক টান আমিও দিয়েছিলাম। নাক দিয়ে গলগল করে বেরোয় সাদায় নীলে ধোঁয়া। কোন মজা নেই। গন্ধ, পোড়া পোড়া।

বুলন চত্বরে বসে পড়ে ধপাস। এ কোন চিজরে বাবা। যদি এ ছোড়া এই লাইনে আসে, বয়স ও অভিজ্ঞতায় এ কী করবে? থরথর কাঁপাবে সব। হমসবকা 'আকা' বনেগা। বাপরে। জাসুস। মহাজাসুস।

এদিক-ওদিক তাকাল। কেউ নেই। শূন্য গোদাম। পাটকল বন্ধ হয়েছিল কয়েকবছর আগে। গোদামটা আছে। বুলন এই গোদামে থাকে। এখানে আলো জল সবকিছু ব্যবস্থা আছে।

চারপাই একটা, চেয়ারসহ টেবিল, স্টিলের বড়ো আলমিরা, সিলিং পাখা। গোদামের এককোনায় জনতা স্টোভ, বর্তন-উর্তন সব আছে। রসুই করে দেয়ার অন্যলোক গোদামের গেটের পাশের গুমটি ঘরে থাকে।

উল্টোদিকে আরো একটা গোদাম। কচ্ছপের পিঠের মতো ঢেউটিনের বাঁকা চাল। আংরেজ আমলে অ্যামুনিশন ডিপো ছিল। পরে পাটকল মালিকের কাছে বেচে দেয়া হয় শূন্যগোদাম। অ্যামনিশন ডিপো ডিসব্যান্ড হয়ে যায় স্বাধীনতার আগে।

পাটকল বন্ধ। পাটের চলন কমছে দ্রুত ফলে দখল নিচ্ছে সিনথ্যাটিক ব্যাগ বা বস্তা। পাটকল বন্ধ হলেও পাট নরম করার খুবই সস্তা কুলান্টওয়েল আমদানি করা হয় এখনও। অনেকগুলো পিপা আছে এমন তেলের। সরসোঁ-কা-তেলে মিলাবট করা হয়। উল্টোদিকের গোদামে এসব কর্মকাণ্ড চলে।

রঘু বলল,

—হোয়াট হ্যাপেন্ড?

রঘুর পাল্লায় পড়ে বুলন অংরেজি বোঝে কিছুটা, অন্তত কী বলতে চায় ছেলেটা আর

বাচনভঙ্গি। বুলন বলল।

—মেরা মাথা ঘুম গয়া রে! ইত্না সব কাঁহা সে শিখা তুনে রঘু? সচ্ বোল।

বুলন জানে রঘু কী? তবু আচম্বিত কৌতুহল ওকে এমন অদরকারি প্রশ্ন করায়।

সুতরাং তেমনি বিস্মিত প্রশ্ন করল বুলন,

—আগে কোন দলে ছিলি তুই?

রঘু বেজার, বিরক্ত। বলল,

—কী বলছো আবোল তাবোল?

বুলন তবু বলল,

—তোর টোলিতে কে কে আছে রে?

—কিয়া মতলব? কিয়া বকে যা রহে হো!

রঘু বসে বুলনের পাশে। বুলন এখনো একদৃষ্টিতে দেখছে রঘুকে।

ভীষণ তেজ দুটো চোখ ছেলেটার। কিন্তু চোখদুটোতে নিষ্ঠুরতার চেয়ে মায়া বেশি। কত বয়স হবে ছেলেটার। উনিশ-কুড়ি? এই বয়সে এত।? এই ছেলেটা ধান্দাবাজ হতেই পারে না—বুলন জানে একশভাগ। ছেলেটা খামখেয়ালি, মাথা-গরম-লড়াকু, এই যা। এর বেশি নয়। না-হলে তুলসীর মতো স্ত্রীলোক ওকে এত স্নেহ করত না।

রঘু বলল,

—কী দেখছ বুলনভাইয়া।

অন্যমনস্কতা কাটে বুলনের। আস্তে বলল,

—তুই কে রে রঘু?

—কে জানে? আমি রঘু। রঘু পুরকায়স্থ। দিস মাচ।

—সত্যি বল তুই কে?

রঘু উত্যক্ত। এমন প্রশ্ন অনেকেই করে কেন? সেই চাড্ডাআন্টি, হিমানীজি, সুরতিয়া, আর এখন এই বুলনভাইয়া।

ভেতরের স্থৈর্যে অটুট রঘু নিঃশব্দে বলল,

—আমি কেউ নই, কারো নই। কী পরিচয় আমার জানি না আমি। আমি নীরবে থাকি, আর রক্তমাংসের রঘুকে নিয়ন্ত্রণে রাখি।

মাত্র দুজন মানুষ ছাড়া গোদাম জনহীন। প্রাণী বলতে বুলন রঘু ছাড়া কয়েকটা চড়াই ও তিনটে পায়রা ঐ কোনায়, ওদের নিবাস। ডাকে বক-বকম, বক-বকম।

সিলিঙে ঘুরছে বায়ান্ন ইঞ্চির বিরাট পাখা কিচির-কিচির-কিচির-কিচির।

এসব দেখতে দেখতে একটু হেসে রঘু বলল ভাব লেশহীন কাঠ-কাঠ গলায়।

—রিপিটেশন, রিপিটেশন! আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, হোয়াই!

বুলন বলল,

—কী?

—নাথিং। আয়াম অ্যা ঘোস্ট। অ্যা রোলিং স্টোন।

—কী বলছিস রে উল্লু।

—আমি একটা ভূত কিম্বা পত্থর। গড়িয়ে যাওয়া পাথর। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?

বুলনের কিছুই ক্লিয়ার হয়নি। এতোটাই হলে—হামার রঘু, আপনা আদমী। মেজাজি, দিলখোলা, ফিল্মমডিরেক্টর, লিখাইপড়াইয়ে বহুৎ তেজ, লেকিন পড়েনা। অনপড় থাকতে চায়। সবচে বড়ো কথা—বহুৎ ভরোসামন্দ। আমার জন্যে জান লড়িয়ে দেবে ছেলেটা। তাইতো বলে তুলসী,

—তোমাকে খুব ভালোবাসে বুলনজি।

বুলন বলছিল,

—আর তোমাকে?

তুলসী সলাজ হেসে বলেছিল,

—প্রথমদিন ওকে কী ভুল বলেছিলাম। ছিঃ। রঘুকে ভালো না-বেসে উপায় নেই। আমায় তুলসী দিদি বলে ডাকে জান?

বুলন বলেছে,

—সব জানি।

—কি বলেছে জানো?

—তাও জানি। তুমি অনেকবার বলেছ।

তবু আবার নিজের মনে বলল তুলসী,

—বলেকিনা, 'আমি এখানে গন্দা কাম করতে আসিনি। তোমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাকে এখানে মানায়না গো।'

একটু থামে তুলসী। উচ্ছ্বাস, আবেগ, বাৎসল্য—যাবতীয় গ্লানিহীন কষ্টের মানবিক লক্ষণ আবার উদ্ভাসিত হয় ওর কণ্ঠে। বলে,

—ছেলেটা পুরোপুরি পাক্ (পবিত্র)। ওকে তোমাদের থেকে দূরে রাখনা কেন?

—রাখি তো। তবু আসে। বেপরোয়া বহুৎ।

—ভালো কথায় মানা কর।

—ভালো কথা, বকাঝকা কিছুই মান্য করেনা। ডাকাবুকো আছে। নিজের মনেই সব করে। এখন মাথায় চেপেছে ফিল্মম বানাবে।

তুলসী অবাক,

—ফিল্মম, মানে সিনেমা?

—হুঁ।

—কী সিনেমা?

—সপনো কা সিনেমা।

সন্দেহে হাসে তুলসী। বলে,

—অদ্ভুত ছেলে। প্রথম দিনই বুঝেছি । ওর মঙ্গল হোক। আল্লাহ-তালাহ আমার দোয়া কবুল করো!

বুলন আবার বলল,

—মাথাটা আজেবাজে চিন্তায় নষ্ট করিস কেন? সব বুঝিস কেমন এত সাফ?

আর্থার কানান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি ব্যর্থ যায়নি। আরওকতো ক্রাইম আর সাসপেন্স থ্রিলার পড়া হয়ে গেছে। এসব বই ভীষণ টানে। বিশ্লেষণমুখী, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিনির্ভর চিন্তন বাড়ায়। রঘু জানে—বইগুলো দুই লেখক-লেখিকা অনেক ভেবে-ভেবে লিখেছেন। তবে, আর্থার কনান ডয়েলের একটা দোষ রঘু ধরেছে—ওয়াটসন যতটা বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র, শার্লক হোম্‌স্ ততোটা নয়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান—সুতরাং চরিত্রে বিশ্বাস যোগ্যতা কম। কু-ক্লাক্স্-ক্ল্যান শব্দে—রাইফেলের সাথে চটপট সূত্র মিলিয়ে দিলে শার্লক-ভাই—আসলে ডয়েল সাহেব নিজেই সূত্র মেলালেন জোর করে, আর পাঠককে মানতে হল। ডয়েলে ড্রামা বেশি, ক্রিস্টিতে ড্রামা কম। অবশ্য দুজনের কলমই পাব্লিক-পুলার।

এতোসব তো আর বুলন ভাইয়াকে বোঝানো যাবেনা। ফটাফট ধ্বনির সাথে মিলে গেলো শিবমন্দিরে গাঁজার বিচি ফাটার শব্দ। জাস্ট কোইন্সিডেন্স। তখনি খেয়াল হলো আমার কোনো ক্রেডিট নেই বুলন ভাইয়া!

বুলন বলল,

—কী রে, কী ভাবছিস্ উস্তাদ?

রঘু মুখে এটুকু বলল,

—যে-কোনো কথা শুনে তলিয়ে চিন্তা করলে আসল অর্থ ধরা যায়। তোমাদের এ লাইনে সব কথার ডাবল, ট্রিপল, কখনো মাল্টিপ্‌ল্ মিনিং থাকবেই।

বুলন বুঝলো মর্মকথা। এবং এত বেশি বুঝল বলেই এমন এক বাক্য বলল, যা শুনে কোনোমতেই বিশ্বাস হলো না রঘুর, ওর পাশে বসা বুলন প্রসাদ উত্তর-বিহার আন্ডারওয়ার্লডের এক মজবুত চালিকাশক্তি—যারা নাকি নির্দয় আর বিবেকহীন।

রঘুর কাঁধে হাত রেখে বুলন বলেছে,

—ঈশ্বরের দেয়া লা-জবাব দিমাক তোর। পড়াশোনার কাজে লাগাস না কেন ওইসব? তুলসী কী বলেছে জানিস?

রঘু বলল,

—কী?

—ওর আল্লার আছে তোর মঙ্গল, শান্তি কামনা করেছে।

রঘু আনমনা হয় আবার। শান্তি। হায় রে! যার এই সংক্ষিপ্ত জীবন জুড়ে পূর্ণতা ও

রিক্ততার শাশ্বত আখ্যান, যার অন্তর জুড়ে এক সুদীর্ঘ নদীর কলকলধ্বনি, যার জাগ্রত দুচোখে স্বপ্ন ও স্বপ্নহীনতার যুগলবন্দী— তার আবার শান্তি কী? তুলসীদিদি, তোমার আল্লাহ-তালাহ সেই গোড়ায় সব ঠিক করে দিলেন না কেন? মার কি এত তাড়া ছিল সেই নদীর বাঁকে তপ্তশিখায় হারিয়ে যাওয়ার? চাড্ডা আন্টি কেন সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলেন রানিক্ষেত? কেন একবারও বললেন না—'রঘুরে, তুই-ও চল আমার সাথে?' কী প্রয়োজন ছিল। রাতের পর রাত বালিশের বদলে ওর উষ্ণ বুকের? কেন যে মানুষ সব দেয়, আবার সব ফিরিয়ে নেয়!

প্রীতমজি কেন হারিয়ে গেলেন যুদ্ধে? যুদ্ধই বা কেন হয়? প্রীতমজি হারিয়ে গেলেন বলেই তো—নেহা চলে গেলো দূর এটাওয়া। নেহা ছাড়া আবার শান্তি কী?

তোমাদের আল্লা ভগবান কোথায় ছিলেন? ওদের খেয়াল হয়নি তখন—এক বালক দিশেহারা হচ্ছে ক্রমাগত। এক স্মৃতি ছাড়া আর স-ব খোয়া গেছে।

এবারও তাই করল রঘু, বা স্বভাবসিদ্ধ প্রায়ই করে, প্রসঙ্গের উত্তর মেরুকে মুড়ে দক্ষিণ মেরু করে দিল। বলল,

—বড়কাভাইয়া।

—কিয়া?

—তুলসী দিদির আসল নাম কী?

বুলন বলল,

—জানি না। বলেনি কোনোদিন। জিজ্ঞেস-ও করিনি। এতোটা জানি ওর ধর্ম ইসলাম।

রঘুর ধর্ম-অধর্মে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। বলল,

—ওর একটা নাম দিই আমি

—নাম?

—হ্যাঁ। এটাই হবে ওর প্রকৃত নাম।

—কী নাম?

—বৃষ্টি।

—বৃষ্টি?

—হ্যাঁ। কেন জান?

—না।

একটু থেমে রঘু বলল,

—ওর বুকে মায়ার মেঘ তো। ঝরঝর ঝরে মাঝেমাঝে। যেদিন কপালে মলম লেপে দিয়েছিল, সেদিনই স্পষ্ট টের পেয়েছি। আচ্ছা, তুলসী নামটা কে দিল কে জানে। তুমি জানো?

বুলন বলল,

—আমাদের লাইনে নামধাম বেমতলব। তোর দেয়া নাম ওকে বলব। শুনে হাসবে। বৃষ্টি মানে তো বারিশ।

প্রসঙ্গের গভীরতায় রঘু গেল আবার গেল না। মুখে শব্দ করল এমন যেন খুব মজা,

—এ-হে-হে!

বুলন বলল,

—কী হল আবার!

রঘু বলল,

—শুধু কি তুলসীদিদির? তোমার নাম দিয়েছি একটা, আমার যখন মনে আসে ফটাফট নাম দিয়ে দিই। এমন কতজনের দিয়েছি আজ অব্দি।

বুলন বলল,

—আমার আবার কী নাম দিয়েছিস?

রঘুর আর শব্দ,

—এ-হে-হে!

—কিয়া এ-হে-হে! কী নাম বল?

রঘু বলল,

—জুনাইদ।

—ই কা নাম রে! জুনাইদ!

—ফার্সি জানো মূরখ্?

বুলনের উত্তর বিহারী জবাব,

—নাহি, নাহি রঘুমৌলা! ক্যা অরথ্?

রঘু বলল,

—জ্যোৎস্না! ড্রিমফিল্মে তোমাদের নাম বদলে যাবে।

—মরেগা তু! তোকে নিয়ে আমার বড়ো চিন্তা।

বুলনের কথায় দমকা বাতাসের দাপট। ওলোটপালোট হয়ে গেল রঘুর সবকিছু। আবার ভাণ্ডারে টপটপ জল পড়ে। জমে স্তরে স্তরে তিলস্মি খাজানা। এও তো মানবিক ধন। পূর্ণ হয়ে ফাঁকা, ফাঁকা হয়ে আবার পূর্ণ হল আদ্যোপান্ত।

রঘু যেন জ্যেষ্ঠ সহোদরের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করল যা কখনও করে না কারও কাছে। উল্টে ধমকায়, বিরক্ত হয়। একই ভাব—আমি রঘু কারো ডিক্টেশন মানি না। জবাবদিহি করি না। এবার তা করল না মোটেই। বলল,

—পড়ি তো বড়কাভাইয়া।

—কোথায় পড়িস? এখন পড়ার সময়, আড্ডা, দিচ্ছিস। রংবাজি করছিস।

শাসনসহ মায়ার ঝর্ণা নামে বুলনের গলায়। রঘু কাজিয়া শুরু করে দিল। যে কলহে দুই ভ্রাতার মায়াবী উত্তাপ। বলল জোরে,

—তুমহে কুছ নেহি মালুম। চার-চার সাবজেক্ট মে হাইয়েস্ট মিলা হ্যায় মুঝে। আই ক্যান ডু হেল অ্যাণ্ড হ্যাভেন!

রঘুর ধৃষ্টতা ও অহঙ্কারে বুলনের অস্ফুট গর্ব। বলল,

—আরো পড়লে সব বিষয়ে হাইয়েস্ট পেতিস বুরবক!

রঘু বলল,

—ধুর, ইডিয়ট!

—ইডিয়ট কাহে রে ছোটকা?

রঘুর সাফ জবাব,

—লিখাইপড়াই মে কৌই মজা নেহি।

বুলন ধমকায়।

—মারুঙ্গা ঝাপড়। ক্যা হ্যায় রে তু!

আর তখনই—হিমানী, ঝা-স্যার, দিয়া, সুস্মিতা, কৃষ্ণা ম্যাডাম, সুরতিয়া, ভাঙ্গাড্ডু, ঝিলিক; দূর-বহুদূরের চাড্ডা আন্টি, যোশী ম্যাডাম, প্রীতমজি, চুন্নি, আর নেহা—এখানে তুলসীদিদি, ইনারদেও, টাকলামুনির আর বুলনকে—একই সরলরেখায় একাকার করে দেয় এক অব্যাখ্যাত অস্পষ্ট আবেগে। ভাবে—এদেরকেই আত্মীয় বলে? আত্মীয়কে আর কীভাবে ডিফাইন করা যায়?

কোনও স্পষ্ট পরিভাষা খুঁজে পায় না রঘু এ মুহূর্তে।

দূরে, আউটার সিগন্যাল কাত্। সবুজ আলো, কোন যাত্রী ট্রেনের এখন সময় নেই। এখান থেকে অন্তত দুশোমিটার দূরে ট্রেন লাইন। বারৌনি-কাটিহার সেকশন।

দীর্ঘ মালগাড়ী ছুটে আসে অনেক পথ পেরিয়ে। ভীষণ ব্যস্ত এই রেলজনপদ। জংশন-ও। ওয়েস্ট ক্যাবিনের পর আরো দূরে অনেক উচু মাস্টে মার্কারি ভ্যাপারের আলোর বন্যা।

মালগাড়ি আসে। ঘড়-ঘড় শব্দে বেরিয়ে যায় সব বগি।

তারপর একসময় ট্রেন চলে যায় জংশনের দিকের আরও চার কিলোমিটার প্রায়। শব্দ মিলিয়ে যায়। কোনো না-কোনো সময় মাইকের শব্দ শোনা যাবেই এই শহরে।

এখনো অস্পষ্ট ভেসে আছে গিগান—' গাতা রহে মেরাদিন। তুহি মেরি মঞ্জিল ...

গানের হাল্কা ধ্বনি ছাড়া চারদিক সুনসান। গোদামের উত্তরে রাস্তার বাঁদিকে টায়ারের বিরাট হোর্ডিং বিজ্ঞাপন, পাশেই অন্য হোর্ডিঙে মীনাকুমারীর কাঁধে হাতরাখা সমব্যথী ধর্মেন্দ্র। এই শহরে সিনেমার বোল বালা বেশি। এখানে হেলেনের খুব দবদবা।

নিরিবিলি সব। কয়েকটা জোনাকি। অন্ধকার।

বুলন বলল,

—চল, ওঠা যাক। আমি মঙ্গলবাজার যাব। তুই হোস্টেলে যা।

—চলো।

ওরা হাঁটে মাঠ পেরিয়ে, ফাঁকা আলপথে।

বুলন ডাকে

—রঘু।

—কিয়া?

—একটা মজা কী জানিস?

—কী?

বুলন ভাসা-ভাসা স্বরে বলল,

—আমিও তেজ ছিলাম লেখাপড়ায়।

রঘু তাকায় ওর দিকে। বুলন একমনে বলে যায়,

—মাস্টারজি পাহাড়া (নামতা) পড়াতে পড়াতে হয়তো ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তখন আমাকে বলতেন— 'এ বুলনিয়া, পাহাড়া পড়ানা বেটা।' আমি পড়াতাম, দো-ইক্কম দো/দো দুনে চার (দুই একে দুই/দুই দুগুনে চার)।

গলা ভার হয় বুলনের। পাখির ডানার মতো পাখনা মেলে কোথায় যায় বুলনের অস্পষ্ট স্বর। পিছন মানেই তো স্মৃতি। যা সংক্রামিত করে রঘুকে।

রঘু বলে,

—বড়কাভাইয়া।

—হুঁ।

এবার উত্তর-বিহারী বলে রঘু,

—তোহর গাঁও কাহে ছোড় দেলে? উধর কৌন বা?

বুলন নিশ্ছিদ্র বিষণ্ণতায় বলে,

—কী জানি। কে আছে, কে নেই, জানি না।

রঘু বলল,

—কবে গাঁও ছেড়ে চলে এসেছিলেন বড়কাভাইয়া?

আর কিছুই বলে না বুলন। কোনো শব্দ করে না।

আবাল্যের পাহাড়ার স্মৃতির ভার বুকে ধরে জীবনের উবড়-খাবড় পথ ভাঙো আঁধার-দুনিয়ার আলোকিত বুলন প্রসাদ—যে আলোর বিচ্ছুরণ সেই কৈশোরের, যখন ওর নাম ছিল—বুলনিয়া।

সময় কাটে। একসময় প্রায় ফোঁপায় বুলনিয়া। বলে অসহায় যাতনায়,

বহুৎ লাচারি হ্যায় রে রঘুভাইয়া! বহুৎ লাচারি। ভগবান তুঝে হর লাচারি সে দূরি

রখে। তু ঔর কভি মত আনা হামারে পাস। কিতনে বার বলুঁ তুঝে? ভাগ জলদি।

রঘু সংক্রামিত স্মৃতি ও বিষণ্ণতায়। সে স্মৃতি-বিশারদ। ঠিক কতটুকু হারানোর পর সব কিছু স্মৃতি হয়ে যায়—এ বোধ রঘুর মতো আর কে জানে। তাই উদ্বেল হয় বুলনের তিরস্কারে। এক চিরসত্য উচ্চারিত হয় রক্তমাংসধারী রঘুর বিহ্বল জিহ্বায়,

কেউ কোনোদিন নিজের সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে ভাগতে পারে না। সরে যেতে পারে শুধু। সরে না। আসলে, এই যে আমাদের জীবন, কোথায় কোথায় নিয়ে যায় নিজের খেয়ালে। আমরা লাচার সব—মেনে নিই। এছাড়া উপায় কী। চিন্তা কোরো না। একদিন আমাকেও সরিয়ে দেবে আবার জীবন। ডোন্ট ওয়ারি। আর আসব না।

কথা রাখেনা এবার রঘু। অভিমানে বলা কথা কেউ কি রাখে? কথাটা রাখা চলবে না বলেই তো অভিমান করে সবাই। এর উপর আছে রঘুর এক রোখা জেদ। মাথায় কিছু চাপলেই হল। শেষ না দেখা অব্দি শান্তি নেই।

সুতরাং, রঘু আবার এলো ওর বিধিমতো।

বুলন বলল,

—কেন যাবি?

রঘুর সাফ-সাফ জবাব,

—নেপাল দেখব।

—নেপাল? কী আছে ওখানে দেখার? এক পাহাড় আর পাহাড়ি নদী ছড়া?

রঘুর স্বরে হাল্কা বিষণ্ণতা। বলল,

—পাহাড়ে কতকিছু আছে। অ্যানি ওয়ে। বিরাটনগর দেখব।

—আগে যাসনি কখনও? তোর কোন জায়গা দেখার বাকি আছে?

রঘু বলল,

—গিয়েছি দুবার।

—আবার কেন যাবি?

—এত প্রশ্ন কেন? ফির যানা হ্যায়, ঔর কিয়া?

সব দেখনা হ্যায়। জাননা হ্যায়।

—কিয়া সব?

—কন্ট্রাব্যান্ড পেড্‌লিং।

—কিয়া!

—সামান কৈসে লাতে হো তুমলোগ। দেখনা হ্যায়।

বুলন বিরক্ত। বলল,

—মেরা শির দেখনা হ্যায়। রংবাজ!

রঘু হাসে। বলল,

—কিয়া ইয়ার তুমভি!

সিগারেট ধরায় বুলন। ওরা হাঁটছে লখাই শরিফের দিকে। বুলন বলল,

—বুঝতে পারছিস, কী বলছিস তুই?

রঘু বলল,

—গাধা নেহি হুঁ মৈ। সমঝতা হুঁ সব। স্মাগলিঙের মাল আনবে, এরমধ্যে দলের বাইরের কাউকে রাখা চলে না।

বুলন বলল,

—জানিস যখন চিপ্‌কে আছিস কেন? সবাই বাধা দেবে।

রঘু হাতিয়ার পাল্টায়। তাতানোর স্বভাব জোরদার। বলল,

—কিয়া দাদা হো তুম? ওদের মানাতে পার না? শালা, আমি হলে বলতাম, আমার ছোটোভাই সঙ্গে যাবে। কার কোন ডাউট ওর কোশ্চেন? কাট্ ডালুঙ্গা!

বুলন বলল,

—বহুৎ ফড়ফড়াচ্ছিস তুই? মরবি, মরবি একদিন।

রঘুর ট্র্যান্সফর্মার থেকে ভোল্টেজ দৌড়ায় বুলনের সোজা মগজে। বলল,

—এ বড়কাভাইয়া, টোলি ছেড়ে লাড়খানিয়া বাজারে লস্‌সির দোকান খোলো। তুমহে জচেগা। কোই কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল নেহি আপনা গেরোঁ মে।

বুলন বোঝে রঘুর রংবাজি। হাসে।

তারপর বলল,

—তব চল। ওখানে যেয়ে উচ্চবাচ্য করবি তো টেটুয়া টিপে নদীতে ফেলে দেব, চিপকু কাঁহিকা!

রঘুর কাজ শেষ। জোরে বলল,

—এ হে-হে!

—কী-হে-হে! ঘুঁসা খায়েগা বুরবক!

বুলন বলল,

—সাবধান থাকবি রঘু। কেন যে ঝামেলায় যেতে চাস?

রঘু বিকারহীন অনড়। বলল,

—আই ডোন্ট্ বদার। কুছ পারোয়া নেহি। সব জানি।

বুলন বলল,

—ফির?

—কিয়া ফির? বলেছি কতবার। সব দেখতে চাই, শিখতে চাই, বুঝতে চাই। এভরিথিং।

বুলন হতাশ। ধমকায়,

—শিখবি? শিখে ক হবে? ধান্দায় আসবি? তোর টাংরি কেটে ফেলব আমি। কী

বুঝলি একটু আগে? কুত্তার লেজের মতো তোর জিদ। টেরা তো টেরা!

রঘুর প্রশ্ন,

দেখলে কী দোষ?

—বহুৎ ফেরা (ঝামেলা) এই কাজে।

—ফেরা তো হোগা হি। স্মাগলিং কি শিবমন্দিরের আরতি নাকি?

বুলন বলল,

—তবু আসবি?

—ইয়াহ্।

দ্যাখ রঘু, ভাগৌড়ার জিন্দগি আমাদের। পুলিশ কি গিদ্ নজর। যে-কোনো সময় পিঘলতা কার্তুজ। কিম্বা অন্যদলের আটইঞ্চি রামপুরিয়া, টুইস্টরড্। সমঝা কুছ?

রঘুকে দমাতে পারে না বুলন। রঘু বলল অবলীলায়,

—ভারি থ্রিলিং। তমঞ্চা চালানা শিখাওগে মুঝে?

—তুই পিস্তল চালাবি?

—হাঁ বুলন উস্তাদ। আই ওয়ান্ট টু বি এন হাইক্লাস স্নাইপার মার্কসম্যান।

বুলন সব বুঝতে পারেনি। বলল,

—কিয়া?

—বন্দুকবাজ। বহুৎ বড়িয়া বন্দুকবাজ হতে চাই। শব্দ শুনে না দেখে টার্গেট উড়াতে চাই।

বুলন বেজার। বলল,

—তোকে বোঝাবার খোপড়ি আমার নেই। মাথা গেছে আমার। ইয়ে লৌন্ডা ক্যা হ্যায়রে। জোখিম-উখিম সমঝতা নেহি। মুঝে মারেগা, খুদ ভি মরেগা।

রঘু বলল,

—শেখাবে পিস্তল চালানো?

বুলন বড়ো সহোদয়। বলল একই অধিকারে,

—ঝাপড় খানা শিখাউঙ্গা তুঝে। মাথা ঠিক নেহি তেরা। ইলাজ চাহিয়ে তেরে কো।

—করলেনা। অভ্ শিখনা হ্যায়।

—কী হবে শিখে? রুপল্লি কামাতে চাস?

—না বড়কাভাইয়া, পয়সা না।

—ফির?

—থ্রিল!

—এটা কী?

—মজা। খুদ কো চিড়ফাড়কর মজা।

বুলন বলল,

—নিজেকে কাটাছেঁড়া করে মজা? এরকম কেন চাস ছোটকা ভাইয়া?

রঘু দামাল স্রোত এখন। বলল,

—নিজেকে ভাঙে, আবার জুড়ে দাও। মজা খুব মজা!

বুলন শান্ত স্বরে বলল আস্তে,

—বহুৎ কিমতি শখ্। তোর কপালে যে কী আছে?

পরিণামজ্ঞান ছোটোবেলা থেকেই কম রঘুর। সংবেদনশীলতা যতোই হোক। সুতরাং কপালে কী আছে এ বিষয়ে নির্বিকার। বলল,

—কী বড়কা ভাইয়া? কিছু বলবে?

বুলন বলল,

—চোরা বালিতে ফেঁসে গেছি রঘু। তুলসীও।

রঘু বলল,

—একটা উপায় তো বলেছি আগে তোমাকে।

—কিসের উপায়?

—মুক্তির।

—মানে? কীভাবে মুক্তির?

পরিণামজ্ঞানহীন রঘুর অশ্বশক্তি তুঙ্গে। বলল,

—খাল্লাস। গিরা দো।

—মতলব?

—চলো দুজনে মিলে তোমার দুই সো-কল্ড আকাকে, কথা শেষ হতে দিল না বুলন।

বলল,

—কোন দুজনে মিলে?

রঘুর সহজ জবাব,

—কেন, তুমি আর আমি?

বুলন অবাক। বলে কী ছেলেটা? এতো খতরনাক চিজ। ছোঁড়া মরেগা একদিন। বলল,

—তোকে রাঁচি পাঠাব। মাথা সমুচা খারাপ হয়ে গেছে তোর।

—আরে য়কিন করো মুঝে

—কী করবি তুই?

—বললাম তো, উড়াও। ওসব দলবল নিয়ে হবে না। তোমাদের দুই আকা কাউকে না কাউকে খতম করে সিড়ি চড়েছে।

বুলন এবার ঘাসজমিতে বসে পড়ে। মাথায় হাত দেয় নিজের। রঘু আরো কী-কী বলতে পারে যাচাই করার জন্যে বলল,

—জানিস ঐ দুজনের বডিগার্ড কতোজন? কী করে তুই,

কথা শেষ করতে দেয় না এবার রঘু। ঝানু খিলাড়ির মতো প্লট বানায়।

আরে ইয়ার। ছোড়ো উসব বডিগার্ড। হাত মে থ্রি-নট-থ্রি! বেকার হ্যায়সব।

—কিয়া মতলব?

—পুরা উড়া দুঙ্গা সায়েন্টিফিক্যালি।

বুলন হতভম্ব। বলল

—কিয়া?

রঘু নিজের মাথা দেখিয়ে বলল,

— তারিকা হ্যায়। সব সায়ান্টিফিক।

উঠে দাঁড়ায় বুলন। থাপ্পড় তুলে তাড়া করে। রঘু দৌড়ায় সামনে, বুলন পেছনে।

রঘু বলে,

—আরে কিয়া হুয়া?

—মেরা শির হুয়া। এই লেখাপড়া শিখছিস? সব শিক্ষা খুনখারাবায় খরচ করবি। আবার যদি উদ্ভট কথা শুনি তোর মুখে, কেটে কোশিতে ফেলে দেব।

অল্প দূরে দাঁড়ায় রঘু। বুলন তাড়া করেনা। ধমকায়,

—ভাগ। হোস্টেল যা। এমন মার দেবো না। তুলসী বলে ভালোমুখে বোঝাতে। কাকে বোঝাবো ভালোমুখে?

রঘু পাত্তা দেয়না। বলল,

—তুম বিলকুল ইডিয়ট হো।

—চোপ।

—ইউ শাটআপ।

—এ ছোঁরা, অংরেজি মত ঝাড়।

রঘু তবু ঝাড়ে,

—ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই ইনটেন্ড টু সে।

—কিয়া বড়বড়াতা হ্যায়?

রঘু বলল,

—তোমার জন্যে বলিনি। তুলসীদিদির জন্যে বলছি। ওকে উদ্ধার করা তোমার কাজ নয়? বুলন দমে যায়। কথা বলে না।

একসময় বলল,

—তু হোস্টেল যারে ভাই।

রঘুর নাছোড় জেদ। বলল,

—তুলসী দিদির ওখানে বড়ো কষ্ট, আমি বুঝি।

—কী করব আমি বল, কী করব আমি? ইচ্ছাসত্ত্বেও কিচ্ছু করার নেই। তুই বুঝবিনা, সব বোঝানো যাবে না।

—বোঝালে বুঝব না কেন বড়কাভাইয়া? তুমিই তো বলো বহুৎ তেজ দিমাক আমার।

বুলন প্রকৃতই সহোদর এখন।

জোর ধমকায়,

—য়্যৈসা মার মারুঙ্গা তেরেকো কি,

আর বলে না বুলন। গলায় থমকে যায় শব্দ ও শব্দমিশ্রিত অনেককিছু—যেখানে দুই সবুজ দ্বীপের মতো তুলসী আর রঘু। তুলসীর অসহায়ত্ব-জনিত রঘুর বেপারোয়া একরোখা জেদ, তুলসীর অস্পষ্ট প্রত্যাশা—সবই অশান্ত করে বুলনকে। কুল-কিনারা খুঁজে পায়না। মনে পড়ে, শুধু মনে পড়ে অভ্রর দানা-মেশানো ধূলোময় নিরিবিলির গ্রামে সেই বালক, ভেতরে-ভেতরে পাহাড়ার পাঠে আজো রত—'দো ইক্কম দো, দো দুনে চার।'

জীবন কত অসহায়! মায়ের ভ্রূণ থেকে চিতার আগুন অবধি—এই যে সময়ের পরিসর, কেন যে এতো লাচারি এখানে? বুলনের হতাশ লাগে। এত তলিয়ে দেখার সময় দেয়না কেউ এখানে। শুধু পাগলা হাওয়ার মতো ছেলেটা আসে, আর সমূলে নেড়ে দেয় সব। অথচ এই রঘু লু-হাওয়া নয়।

আশ্চর্য লাগে। তুলসীর জন্যেও এত মায়া ওর?

এত টান ভালো নয় রে রঘু। কষ্ট পাবি।

মুখে বলল,

—যদি কোনও গোলমাল করিস কোনোদিন, তোর সবচে বড়ো দুশমন হব আমি! এখন ভাগ।

বুলনের প্রতিটি শব্দ ও শব্দ উত্থিত ধ্বনিতে শব্দের নতুন এক প্রতিশব্দ খুঁজে পায় রঘুর তীব্র সংবেদনশীল চেতনা—যে শব্দের কোশে কোশে সঞ্চিত যুক্তিপূর্ণ অনুশাসন ও দাবীহীন অপত্যস্নেহ।

এই বহুমূল্য, বা অমূল্য, অথবা মূল্যহীন বিমূর্ত বস্তু দিতে পারে একজন—সহোদর, কেবল সহোদর। অন্য কেউ নয়।

ভেতরের শান্ত সংযমী প্রাজ্ঞ রঘু বলে বাইরের উদ্দাম অস্থির রঘুকে,

—মেনে নে, মেনে নে ওর কথা। এইজন-ও তোর আপনজন, প্রিয়জন! মান্য কর একে। ও বাইরে যাইহোক। ভেতরে অন্যকেউ এই বুলনিয়া। চিনে নে!

রক্তমাংসধারী রঘুর মন ভিজে যায় অক্লেশে। আশেপাশে কোথাও কোনো সাগরের চিহ্নবর্ণ নেই। তবু বাতাস বয় নোনা। আর এই জলের আছাড়ি-পিছাড়ি চলে অন্ধকারে

হেঁটে-যাওয়া অসম বয়েসি দুই সত্তার চারটি চোখে।

কত নীরব কান্না কতজন অলক্ষ্যে নিজের মতো করে কাঁদে, আর একবিন্দু আলোর প্রত্যাশায় সারাটা জীবন পথ খুঁজে মরে? কেউ পায়, কেউ পায় না। আসলে পথ চিনে নিতে হয়।

দুজনে আনমনে রেললাইন টপকায়। অল্প দূরে শানটিং ইঞ্জিনের তীব্র হেডলাইড ওদের পথ দেখায়। এখানে সিগন্যাল-তারের জঞ্জাল বেশি। দূরে উঁচু মাস্টে একগুচ্ছ মার্কারি ভ্যাপারের শুভ্র আলো আরো দরকারি ও অমোঘ হয়ে যায়।

আলো ছাড়া কি আঁধারে পথ চলা যায়? বাইরের, ভেতরের দুই আলোই পথ দেখায়। তেমনি দেখে দেখে রঘু-বুলন এগোয়।

আরো কিছুটা এগিয়ে বুলন বলল,

—তুই যা রঘু। আমি বড়াবাজার যাব।

বলেই ইয়ার্ডের শেষ মাথায়

ছোট সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে মঙ্গাল বাজারের দিকে এগোয়। রঘু হাঁটে উল্টোপথে সোজা রাস্তায় ওভারব্রিজের দিকে।

শান্‌টিং ইঞ্জিন বিলম্বিত লয়ে রেল-পট্‌রি মাড়িয়ে যায়।

রেডিয়াম ডায়েলে সময় দেখে রঘু—সাতটা পঞ্চাশ। রাত বাড়ে আরও।

অনেক জেদাজেদি করে রঘু গেলো ওদের সাথে বিরাটনগর। কীভাবে সব সামাল দিল বুলন—সেই জানে। সঙ্গের দুজন—নানকু আর ইরফান ভালোভাবে নিচ্ছে না রঘুকে। ওদের যে পছন্দ নয় তা বুঝতে পেরেছে রঘু। কিন্তু পাত্তা দেয়না দুজনকে। ওর রকমসকম এমন—বিরাটনগরে কি তোদের বাপের জমিদারি। এছাড়া রয়েছে দলের স্কিপার বুলন। সো, হু কেয়ারস—রঘুর এই ভাব।

জিপ চালাচ্ছে ইরফান। যোগবানি পৌঁছে গেল দুপুর দুটো নাগাদ। চেকপোস্টে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ তল্লাস-উল্লাস কিছু নেই। ইন্ডিয়ার ভেহিকল তেমন চেক্ হয় না। অন্য বিদেশী গাড়িগুলোর জব্বর তল্লাশী, ছানবিন হয়।

সিডানবডি একটা ট্যুরিস্টক্যাব্ দাঁড়িয়ে আছে চেকপোস্টের আগে ইন্ডিয়ান টেরিটরিতে।

রঘু দেখছে—কোন 'ফেরা' হয়েছে বোধ হয়। গাড়ির মালিক বোঝাচ্ছে একনাগাড়ে কাস্টমদের দুতিনটে লোককে।

আসলে পরিষ্কার কথা বুঝতে পারছে না ওরা—সমস্যা উচ্চারণ। যদিও ইংলিশ বলছে লোকটা। কেউ অভ্যস্ত না হলে বুঝতে পারবে না। রঘু শুনছে-কী বলছ, আমি কলকাতা থেকে আসছি। ব্রিটিশ হাইকমিশনে দেখা করেছি। ওরা সব ঠিকঠাক করে দিয়েছে? এখন পেপারসের ফর্ম্যালিটি মনঃপূত হয়নি, তো আমি কী করব। নেপালে আমাকে এন্ট্রি নিতেই হবে; ইত্যাদি।

রঘু বুঝলো—স্কটিশ উচ্চারণ এমন, কোনও শব্দ নরম করে উচ্চারণ করে না। এছাড়া পুরো আলাদা বাচনভঙ্গি ও কথার টান।

জীপ দাঁড়িয়েছিল কিছুসময়। আবার এগোয় সামনে।

চেকপোস্ট পেরিয়ে কিছুটা এগোলে রাস্তা একদম বরবাদ। উবড় খাবড় তো আছেই, ধুলো ভীষণ। গাড়ি চলছে সামনে, আর পেছনে লরেন্স অব অ্যারাবিয়া। মাইকা মেশানো সাদা ধুলো চিক্‌চিক্। মাটিতে এতো বেশি অভ্রের পরিমাণ পৃথিবীর আর কোথাও নেই— এ তথ্য-ও রঘুর জানা। অভ্র বেঁচে নেপাল ধনী হতে পারত।

চুল বাঁচাতে প্রত্যেকের মাথায় ব্যারেট ক্যাপ। কপালের উপর টুপিতে চৌড়া বারান্দা।

রঘু বলে 'বারান্দা'। চোখে সান্‌গ্লাস্। পরেছে ওর প্রিয় ম্যাচিং পোশাক—ডিপনেভি ব্লু স্কিনটাইট ইংলিশ কার্ডের পেন্ট, স্নো-হোয়াইট টিশার্ট—কোমরে গোঁজা। পায়ে ব্রাউন বিট্‌ল্‌স্।

সামনের সিটে বসে বাইরের খোলা জ্যারিকেন রেস্টে পা রেখেছে এমন—যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। মন ফুরফুরে। স্মৃতি-ফিতির বিষণ্নতা উধাও। এখন শুধু থ্রিল—মজা, বহুৎ মজা!

জিহ্বা ও ঠোঁটে শিস আর মাঝেমাঝে ওর সরচে প্রিয় হল্যান্ড্‌টিউন। যে টিউন চুরি করে প্রায় সব হিন্দি ফিল্ম গান বানাচ্ছে। রঘু ভাবে—ভাগ্য ভালো এদের—হল্যান্ডে হিন্দি ফিল্মি গান বাজেনা। না-হলে ধুম মার দিত।

কখনো চটপটি ফিল্মি গান গায় রঘু। এখন যেমন—'না জানে মেরা দিল কিসে ঢুণ্ড্ রহা হ্যায়/ইন্ হরিভরি বাদিয়োঁ মেঁ/....'

কনট্রাব্যান্ড নিয়ে ছুটে যাওয়া জিপে বসা পরিণামজ্ঞানহীন রঘুর রোমাঞ্চিত গান।

বাঁহাতের দু-আঙুল উপরে তুলে জিপের বাইরে কোনোকিছু লক্ষ করে বানাউটি তমঞ্চা চালায় রঘু—ডি-সি-উ-উ!

বুলন বিরক্ত। তবু হাসে অল্প।

বলল,

—বহুৎ শৌখ্ তেরা?

—কিয়া?

—তমঞ্চা চালানা।

রঘু বলল,

—দাও না ইয়ার। চালাই, বস্, দো রাউন্ড।

বুলনের প্রতিবাদ,

—নেহি।

—অ্যাজ ইউ উইশ স্যার। বাট, লেট মি শুট সিঙ্গল্ রাউন্ড ওন্‌লি। নট্ মোর দেন

দ্যাট।

—কিয়া বকতা হ্যায় রে?

রঘু থেঁতলামো করে,

—নিকালো পিস্তল।

বুলন পাত্তা দেয় না বিন্দুমাত্র। একমনে সিগারেট টানে। সব লক্ষ করে পেছন থেকে নানকু

বলল,

—তমঞ্চার কটা টেপি (কার্তুজ) থাকে রঘু?

রঘু এখন অ্যামুনিশন ও ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট। বলল,

—সেটা নির্ভর করবে পিস্তল কী মেড, কী স্পেশিফিকেশন, বোরের মাপ কতো, এর উপর। জেনার‍্যালি, টেন-শট্‌স্ হয়, অর্থাৎ দশটা কার্তুজ থাকে সাধারণ পিস্টলে। বুঝেছ? তোমার পকেটের ওটা কী মেইড, বোরের সাইজ কি নানকু ভাই?

নান্‌কু, জবাব দিলনা। টের পেল বুলনজির এই অদ্ভুত 'রংরুট' সতেরো ঘাটের জল খেয়েছে অনেক কিছু জানে। কিন্তু কীভাবে, সেটাই প্রশ্ন।

বলল,

—ইত্‌না সব কৈসন্ মালুম আপকো? কভি চালায়ে হো পিস্তলুয়া?

ওর দিকে না তাকিয়ে রঘু নিতান্ত অবজ্ঞার স্বরে উত্তরবিহারী বলল,

—তুমি কভি চালায়ে হো ক্যা থ্রী-নট্-থ্রী?

—ক্যা?

—থ্রি-নট-থ্রি? নাইনটিন থার্টিসিক্স মডেল।

এবার বুলন বলল,

—নাহি?

রঘুর গর্বিত জবাব,

—এ নানকুভাই, আই শট্ টেন রাউন্ডস্। মাইগড্; সো সিভিয়ার ব্যাকথ্রাস্ট! জোরে চেপে না ধরলে যখন বুলেট রিলিজড্ হবে, রাইফেলের বাঁট হাতের জয়েন্ট খুলে দেবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট।

বুলন নামকু ভ্যাবাচ্যাকা। বলল,

—কাঁহা চালায়ে হো? ঔর কিঁউ?

নানকু বলল

—কিঁউ বাজু তোড়ে গা ই বন্দুক?

রঘু বলল,

—নিউটন কা থার্ড ল মালুম তুমেহ?

—কিয়া? নুটুনুয়া কৌন বা কৌনসা টৌলি ক্যা হ্যায়ইয়ে সসুরা?

বুলন বুঝল—রঘু নানকুকে মাছের মতো খেলাবে অনেকক্ষণ। কথা শুনে একটু জোরে হাসে রঘু। বাঁহাতের আঙুলতুলে কল্পিত ফায়ার করে,

—ডিঁসিউ, ডিঁসিউ। নানকু, ইরফান, বিব্রত। বুলনের হাল্কা গর্ব। বলল,

—কোথায় ফায়ার করলি থ্রি-নট থ্রি।

রঘু বলল,

—আপার আসামে।

রঘু বলল,

—এ বড়কা ভাইয়া।

—ক্যারে?

—সব শিখব। দেখে দেখে শিখে নিতে হয়।

বুলন বলল?

—কী শিখবি দেখে-দেখে? মাল ওখানে দেব। আনব অন্যসামান। এতে দেখার-শেখার কী আছে রে আহাম্মক?

আহাম্মক শব্দে তিরস্কার। বুলনের ভৎর্সনা মানে যে এক অস্থির ঘোড়াকে বলিষ্ঠ ট্রেনারের স্নেহশীল অনুশাসন—এ বোধ রঘুর প্রখর।

গুনগুন শব্দে গান গাইতে গাইতে বলল,

—এ বুলন ভাইয়া।

—বোল্।

—মুঝে দেখনা হ্যায়।

—কিয়া।

—জিন্দগি।

—কী?

—জীবনের আনাচ-কানাচ। সবকিছু। না দেখলে বুঝব কী? ফিল্ম বানানো কী? রবার্ট রেডফোর্ড, গ্রেগরি প্যাক, ওমর শেরিফ, জিনা লোলোব্রিজিদা কতজনকে কত রোল দিতে হতো আমার ফিল্মে!

—কী বলছিস? নেশা করেছিস?

রঘু নিজের মনেই বলে,

—স্বপ্নের ছবি বানাতে হলে কিছুটা নেশাতো করতেই হবে। বিলকুল অন্য নেশা।

—কিয়া?

—জিন্দেগি মে দুসরা জিন্দেগি! দুস্রা দুনিয়া!

বুলন উত্যক্ত। বলল

—ধুর সরফিরা। তেরা জুবান ইতনা ধুন্দ্‌লি। এতো অস্পষ্ট কথা বলিস তুই প্রায়ই। বুঝে কার সাধ্য। আমি মুরখ আদমি।

রঘু হাসে, আর মুখে শব্দ করে,

—ডি-সি-উ-উ!

কল্পিত পিস্তল রঘুর বাঁহাতে। ছুটন্ত জিপের বাইরে নেপালের অরণ্য, রাস্তার ধুলো। সূর্য সরে যায় পশ্চিমের উঁচু পাহাড়ের মাথায়।

ঘড়িতে সময় দেখে রঘু। নেপালের সময় ভারতের সময় এক নয়। নেপাল ভারতের চেয়ে পনেরো মিনিট আগে।

ভারত কি কনিষ্ঠ—ভাবতেই হাসে রঘু। ভূগোলের এ ব্যাপারটা বড়ো মজার। মনগড়া। পৃথিবীর ও আগলে-মাথালে তিনশো আটান্নটা দাগ যে দেয়া হল, এতে গণ্ডগোল-ও আছে। কাঠমাণ্ডুর স্থানীয় সময় আর এলাহাবাদের স্থানীয় সময়ে প্রকৃত পার্থক্য কতটুকু। মারো গোলি। মুঝে কিয়া? যে যার সময় মেপে চলুক। আমি চলবো আমার সময়ে। মাই টাইম ইজ প্রাইম টাইম।

হঠাৎ চেঁচায় রঘু,

—কামঅন এভ্‌রিবডি, সিঙ উইথ মি! কাম অন।

তিনজনে দেখে রঘুকে অবাক চোখে।

বুলন বলল,

—কী বলছিস?

—গান গাও।

—গান? আমাদের হালুয়া টাইট। এখন গানের সময়!

—আরে ইয়ার গাও।

—কী।

রঘু বলল

—জ্যাজ! ট্র্যাড জ্যাজ্‌!

বুলন বিধ্বস্ত। বলল,

—উ ক্যা হ্যায় রে?

রঘু বোঝায়,

—গানা। দুনিয়া কাঁপাচ্ছে। জ্যাজ!

বুলন আজো ভালো করে বুঝিয়ে দিল অবুঝকে।

—তোহর মাথা বিগড় গইলে! জাজুয়া বৈঁঠকে হৈঁ কছহরি মে। গানে মেঁ জাজুয়া কাঁহা বে?

রঘু হাসে। বলে,

—ছাড়ো জ্যাজ্। দুসরা গানা সুনোগে?

—কী গান?

—ক্যালিপ্‌সো।

—কিয়া বকে যারা হ্যায় রঘু? চুপচাপ বসে থাক। এখন গান গাওয়ার সময় না। মাথায় শত চিন্তা।

আবার হাসে রঘু। বলল,

—বহুৎ মজা!

—কী মজা?

—নেপাল বড়ো, ইণ্ডিয়া ছোটো।

—কিয়া মতলব?

—তুমি বুঝবে না। নেপালের সময় পনেরো মিনিট আগে।

—মালুম মুঝকো। তো?

রঘু বলল,

—জানে দো ইয়ার! এ ভাই, গাড়ি ঔর তেজ চালাও। জৈসে কার চেজিং। ফিল্লম মে নেহি দেখে হো ক্যা।

চালক কথা বলে না। আসলে রঘুকে এখনও মেনে নিতে পারছে না।

রঘু হুল্লোড় তোলে। বলল,

—এ ভাইয়া, তোমার মুখে ফিটকিরি নাকি? এতো বেজার কেন? এ নান্‌কু ভাই, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? চলো, এবার অন্য গান গাই।

বলেই জোরে গান জুড়ে দিল রঘু একা।

—'গজব মুসাফির হো গিয়া রে ......'

কেউ দোহার দেয় না। তবু রঘু গায়। ইরফান বারবার গিয়ার পাল্টায়। জিপের পেছনে ধূলোর ঝড়, ট্রেনের কালো ধোঁয়া, খামখেয়ালি রঘুর ভোজপুরী সঙ্গীত চর্চ্চার বেতালা ধ্বনি।

কাঠের সাঁকো পেরোয় জিপ। তারপর বাঁক নিয়ে ছুটে যায় ছোট জনপদের দিকে।

বড়ো হোটেলের সামনে থামে জিপ। থামতেই রঘু লাফিয়ে নামল। সবাই নেমেছে ড্রাইভার ছাড়া। এখানে গাড়ি রাখা যাবে না। হয় হোটেল কম্পাউন্ডে পার্কিং করাতে হবে, না হয় অন্যখানে সরাতে হবে।

ইরফান নিয়ে গেল হোটেল কম্পাউন্ডে। হঠাৎ, নানকু বেশ জোরে প্রায় দৌড়ে গেল উল্টোদিকে রেস্তরাঁয়। কেন এমন গেল বুঝল না রঘু।

তারপর বুলন এমন কথা বলল, যার বর্ণ সবই পরিচিত হলেও অর্থ আনকোরা আর দুর্বোধ্য।

বুলন বলল,

—তিন টোপি রইসজাদা।

এবার আগাথা ক্রিস্টি, আর্থার কনাল ডয়েল সব অচল। রঘু শব্দ ও ধ্বনি শুনল, বর্ণ বুঝলনা।

জবাবে নানকু যা বলে গেল, হয়তো জবাব নয়, অন্যকিছু। যেমন নান্‌কু বলেছে,

—লালনীলা কান্‌কা পট্‌রি।

রঘু বলল,

—পুত্তর গাই, শার্লক হোমস্! নর্থ বিহার বাপের জন্মে দেখনি বেটা। তোমার ভায়োলিন বাজানো বেরিয়ে যেত!

বুলন আস্তে বলল,

—কী বলছিস?

রঘুর নির্বিকার উত্তর,

—নাথিং। কুছ নেহি।

রঘু এতটাই বুঝল—এ লাইনে সমান্তরাল এক বিশেষ ভাষা নিজেরাই তৈরি করে নেয়।

যা বুলন, নান্‌কু, গণপৎ, ইরফান, টাকলামুনির, ইনারদেও এদের ক্ষমতার বাইরে। এরা কেউ সাইফার-বিশারদ নয়। এ এমন এক পরিবর্তনশীল জাসুসি টার্ম— যেগুলো তৈরি করেছে গভীর জলের কোনো মাছ। এই মছলিরা খুংখার (নির্মম) হয়। এরা মগজও রাখে জব্বর। যদি তেমন এক মছলির সাথে দেখা হত? বুলন ভাইয়াকে বলতে হবে।

ফিল্মে এসব, ধুন্দলী, অস্পষ্ট কথা-বার্তা-ও রাখতে হবে। আপাতত বুলনও নানকুর দুই অস্পষ্ট বাক্য মগজে রেকর্ড করে নিল। কাজে লাগবে। কী কাজে লাগবে, তা এখনই বুঝতে পারলনা রঘু। পরে দেখা যাবে।

কিছুই যাবে না। সব নিতে হবে। সব দেখাতে হবে। ফিল্ম যত বড়ো হয় হোক। এখন এমন ভেবে লাভ নেই। আর কত দেখার আছে সামনে।

ভীষণ লম্বা এক পথের নাম-ও তো জীবন। পথের পাশে কত জনপদ, কত উদ্ভিদ, কত মানুষ, মানুষের রহস্য।

মানুষের নির্মিত রহস্যের চেয়ে বড়ো দুর্বোধ্যতা আর কী আছে রে রঘু। বেটা বাড়া, আর বাড়িয়ে যা তোর কোনোদিন সম্পূর্ণ না হওয়া লক্ষ লক্ষ, অনন্ত ফুটেজের ফিল্ম, নিজেকেই বলে রঘু।

কিচ্ছু তো করার নেই ইয়ার!

জাস্ট গো-অন। যো হোগা, সো হোগা! চিরে-ফুঁড়ে, খুলে-খালে সব দেখতে হবে।

সবকিছু উজাড় করে দেখার উন্মাদ প্রবণতা রঘুকে প্রায়ই বেপরোয়া করে দেয়।

বুলন বলল,

—খিদে পেলে খেয়ে ন।

রঘু বলল,

—এখন না। আগে ঘুরে দেখব। তোমরা তোমাদের কাজ করো।

—কোথায় ঘুরবি?

—কোথায় আর? অজস্র দোকান ছাড়া আর কী আছে এখানে? তুমি যাও। আসছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

রঘু এগোয় সামনে,—যেদিকে দোকানপাট কম, গায়ে-গায়ে-লাগা কাঠের দোতলা ঘরবাড়ি বেশি।

পেছন থেকে বুলন ডাকে,

—রঘু শোন।

—কী? অভ্ কিয়া হ্যায় ইয়ার?

বুলন কিছু টাকা দেয় রঘুর হিপ্-পকেটে।

রঘু প্রায় ধমকায়,

—টাকা কেন?

বুলন বলল,

—হোটেলে কিছু খেয়ে নিস। এখানে তোর রুমালি কিম্বা তন্দুরি তড়্কা মিলবে না।

রঘু টাকা বের করেছে পকেট থেকে। বলল,

—এত টাকা! আমার পেট গুদাম নাকি?

—আরে ভাই, কিছু কিনতে হলে কিনে নিস।

রঘুর এক রোগ। জোর করে কেউ টাকা দিলে মাথা আগুন। বলল,

—নেহি চাহিয়ে রুপিয়া। সমঝে তুম?

—কেন, কী হয়েছে?

রঘুর মেজাজ চিড়চিড়া। কখনো ঠান্ডাবরফ, কখনো অঙ্গার; কোনো ঠিকঠিকানা নেই। একটু আগের ফুরফুরে ভাব অন্তর্হিত। বলল,

—টাকা কেন দিলে?

—খাবো না কিছু?

—খাবো তোমাদের সাথে।

বুলন বলল,

—যদি কিছু কিনতে মন করে তোর?

—কী কিনব এখানে?

বুলন রঘুর মেজাজ বোঝে। তাই ফুসলায়,

—এই ধর, কোরিয়ান ঘড়ি, জাপানি টেরিলিন, ক্যামেরা? রঘু ফাটে সশব্দে,

—নেহি চাহিয়ে ইয়ে সব। জিনিস কিনতে আসিনি।

বুলন তবু বোঝায়,

—বহুৎ আচ্ছা ক্যামেরা। তোর তো তসবির খিঁচনার শখ?

রঘু তখন চটে আছে। বলল,

—স্টিল ক্যামেরা চাই না আমি।

—কী ক্যামেরা লাগে তোর?

উদভ্রান্ত জেদে কুড়িবছরের রঘু এখন ইস্কুলের ছোট্ট বালক। খর-স্বরে বলল,

—স্টিল ক্যামেরায় ফিল্ম বানানো যায় না ইডিয়ট!

—কী ক্যামেরায় সিনেমা বানায় রঘু

রঘু বলল সমান জেদে,

—ম্যুভি ক্যামেরায়। দেবে কিনে?

—কত দাম রে?

—ওসব ক্যামেরা কম করেও বিশ-পঁচিশ হাজার।

বুলনের চোখে-মুখে ছায়া নামে সহসা। অসহায়ত্ব লেপ্টে দেয় ওর চেহারায় রঘুর একচেটিয়া আবদার। যেন বোঝাচ্ছে অবুঝ অনুজকে। তেমনি স্বরে বুলন বলল,

—মৈঁ বহুৎ গরিব হুঁ ছোটকা ভাইয়া। যদি কোনোদিন বহুৎ রুপল্লি কামাতে পারি, সত্যি কিনে দেব তোর ফিল্লম-ক্যামেরা। তখন যত খুশি সিনেমা বানাস।

রঘুর মেজাজের উতাড়-চড়াও পাহাড়ের আবহাওয়াকে হার মানায়। পুরো বদলে গেল এখন। বরঞ্চ ভীষণ বুঝদার। ডানহাতের সব আঙুলে নিজের এলোমেলো চুল সামাল দিয়ে গমগম অথচ ঝলমলে গলায় বলল,

—কিয়া ইয়ার তুম ভি? এখানে ম্যুভি ক্যামেরা কোথায় পাবে? ফিল্ম বানাতে ক্যামেরা কিনতে হয় না। সব ভাড়ায় পাওয়া যায়। হিরো-হিরোইন সবাই ভাড়ায় খাটে। তুম যাও। কাম করো।

আসলে রঘুর মেজাজ রঘুরই মেজাজ—এতো মেজাজি মেজাজ। বলল একদম ভিন্ন স্বরে

—এ বড়কা ভাইয়া, আরও পাঁচটা টাকা দাও।

বুলন অবাক। বলল,

—কী?

—ঔর ভি পাঁচটো রুপল্লি।

বুলনের চোঘমুখের ছায়া কেটে রোদ টল্‌টল্‌। আগের মলিন মেঘ সরে গেছে। এখন রোদসহ মায়ার কুয়াশা।

ঝা-স্যার ঠিক বলেন—রঘু পাক্কা ইমোশন্যাল ব্ল্যাকমেলার। আঘাত ও মলম সমানভাবে দিতে জানে। আজ অবধি নিজেও পেয়েছে দুটোই, যুগপৎ। পাঁচটাকা নিছক চাওয়ার জন্যে চাওয়া। বুলনের মেঘ কাটাতে চাওয়া আসলে। কেউ টাকা দিলে রঘুর মাথা গরম—এ ওর খেয়ালি স্বভাব। পার্থিব কোনোকিছু হাত পেতে নিতে রঘুর কুণ্ঠা। এতে আবিলতা বা আঘাতের অভিপ্রায় নেই। তেমনি, টাকা দিতেই বুলনের বিরুদ্ধে ঝলসে-ওঠায়, বুলনকে মানসিক প্রহার করা নয়। যদিও বুলন আহত হয়েছিল সাময়িক।

সংবেদনশীল রঘু বুঝতে পেরেই পরিচর্যায় পটু নিজের মতো করে চেয়ে নিল আরও পাঁচটা টাকা।

বুলন ও রঘুর মানসিক তরঙ্গ প্রায় একইরকম। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যে অনুরণন হয় আবার এখন। তাই বিহ্বল বুলন আরো পাঁচ টাকার সবুজ নোট ঠুঁসে দেয় রঘুর হিপপকেটে। রঘু যা প্রায়ই করে, তেমনি মহামজার শব্দ করে,

—এ-হে, হে-হে!

নির্মল আকাশ, তাই বুলনের গলায় রঘুর ধ্বনির সংক্রমণ। বুলন বলল,

—এ-হে, হে; হে। যা ভাগ।

রঘু বলে,

—এ বড়কাভাইয়া, ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ। ঔর কভি য়ৈসা নেহি করুঙ্গা কসম সে। কিয়া করেঁ, মাথা গরম হো যাতা হ্যায় শালা!

বুলনের ধমক,

—এ! মুহ্ খারাব্ মত্ করিয়ো।

রঘু হেসে বলল,

—ওকে, ওকে! আপনা কাম করো বুলনজি।

—তোকে বলতে হবে না রে উস্তাদ। এখানে আমাদের সব কাজ মেপে সময় ধরে হয়। খামোকা দাঁড়াইনি এখানে। অভ যা।

একটা সবুজ জিপ ধুলো উড়িয়ে চলে গেলো ওদের পাশ কেটে। যে চালক নয় সে দুটো ছোট্ট পাথর ছুঁড়ে দিল বুলনের দিকে। লুফে নিল বুলন। নিয়ে দে ছুট্ রেস্তরাঁর দিকে। যেতে-যেতে বলে গেল,

—রাস্তায় কেউ কিছু বললে বা ডাকলে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটবি। যাবি না ওদের কথা শুনতে। তাকাবিও না। আর শোন্, মাথা ঠান্ডা রাখবি। এ তোর কাটিহারের জাগিরদারি না।

বুলন চলে গেল। রঘু রাস্তায় হাঁটে আর ভাবে—ওগো আগাথা ক্রিস্টিদিদি, দেখলে মাল তুলবার টোকেন দিয়ে গেল জিপওয়ালা। কিন্তু, একটি ব্যাপার বোঝা গেল না—নানকু ঐ রেস্তরাঁয় আগে গেল কেন? ড্রাইভার ইরফান কোথায় গায়েব?

আচ্ছা, দুটো পাথর ছুঁড়ল কেন?

একটা, তিনটে চারটে নয় কেন?

ভেরি হ্যাজি, এভরিথিং!

অ্যানিওয়ে যা দেখলাম—এনাফ!

এমনি মনোভাব নিয়ে রঘু রাস্তায় হাঁটে। মানুষজন গাড়ি ঘোড়া বেশ চলছে। বিদেশী গাড়ি আছে বেশ এখানে।

আরেক চিন্তা এল মাথায়— বুলনভাইয়া কেন বলল—কেউ ডাকলে বা তাকলে না যেতে? কে ডাকবে আমাকে এখানে?

এখন মেজাজ খুব হাল্কা, পাহাড়ি মৃদু বাতাসের মতো। জিহ্বায় শব্দ তুলে একমনে আস্তে বাজায়—'কাম সেপ্টেম্বর'। বড়ো প্রিয় টিউন। একই ভাব—ওকে, লেট মি সি এভরিথিং নিজের মনেই একা-একা কথা বলল,

—ভেরি থ্রিলিং। ভেরি থ্রিলিং ইনডিড্! আই লাইক ইট। ইয়েস, আই লাইক ইট সো মাচ। স্টোন পেল্টিং! নো নো, স্টোন থ্রোয়িং। বাট হোয়াই? কেন, পাথর ছুঁড়ল কেন? সিলি মিড্-অনে দাঁড়িয়ে ক্যাচ লুফে নেবার মতো বুলনভাই পাথর দুটো নিলো কেন?

রঘুর স্বভাবের আরো একটা দিক—ডুবুরি। সবকিছুর অতলে ডুবে যাওয়া। যাচাই করা। পারলে পাতাল থেকে তুলে আনা। না পারলে আরো বিশ্লেষণ ও অস্থিরতা। এখনও তাই। তবু বলল,

—আই লাইক মিস্ট্রি অ্যান্ড এনিগ্‌মা।

একটু পরই দফারফা হলো রঘুর 'আই লাইক ইট'-এর আত্মতুষ্টি।

বিরক্তি ও গা ঘিনঘিন গ্রাস করল রঘুকে। পরিষ্কার হলো—কেন বুলন বলেছিল, কোনোদিকে না তাকাতে, সাড়া দিতে। ব্যাপারটা এরকম :—

একে শহর না বলে বড়োসড়ো গঞ্জ বলা ভালো। কাঠের ঘরদোর বেশি এখানে। যেখানে-সেখানে ভারতীয় সিনেমার ছোটো বড়ো হোর্ডিং। এমনই এক বড়ো হোর্ডিং-এর বিস্তৃত পটে বড়ো বাজে দৃশ্য—সুনীল দত্ত আর নূতন কলঙ্কিত। ওদের উপর অজস্র কাক পুরীষ ছাড়ে।

একটা কালো বেবি অস্টিন ছুটে গেল রাস্তার উল্টোদিকে। হাসি পেল রঘুর—ড্রাইভারের বোধহয় খুব চেপেছে। এমন জোরে ছুটছে। সময়মতো না পৌঁছলে কাপড়-চোপড়, গাড়ির গদ্দি যাচ্ছেতাই হবে নাকি?

আরো এক সিনেমা হোর্ডিং এখানে। মীনাকুমারী কাঁদে, ধর্মেন্দ্র ফুসলায়।

গাছ থেকেও এই গঞ্জে সিনেমার পোস্টার বেশি নাকি? ভারতীয় সিনেমার পুরো নেপালে গরম বাজার। এই বাজার কতো মিডিওকার অভিনেতা-অভিনেত্রীকে 'সিতারা' বানিয়েছে। গরম গরম সমোসা সবাই খায়, তেমনি নরমগরম 'ফিল্মম'।

একদিন দিয়া জিজ্ঞেস করেছিল,

—তোমার ফেবারিট অ্যাকট্রেস কে রঘু?

রঘু বলেছিল,

—জিনা লোলোব্রিজিদা।

দিয়া ইংলিশ ছবি দেখেনা। কোন ধারণা নেই। বলেছিল,

—বাজে কথা না। জিজ্ঞেস করছি অ্যাকট্রেসের নাম। বলছো টেরামেরা মেশিনের নাম। অ্যানি ওয়ে, আর অ্যাক্টর?

রঘুর সাফ জবাব,

—কেউ নেই। সবাই ভালো, সবাই খারাপ।

—মানে!

—মানে সিম্পল। কোনও ছবিতে ভালো করলো তো, অন্য ছবিতে ফালতু।

দিয়া বলেছে,

—আমাদের ছবিগুলো খুব লাউড, তাই না?

রঘুর প্রতিবাদ,

—নট অ্যাট অল। কিছুদিন আগে মর্নিং শোতে একটি ছবি দেখেছিলাম।

—কোন ছবি রঘু?

—মেঘে ঢাকা তারা অব্ ঋত্বিক কুমার ঘটক।

—আমি দেখিনি। কেমন ছবি?

একটু থেমে রঘু বলেছে,

— ইন্ডিয়ায় এমন ফিল্‌ম্ তৈরি হয়, জানতাম না। কত মূর্খ এই রঘু!

—খুব ভালো ছবি?

—ইয়াহ্। আই ওয়াজ স্পেল-বাউন্ড। সুপ্রিয়া চৌধুরী নামে এক অভিনেত্রী এমন অভিনয় করলেন যে মনেই হলনা এ অভিনয়। বিদেশী অভিনেত্রীদের প্যারালেল ট্যালেন্ট ঐ ভদ্রমহিলারা!

কিছুদিন আগে বসন্ত টকিজে 'বিহোল্ড্ এ পেইল হর্স' ছবিটা দেখে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল রঘু। বিষণ্ণতার ঘোর কাটাতে পরপর কয়েকটা থ্রিলার ফিল্ম দেখেছিল। তবু ঘোর কাটেনি। চোখের সামনে ভেসেছে ছবির শেষ দৃশ্য বারবার—

সেভেন্টি মিলিমিটার ফ্রেমের বিশাল প্রোজেকশনে টেলিস্কোপিক রাইফেলে গান-পয়েন্ট। পয়েন্ট অনুসরণ করে পলায়নরত ফিল্মে ব্যান্ডিট্ গ্রেগরি প্যাকের মাথা। এক বিল্ডিং-এর ছাদে পুলিশ দূরের অন্য অ্যাপার্টমেন্টের করিডোরে দৌড়ায় ফিউজিটিভ প্যাক। টেলিস্কোপ প্যানিং করে। আবার গান পয়েন্টে দৃশ্যমান ওর মাথা।

পরের শটে ট্রিগার। ট্রিগারে আঙুল। কাট্। আবার মাথা ও ক্যামেরার প্যানিং। খুব দ্রুত দৌড়ায় ব্যান্ডিট্। মাথা ও রাইফেলের মাঝখানে স্বচ্ছ কাঁচের আড়াল।

স্ক্রিনে আবার আঙুলসহ ট্রিগার, ট্রিগারে টান পড়ে—কার্তুজ রিলিজড্ হয়ে যায়। কাঁচের আড়াল ঝন্‌ন্—খান-খান হয়।

গ্রেগরি লুটিয়ে পড়ে। আস্তে। স্লো-মোশন হাল্কা হাওয়ার পেঁজাতুলো ঝরার মতো—ব্যন্ডিট্ ফ্লোরে গড়িয়ে পড়ে। ফিনকি দিয়ে বেরোয় রক্ত।

বুলেটের আঘাতের অভিঘাত ও স্মৃতির যন্ত্রণায় প্রায় বুঁজে যায় গ্রেগরির দুটো চোখ। জল গড়ায়। সারামুখে ঘাম।

শট্ ডিজলভড্ হয়ে যায়।

এবার স্ক্রিনে ফেডইন করে—সাদা ফ্রক পরা এক চপল হাস্যময়ী বালিকা। যে শুভ্র বল ছুঁড়ে দেয় শূন্যে। বল লাফিয়ে ওঠে অনেক উপরে। মেঘ স্পর্শ করে, আবার ভেজা বল নেমে আসে। বালিকা লাফায়—গোটা শট স্লোমোশনে। ক্যামেরা লো-অ্যাঙ্গালে।

দৃশ্য মিলিয়ে যায় ঝাপসা।

আবার রক্তাক্ত গ্রেগরীর নিভন্ত চোখ। মেয়ের স্মৃতি। নিঃসাড় হয়ে যায় রক্তাক্ত দেহ। সেই শটে সুপার ইম্পোজিশন—বল উপরে ওঠে। মেঘের স্পর্শ নিয়ে একটু মেঘ সহ আবার নেমে আসে বালিকার হাতে। বালিকা অনাবিল হাসে দুহাত তুলে খিলখিল। আরো দু-একটা কাচের খণ্ড খানখান হয়।

আসলে—একটা মানুষের স্মৃতি ও স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

ব্যন্ডিটের লাশ পড়ে থাকে নিথর। ক্যামেরা সরে যায় আকাশে। মেঘের পাশে শাদা বলসহ বালিকার মুখ।

পর্দার জুড়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অস্পষ্ট হরফে ফোটে কয়েকটা শব্দ— Behold a pale horse ছবি শেষ।

আপ্লুত হয়ে যায় সেদিন রঘু। এই না হল—সিনেমার ভাষা! একেবারেই স্বতন্ত্র, আলাদা, সূচীভেদ্য সিনেমার বাক্য-বিন্যাস। অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকে ক অসাধারণ করে তোলে ক্যামেরা ও কুশীলবের আন্ডারটোন অভিনয়। মনে মনে শাবাসি দিয়েছে রঘু ডিরেক্টারকে।

—ওয়েল ডান, ওয়েল ডান, ম্যান!

সরগরম অঞ্চল থেকে বেশ দূরে চলে এসেছে হাঁটতে হাঁটতে।

এখন ভীষণ আনমনা রঘু। পথ চলতে-চলতে যে-কোনো পথিকের আনমনা ভাব আসেই। যারা আবার স্মৃতিবিশারদ—এদের তো আরো মুস্কিল।

কিন্তু পেছন-ফিরে এত বেশী কি তাকানো উচিত? মিলখা সিং-এর কী দশা হল। ট্র্যাকে সবার আগে এগোচ্ছে। পেছন ফিরে দেখল বাকিরা কতোটা পেছনে? ব্যস্, হয়ে গেল। উড়ন্ত শিখকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল তিনজন ধাবক।

জীবনের পথে ছুটতে-ছুটতে এভাবে পেছন ফিরে দেখতে নেই। দেখলেই এগোনো

যায় না। না দেখে-ও উপায় নেই। ধাবকের কোনো স্মৃতি নেই। কিন্তু পথিকের পাথেয় স্মৃতি। মানুষ তো আর ধাবক নয়—উদাম ট্র্যাকে একশ্বাসে ছুটে যাবে।

স্মৃতি আছে বলেই—সেই কবে, জন্ডিসে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মা এখনো জীবিত রয়ে গেছেন বুকের একেবারে ভিতরে। স্মৃতির কারুকাজ অবিরাম হয় বলেই তো—চাড্ডা আন্টি আছেন।

আর নেহা? ও কি স্মৃতি? না পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া নিবিড় সান্নিধ্যে একান্ত গোপন এক দোসর?

আরও কতজন! শুধু কি রক্ত মাংসের মানবিক অস্তিত্বই কেবল? নাঃ!

পাথর, নুড়ি, পাহাড়, মাটি, বৃক্ষ, মেঘ, হাওয়া, ঘ্রাণ, শব্দ-ধ্বনি, নদী, কূজন— সব মিলেমিশে এক নিরিবিলি স্ফটিক দানা। দানার আলোকিত বিচ্ছুরণ। বিচ্ছুরণের পোশাকি নাম স্মৃতি।

এই বিমূর্ত চেতনার চেয়ে মহার্ঘ আর কী হতে পারে— রঘুর তাই মনে হয়।

পরপর দুবার শিসের শব্দ কানে এলো। কে দিল বোঝা গেল না। শিস এমন এক ব্যাপার—এর কোনও লিঙ্গ-ভেদ নেই। গলার স্বর তো নয়।

রঘু এদিক-ওদিক তাকায়। ডানদিকে কাঠের দোতলার বারান্দায় রেলিং-ধরা তিনজন মেয়ে। একজন পাহাড়ি, বাকি দুজন সমতলের—বোঝা যায়।

একজন হাত তুলে ডাকে। শিস দেয়।

এ শিসের শব্দে ঝিলিকের শিসে আকাশ-পাতাল প্রভেদ—রঘু টের পায়।

অন্যজন ডাকে,

—উপর আ যাও।

রঘুর রগ টানটান। বলল,

—কেন? কী লাগে?

প্রথম যে শিস দিয়েছিল, সে বলল,

—তুম্‌হে চাহিয়ে।

—কিয়া?

চোখ টিপে অন্যজন বলল,

—গুদ্‌গুদি মিলেগা। উপ্পর আ যা। সির্‌ফ্‌ বিশ রুপিয়া। রঘুর তখনো অস্পষ্ট লাগে। বলল,

—বিশ টাকা! কিসের?

খিলখিল হাসে তিনজন। একজন ঠোঁট কামড় দিয়ে বলে,

—গোস্ত্‌। গরম হ্যায়। খায়েগা?

রঘুর মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে রাগে। বুঝতে পারে কেন বলছিল বুলন ভাইয়া কোনোদিকে

না তাকাতে, না শুনতে, না যেতে।

ঘিনঘিন করে সর্বাঙ্গ। তাড়াতাড়ি হাঁটে গলির পথে। বারান্দায় দাঁড়ানো তিন মাংস ব্যাপারি জোরে হাসে আর গালাগাল দেয়,

—দেখনে মে ঠিক হ্যায়। লেকিন নিচে লেবেনচুষ।

রঘু বুলনের সাবধানী ভুলে যায়। ঘুরে দাঁড়ায়। জোরে ধমকায়,

—ইউ শাট আপ্! ডার্টি উওম্যান!

তিনটে মেয়ে অবাক। একটু একটু হাসে তবু।

রঘু হাঁটে আবার। মনে-মনে বলে,

—দাঁত খুলে নেব পেত্নির দল। মেয়ে বলে কিচ্ছু করা গেল না।

সদর রাস্তায় উঠে রঘু হাঁটে আস্তে। ভাবে—'আই লাইক ইট' বলা যাবে না যদিও। তবু অনুভব—এই আকর? ফেলা যাবেনা। কাজে লাগবে। সবচে বড়ো কথা—স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ আজ অনুভূত হল স্পষ্ট—তুলসীদিদি সত্যিই তুলসী। স্বর্গের। তোমাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই গো। এরা ডাকে, আর তুমি তিরস্কার করে তাড়াও! তুমি কে গো তুলসীদিদি? তোমার অন্তর জুড়ে আর কতটা স্বর্গ আছে? সবকিছু দেখাবে? তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাবো আমি আর বুলনজি। মন্দির পিলসুজ, ধূপের ঘ্রাণ ছাড়া তোমায় মানায় না। কিম্বা মসজিদ!

সবতো দেখিনি এখনো। তবু মনে হয়, এই পৃথিবীময় কত জন যে কত ভুল স্থানে পড়ে আছে। তুলসীদিদি, তুমি প্রকৃত কে, কোত্থেকে এলে, কারা আনল—জানা নেই আমার। এতটাই জানি, তোমায় জোর করে তুলে এনে কেউ বা কারা এখানে বসিয়েছে।

যদি মাথায় ঢুকে একবার—সব জেনে নেব যেমন-তেমন করেই হোক।

প্রয়োজন নেই। তুমি রোশনি। আমার দৈর্ঘ্যহীন অনন্ত ছায়াছবির অনেক বিস্তার জুড়ে এক নারী অস্তিত্ব—এবং সে কি এবং কেন এমন—তামাম দর্শক নিজের মতো করে বুঝে নেবে।

বুলন ভাইয়াকে জোর দিয়ে বল না কেন—তোমায় উদ্ধার করতে। তোমায় নিয়ে যেতে দূরে কোথাও?

আমি জানি—মাঝেমাঝে, সময় পেলে বুলন যায় তোমার কাছে, তাও দিনে। চুপচাপ তোমার পাশে বসে থাকে। তোমরা দুজনে কথা বল। কী বল তোমরাই জানো। তারপর হয়তো তোমার হাতের এককাপ চা খেয়ে বড়কাভাইয়া চলে আসে। তুমি তিনতলার রেলিঙে দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়া লক্ষ্য করো। আর ফিসফিস স্বরে প্রতিবার বলো,

—আবার এসো। নিজের খেয়াল রেখো।

বুলনজি ছোট্টশ্বাস ফেলে একই জবাব দেয় সবদিন,

—আচ্ছা।

তুলসীদিদি কারা অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে রেখেছে তোমাকে? কিচ্ছু বল না কেন আমায়?

হাঁটতে-হাঁটতে খুবই তলিয়ে ভাবছে রঘু। স্বভাব এমন—একটা কিছু মনে দাগ কাটলেই হলো। ডুবুরি হয়ে যাওয়া।

মেয়েগুলো কেন করে এসব? টাকার জন্যে? এরা কি খুব অভাবী? নিশ্চয় কোথাও কোনও ফল্ট্ আছে। যেচে গরম-গোস্ত কেন দিতে চায় মেয়েগুলো কুড়ি টাকার বিনিময়ে?

বাজারে মুরগির গোস্ত্ প্রতিকিলো পাঁচ টাকা। বকরা ছটাকা।

ঐ যে গোস্ত্ মেয়েরা বেচতে চায়, এর কিলোপ্রতি ভ্যালু কতো? এভাবে বিক্রিই বা হয় কেন? জানতে হবে, সব জানতে হবে।

কাটা মাংস তো ঠান্ডা। মেয়ে তিনজন বলল, গরম মাংস। মানে কী হল?

মেয়েদের শরীরের মাংস শরীরে রেখেই খুলে-খাবলে নেয় খদ্দের! মাই গড্! কুড়ি বছরের জীবনে এই প্রথমবার এমন দপ্দপ্ করে রঘুর মাথা। অস্থির হয়। স্পষ্ট বুঝে নেয়— না কেটে বিক্রি করা গোস্তের ব্যবসা বড়ো নির্মম।

মায়া হয়, ঐ তিনটে মেয়ের জন্যে, মায়া হয়। ওরা-ও তো একদিন জন্মেছে কোন মায়ের গর্ভে। হামাগুড়ি দিয়েছে। আস্তে আস্তে বড় হয়েছে, আর আজ? কেন এমন হল?

কোনদিন, কীভাবে এই নিকৃষ্ট কেনাবেচা শুরু হল—কে জানে? ঐ গলিটাই কি রেডলাইট এরিয়া, যেমন আছে আমাদের শহরে—যেখানে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়— আমার তুলসীদিদিকে?

ঐ বাড়িগুলোই কি ব্রথেল? কেন তৈরি হয় এমন বাড়ি, তা বোঝা গেলো। কিন্তু কারা বানায় এমন ব্রথেল-জানতে হবে।

মেয়ে তিনজনকে কুড়িটা টাকা দিয়ে আসতে প্রবল ইচ্ছে হয় রঘুর। কিন্তু যায় না।

বিষণ্ণ হতে থাকে। কত যে অলিগলি মানুষের জীবনে—অন্ধকার। এই অন্ধকারের শেষ কি নেই? কতোই বা বয়স মেয়েগুলোর? ষোলো-সতেরো-আঠারো, কিম্বা উনিশ। এর বেশি নয়? রঘু ভাবে, আর ভাবে।

পথের নিশানা বুঝতে না পেরে চলে গিয়েছিল ঐ গলিতে—যেখানে কদর্য এক মণ্ডি—কিছু রুপল্লির বদলে মানুষ মানুষের গরম গোস্ত কিনে নেয়। সব তুলে আনতে হবে আমার ফিল্মে। ঐ তিন মেয়েও কিছুটা দাবিদার। দেব, সবাইকে দেব যার যতো ফুটেজ লাগে। কী করব আমি? জীবনটাই এমন—কেবল ফুটেজসহ মানুষ, অগুন্তি মানুষ বাড়ে। আর বাড়তে বাড়তেই সব একাকার হয়ে এক উদাস বহমান ধারা হয়ে যায়। নদী।

জিপ নেপাল সীমান্ত অনেক আগে পেরিয়ে যোগবানি পেরিয়ে গেছে। ফরবেসগঞ্জ এইমাত্র পেরোল। কোথাও থামাথামি নেই।

এবার জিপ চালাচ্ছে নান্কু। ইরফান রয়ে গেছে নেপালে। ফেরত পথে মাত্র দুজন,

বুলন আর নানকু। রঘুকে গোনায় ধরা হবে না।

বাহর কা আদমি। মুনিমজীকে কীভাবে বুঝিয়েছে বুলন, একমাত্র সেই জানে। রঘু জানে না। বুলন কিচ্ছু বলেনি।

খোলামেলা পিচের রাস্তা সামনে। অনেক গাড়ির ছোটাছুটি এই হাইওয়েতে। ট্রাক বাস মিলিটারি ভেহিক্‌ল্ মোটর বাইক টেম্পো। রাস্তাটা লাইফ-লাইন এ এলাকার। একটু দূরে কাটিহার-যোগবানি মিটারগেজ রেললাইন। ওখানে ফাঁকা। কোন ট্রেন নেই।

রেললাইন বরাবর টেলিফোনের তারে কয়েকটা দোয়েল বসে আছে। দু-একটা চাতক ওড়ে আকাশে। মেঘ নেই। তবে আকাশ পরিষ্কার নয়—ধুলোধুলো ফ্যাকাশে।

নানকু গিয়ার পাল্টায়। কড়্-কড়্ শব্দ হয় গিয়ারবক্সের পিনিয়নে। জিপের চেহারা ভালো নয় ঠিকই, চাকা চেসিস্ ইঞ্জিনে বহুৎ তাগদ্। দৌড়ায় প্যান্থারের মতো। স্পিডোমিটারের ক্যাবল ছিঁড়ে গেছে। সুতরাং ডায়েলে কাঁটা অনড়। স্পিড বোঝা যায় না। রঘু অনুমান করল—৭০/৭৫-এর কম হবে না।

সামনের সিটে রঘু আর নানকু। পেছনে বুলন একা। রঘুর অবাক লাগে—এরা কথা বলে না কেন? একমনে চুপচাপ কী জপ করছে রে বাবা!

রঘু লক্ষ করেছে—বুলনের পায়ের তলায় দুটো হুইল টায়ার-টিউব সহ।

রঘু বলল,

—কথা না বলার ব্রত করছ নাকি দুজনে?

বুলন চাপা ধমক দেয়,

—চোপ্ বে!

রঘু অনুমান করে কেন খিঁচড়ে আছে বুলনের মেজাজ। তখন বলেছিল ওকে গোস্ত্-ওয়ালা গলির আদ্যোপান্ত।

কথা শুনে বুলন ডিনামাইট। বলেছে,

—তোকে কী বলেছিলাম আমি?

—কী?

—কী মানে? কোনোদিকে যাবি না, তাকাবি না। চৌথা গলিতে যাবি না? কেন গেলি?

রঘু বোঝায়,

—আরে ধুর! যাইনি তো!

—চোপ্! যা মানা করা হবে তা করবেই!

রঘু অসহায় তখন বলেছে,

—রাস্তা যেখানে বাঁক নিল, বাঁদিকে গলিতে ঢুকে গেলাম শর্টকাট হবে মনে হল। কে জানে, ঐ গলি সেই গলি। কোনোদিন এসেছি আমি এখানে এর আগে? তুমি কী করে জানো

ঐ গলিতে,

কথা সম্পূর্ণ করতে দেয়নি বুলন। ধমকেছে জোরে,

—এ, লৌণ্ডা, এক ঝাপড় খাবি?

রঘু পাত্তা দিল না। জেরা করেছে আবার,

—কী ঝাপড় খাব খামোকা! আগে বলো তুমি কী করে জানো?

মাথা নেড়ে বুলন বলেছে,

—উফ্! উল্লু-কা-পাঠা। পুলিশকা মাফিক সয়াল করতা হ্যায়! ঠিক হ্যায়, মুঝে কুছ নেহি মালুম। তু যা, জাহাঁ তেরা মর্জি।

রঘু বলল,—

—কোথায়? তোমার ঐ গলিতে?

বুলন চটে যায়,

—কী বললি? ওটা আমার গলি, বদ্‌মাশ!

—ওহো, রেগে যাচ্ছে কেন?

—সব দাঁত খুলে হাতে দিয়ে দেব বদতমিজ!

জানিস, ওখানে কী হয়?

রঘু মহাবিজ্ঞ তখন। বলল,

—জানি।

রাগ ঝেড়ে ফেলে দেয় বুলন। উল্টে তটস্থ। সন্তর্পণে প্রশ্ন করে,

—কী জানিস?

রঘুর টান-টান স্বভাবসিদ্ধ খটখটে উত্তর।

বলেছে,

—না কেটে গরম মাংস বিক্রি হয় ওখানে।

বুলন ধমকায়,

—চোপ। সব জেনেও গেলি।

এবার রেগে যায় রঘু। বলেছে,

—কী মানুষ তুমি। কান নেই তোমার। কতবার বলব, জেনে শুনে যাইনি। রাস্তা উল্টাপাল্টা হয়ে গেল। ঢুকে গেলাম চৌথা গলিতে।

বুলন বলল,

—বড়ো কাজে জায়গা, জানিস না তো।

রঘু উতক্ত। প্রায় চেঁচায়,

—ওহ্ শিট। প্লীজ স্টপ। আই নো, হোয়াট ইজ হোয়াট। ডোন্ট্ ইরিটেট মি প্লিজ।

বুলন জানে—রঘুর জিহ্বায় অংরেজি মানে মাথা গরম। বলেছে,

—ঠিক হ্যায় শান্ত্ হো যা মেরে ভাই।

—ঐসব গান্দা কামে আমার দিলচসপি নেই বড়কাভাইয়া।

—মুঝে মালুম হ্যায়। তু কিয়া হ্যায় মেঁ জানতা হুঁ।

—ঘণ্টা জানো! হাঁস কাদায় নামে দেখেছ? কাদা লাগে?

বুলন শান্ত করায়,

—মুঝে মাফ কর দে।

রঘু একনাগাড়ে বলে যায়,

—আমি জুয়া খেলেছি। মদ খেয়েছি। গাঁজা খেয়েছি। কেন জান?

বুলন ভ্যাবাচ্যাকা। বলেছে,

—কেন?

—লোকে এসব কেন খায় বুঝতে।

—কী বুঝলি?

রঘু রায় দিল,

—খামোকা খায়। কৌই মজা নেহি, এটাই জানলাম। আমরা ক্লাশে পড়ি যে বইপত্র; সব হাতে-নাতে বুঝবার জন্যে সায়েন্স্ ল্যাব থাকে।

বুলন বলল,

—কী থাকে?

রঘুর স্পস্ট জবাব

—তুমি বুঝবে না।

তবু বুলন কিছুটা চটে আছে। রঘুর হাঁস-টাস উপমা মনঃপূত হয়নি। ছেলেটা খালি ঝামেলায় জড়ায়। আবার কী করবে কে জানে। বলল,

—এ রঘু।

—বলো।

—এবার কিছু কাজ আছে আমাদের। তুই চুপচাপ জিপে বসে থাকবি।

—কী কাজ?

—এই, কোনো প্রশ্ন না।

রঘু আবার ঠ্যাঠামো করে,

—এখানে চুপচাপ ধ্যানজপ করতে আসিনি।

—কী করবি তুই?

—তোমরা যা-যা করবে সব দেখব।

নানকু একমনে জিপ চালায়। এখন স্পিড কিছুটা কম।

জিপের বাইরে অদূরে ধানখেত। খেতের পর পাহাড়। পাহাড়ের আরো দূরে অনেক

উঁচুতে আকাশ দখল-নেয়া নীল হিমালয়। হিমালয়ের মাথায় কয়েকখণ্ড মেঘ। কোনদিকে উড়ে যাবে এখন, ঠিক নেই। সূর্য অস্ত গেছে অনেক আগে। লালচে আলোর আভা এখনো আছে পশ্চিম আকাশের বুক-জুড়ে।

এইসব দেখতে-দেখতে ছোট্ট শ্বাস ফেলল রঘু। বুলন বলল,

—মদ-গাঁজা কোথায় খেয়েছিলি রে?

রঘু আনমনা। বলল,

—মদ-গাঁজা! কী মদ-গাঁজা?

—তখন বললি যে, ওসব খেয়েছিল আগে?

—ওহো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। খেয়েছিলাম।

—কবে, কোথায়?

সময় নিল রঘু কিছুটা। তারপর বলল,

—অনেক আগে। আপার আসামে। তখন একজন বকেছিল খুব। জুয়া খেলেছিলাম তো।

—কে বকেছিল?

রঘু ভাসা-ভাসা স্বরে বলল,

—ছিল একজন। বড়ো কড়া গার্জিয়ান।

রঘুর গলায় হিমালয়ের মেঘ। স্বর আরো অস্পষ্ট। দৃষ্টি ছুটন্ত জিপের বাইরে।

বুলন বলল,

—কোথায় থাকে? আপার আসামে?

রঘুর স্বরে ডুবন্ত সূর্যে আলো নেই। অন্ধকারও নেই। মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই। তেমনি স্বরে বলল যেন নিজের মনে,

—এখন কোথায় আছে জানিনা।

বুলন আবার বলল,

—কী নাম ওর?

রঘু মুখ ঘুরিয়ে নেয় জিপের পেছনে। অন্য কথা বলল,

—আচ্ছা, পেছনে একটা-ও গাড়ি নেই কেন?

বুলন টের পায়—জবাব পাবে না।

কিছু লুকিয়ে ফেলল ছেলেটা।

পূর্নিয়া পেরিয়েছে একটু আগে। রাস্তার বাঁদিকে ক্রুড্‌ওয়েলের পাইপলাইন। আপার আসামের নাহরকাটিয়া, গেলেকি, শিবসাগর থেকে গৌহাটি ছুঁয়ে লাইন সোজা গেছে বারৌনি রিফাইনারি। মাঝে মাঝে আছে পাম্পিং স্টেশন। কাটিহার পূর্নিয়া রোডে এমনি এক স্টেশন আছে—জায়গাটার নাম দুমার। আলোয় ঝলমল কমপ্লেক্স।

এসবও পেরিয়ে গেল জিপ। সন্ধে মিলিয়ে গেছে।

সামনে পোল। তলায় নদী। ঠিক নদী নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে—রিভ্যুলেট।

পোল পেরিয়ে বাঁদিকের শেষ মাথায় জিপ থামাল নানকু। বুলন নামল আগে।

হিপ্‌-পকেট থেকে বার করল পেন্সিল টর্চ। লাল আলো ফেলল চারধারে। ভীষণ তীব্র আলো। ছুঁচালো আলোর বিন্দু অনেকদূর যায়। রঘু জানে—ওটা লেসার পয়েন্টার।

বুলন এমন করছে কেন—বুঝতে পারে না রঘু। অবাক লাগে। বলল,

—হোয়াট হ্যাপেন্ড্‌?

বুলন কিচ্ছু বলে না। নানকু-ও না। এবার নদীর একেবারে কিনারায় দাঁড়ায় বুলন। দু-একটা গাড়ি পোল পেরিয়ে এদিক-ওদিক চলে যায় দ্রুত।

আপাতত চারদিক ফাঁকা। কোন গাড়ি-টাড়ি নেই। দু-আঙুল মুখে দিয়ে অদ্ভুত শিস দেয় বুলন। এমন তীব্র শিস কোনোদিন শোনেনি রঘু। হাই ডেসিবলে পিক্যুলিয়ার ফ্রিকোয়ান্সির ধ্বনিতরঙ্গ।

জবাবে নদীর খাদ থেকে স্পষ্ট ভেসে আসে হাততালির শব্দ তিনবার। বুলন টর্চের ফোকাস ছোঁড়ে । রঘু বোঝে—এটাও আলট্রারেড্‌ রে পয়েন্টার।

এবার বুলন নানকুকে বলল,

—রুহিতন। লালগোলি।

নানকুর চটপট জবাব,

—খাল্লাস! সুখাপাত্তি।

বলেই এক মুহূর্ত দেরি না করে নানকু জিপ থেকে লাফিয়ে নামে। জিপের পেছন থেকে টেনে নামায় দুটো চাকা।

দুটোই পর-পর গড়িয়ে দেয় নদীর ঢালে। টায়ারে রবারের ঘষায় ফ্যাসফ্যাসে শব্দ হয়। চাকা গড়ায়। তারপর সব চুপচাপ।

অন্তত পাঁচ মিনিট গেল। জিপ থেকে রঘু নামে নিচে। এগিয়ে যায় ওদের কাছে।

নিচ থেকে আলোর বিন্দু টিকরে আসে আবার।

সঙ্গে-সঙ্গে, ডানহাতের প্রচণ্ড চাপে রঘুকে বসিয়ে দেয় বুলন। হঠাৎ করে ধাক্কায় রঘু মাটিতে পড়ে যায়।

নদীর গহ্বর থেকে আওয়াজ আসে,

—কৌন হ্যায় তিস্‌রা আদমি?

বুলন জোরে বলে,

—ফিকর নেহি। আপনা আদমি।

একটু থেমে নদীর খাদের অন্যজন বলে,

—বুলনজি, ফোন করে দিয়ো।

—কোথায়?

—তাজমহল।

—কৌনসা?

—পিলা তাজমহল।

—ঠিক হ্যায়।

রঘু এখনো মাটিতে। অবাক ও মজা লাগে খুব। কোন ভাষায় কথা বলে রে বাবা! তাজমহলে টেলিফোন আছে নাকি! থাকলেও কল্ রিসিভ করবে শাহাজাহান আর মমতাজের প্রেতাত্মা!

মমতাজ! ইয়েস, মমতাজ! এনাম দুএকবার শুনেছে রঘু ও বুলন ইনারদেওর কথাবার্তায়। দুজন আকা ছাড়া এই মম্‌তাজটা কে? জেনে নিতে হবে।

বুলন টেনে তোলে রঘুকে। রঘু নিজেই উঠতে পারত। ওঠেনি। অন্যচিন্তায় মশগুল। বুলনকে মনে মনে ধন্যবাদ দেয়—থ্যাঙ্কস আ লট বড়কা ভাইয়া!

কিন্তু, হলুদ তাজমহলটা কী? আর মমতাজ! এর আবার আলাদা কোনও রং আছে নাকি?

খাদের লোকটা 'বুলনজি' বলে ডাকল কেন? এভাবে নাম ধরে ডাকা ঠিক-নয়।

চাকা দুটো যে গড়িয়ে দিল নদীর দিকে—ওতে গাঁজা ঠাসা আছে। কোকেইন-ও থাকতে পারে। রঘু জানে।

বুলন সিগারেট ধরায়। নানকু-ও। রঘু বলল,

—আমাকে দাও একটা।

বুলন বলল,

—কী?

—সিগারেট।

—তুই সিগারেট খাবি?

—খাই না একটা।

—না।

ধুর। দাও। ছোটবেলা থেকে শখ খুব—বড়ো হয়ে দমাদম সিগারেট টানব। নাকের দুটো ফুটো দিয়ে গলগল ধোঁয়া বেরোবে।

নানকু হাসে। বলল,

—নাও রঘুভাইয়া।

বুলন বাধা দেয়।

—নেহি। সিগারেট খাবি না। ব্যায়াম করলে এসব খেতে নেই।

রঘুর থ্যাঁতলামো,

—একটা খেলে কিচ্ছু হয় না। সিগারেট খেতেই হবে।

প্রায় জোর করে কেড়ে নিল বুলনের হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট। লম্বা একটান দিয়ে বলল এমন, যেন বাজারের দরদাম যাচাই করছে,

—আচ্ছা, তোমাদের মমতাজটা কোন চিড়িয়া?

বুলন বলল,

—চুপ কর বুরবক। সব শুনে নেয়।

—আমি কালা নাকি? কান আছে যখন শুনবই।

—তেরা কান ঔর মুঁহপর তালা লাগানা হোগা।

—লাগাবে পরে। এখন বলো তো হলুদ তাজমহলটা কী এবং কোথায় আছে? কোন বাদশা বানাল? ওর-ও কি বউ মরে গিয়েছিল?

বুলন হাসে না। কিন্তু নান্‌কু হেসে ফেলল। রঘুর-পিঠে হাত রেখে বলল,

—বহুৎ নটখটিয়া হো তুম। খালি প্রশ্ন, খালি প্রশ্ন।

বুলন বলল,

—একে আনাই ভুল হয়েছে আমার। চল। জিপ থেকে নামলি কেন রে?

রঘুর নির্বিকার জবাব,

—ধূর! কতবার বলবো, সব দেখতে চাই। সব দেখতে হবে আমাকে। ইজ্ দ্যাট ক্লিয়ার?

বুলন-নানকুর এতোটাই ক্লিয়ার হল এই ছোঁরা এক গজব-কা-পটাকা। সামলে-সুমলে একে না ধরলে, বিরাট ধমাকাসহ ফেটে নিজে মরবে, অন্যকে-ও মারবে।

দুজনেই বলল,

—চলো। যাব আমরা এখন।

রঘু বলল,

—ওহ্ সিওর। হারিআপ্! জলদি চলো, ইউ ইডিয়ট স্মাগ্‌লারস্।

এবার তিনজনই সামনে। নানকু জিপ চালায়। রঘু দুজনের মাঝখানে। বুলন জিপের ডানদিকে। লেফ্ট হ্যান্ড ড্রাইভ জিপ।

হেডলাইটের আলো অনেকদূর ছড়িয়েছে। ডায়েল ল্যাম্প নেভানো। ব্যাক্‌ভিউ - ফাইণ্ডারে কোনও গাড়ির আলোর চিহ্ন নেই। অদ্ভুত এক ব্যাপার মনে হয় রঘুর—এত ব্যস্ত হাইওয়ে হঠাৎ একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। এখন যেমন।

মিলিটারি হসপিটাল, সরকারি ইটভাট্টা, বিশাল কয়লার ডিপো সব পেরিয়ে গেল জিপ। কোনোটা রাস্তার ডানদিকে, কোনোটা বাঁদিকে।

এখন ডানদিকে আর্মি অর্ডিন্যান্স্ ডিপো। আলো ঝলমল। নিশ্ছিদ্র পাহারা ওখানে। রঘুরমনে পড়ে, পুনার অর্ডিন্যান্স ডিপো আরো অনেক বড়ো। ছোটোখাটো শহরের মতো।

ওখানে দুবার নিয়ে গিয়েছিলেন প্রীতমজি। নেহাও ছিলো সঙ্গে। ফিল্ডগানের তরতাজা মর্টার দেখেছিল সেবার ওখানে। রঘু ছুঁতে চেয়েছিল। মহা সাবধানী নেহা ওর হাত ধরেছিল টেনে। বলেছিলে,

—ছোঁবে না তুমি। ফাটতে পারে।

নেহা, তুমি জান—আজ আমি সারাদিন গাঁজা-চোরাকারবারিদের সাথে কাটালাম? এখানে যে-কোনো সময় যা খুশি হতে পারে। ঐ যে, একটু আগে, তিসরা আদমি মনে করে নদীর খাদ থেকে আমার দিকে রিভলবারের গুলি ছুটে আসতে পারত। আমি জানি—তুমি থাকলে, তোমার বুক দিয়ে আড়াল করে রাখতে আমায় বুলেটের আঘাত থেকে।

তুমি এখন কোথায় গো নেহা? তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হয়। লু-বাতাস বয়। রোদ মাটি ফাটিয়ে ফালা-ফালা করে দেয়। সবাই আইসক্রিম খায়। তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়। আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করে। না না, এই আইসক্রিম না। এ অন্য পিপাসা। তোমার চেটোর উপর আমার অন্য, সেই ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়, দুজনে ভাগাভাগি করে খাওয়া আইসক্রিম গো!

আচ্ছা, নেহা, এক প্রিয়তম মানুষের স্মৃতি একজন বিচ্ছিন্ন মানুষ কতদিন, কতকাল ভেতরে-ভেতরে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে, বুকে ধরে উদভ্রান্তের মতো বয়ে নিয়ে যেতে পারে?

আমি বইব নেহা। তোমাকে, তোমার কথাকে। আজীবন বইব। আর বইতে হবে বলেই— যা করার কোনও মানে নেই তাই করি। নেহা, তুমি যেখানেই থাক, ভালো থেকো। তুমি চিরায়ু হও। সুখী হও।

উরুতে চাপড় মারে বুলন। বলল,

—কীরে, ঘুমিয়ে গেলি রঘু?

রঘু আবার ফিরে আসে নেপাল রোডে প্যান্থারের মতো ছুটে-যাওয়া জিপে। বলল,

—কী?

—কী হল? কী ভাবছিস?

ছোট্ট শ্বাস ফেলল রঘু। স্বভাবসিদ্ধ আনমনাস্বরে বলল যেন নিজেকে,

—নাঃ! কিচ্ছু না।

বুলন বলল,

—তখন নামলি কেন গাড়ি থেকে?

—দেখতে ইচ্ছে হলো, ব্যস্।

—কী হত জানিস?

—কী?

—ফায়ার করতে পারত।

—জানি।

—জানিস, তবু নামলি?

রঘু ভীষণ গম্ভীর এখন। সামনের দিকে চেয়ে আছে একমনে। জিপের উইন্ডশিল্ডে বাতাস আছড়ে পড়েছে জোরে। গাড়ির দুদিকে, কেটে বেরিয়ে যাওয়ায় এরই শব্দ—সাঁ-সাঁ।

বুলন আবার বলল,

—জেনে-ও নামলি?

—হুঁ।

—যদি ফায়ার করত?

রঘু বলল,

—কী হত আর? মাথার খুলি উড়ে যেত। কিম্বা বুক ঝাঁঝরা হত। সব ঝামেলা শেষ।

—কিয়া মতলব?

রঘু বলল অন্য কথা। আসল প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চাইল।

—এ বড়কা ভাইয়া, মুঝে বাহাদুরগড় এস্টেট কে পাস উতার দেনা।

—কেন?

—শর্টকাট চলে যাব হোস্টেলে এস্টেটের শালবনের পথ ধরে।

বুলন অবাক। বলল,

—কী বলছিস? অন্ধকার যাবি ঐ পথে?

এবার গম্ভীর রঘু কিছুটা বিরক্ত। বলল,

—যো বোলা মৈঁ, সো করো। অন্ধকার-টন্ধকার কিছু না।

বুলন রঘুর মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

বলল,

—এ নানকু, বাহাদুরগড়কা মোড় মে গাড়ি রুক্ দেনা।

গাড়ি থামতেই প্রায় লাফিয়ে নামলো রঘু। কাউকে কিচ্ছু না বলে এস্টেটের শালবনের পায়ে চলা পথ ধরে এগিয়ে গেল মিরচাই বাড়ির দিকে। শালবনে অজস্র জোনাকি। হাল্কা নীল সবুজ আলো নিভে-জ্বলে।

জোনাকির মোহময় আলোয় মন নেই রঘুর। চোখের সামনে বারবার ভাসে পুনার অর্ডিন্যান্স ডিপোর সেই মর্টার। মর্টার ছুঁতে চাওয়া কালো হাত জাপটে ধরে এক ফর্সা লম্বাটে হাত। আর সাবধানী অনুশাসন, নেহার,

—রঘু, ছোঁবে না। ফেটে যাবে। ডোন্ট্ টাচ ইট।

বুলন বলল,

—কুকুরের লেজ আর তোর জেদ এক সমান। কিছু একটা মাথায় চাপলেই হল।

রঘু ধমকায়,

—তোমার জেদ কম না। বলছি, দেখাও। আমি কি নিয়ে পালাব? বিশ্বাস করছ না আমাকে।

—ধুর বুরবক! তা নয়।

—তো কী?

—এসব তোর হাতে দিতে মন করে না।

—কেন?

বুলন বোঝায়,

—কলম-সিয়াহি তেরে হাত মে হোনা চাহিয়ে। তুই লেখা-পড়া করবি। আচ্ছা তালিম নিবি। এসব বাজে জিনিস ছুঁবি না।

রঘু বেজার। বলল,

—তোমার ভাষণ ছাড়ো। দেখাতে হলে দেখাও একবার।

একবার সম্পূর্ণ দেখলো রঘুকে বুলন। কী চিন্তা করল একটু সময়। তারপর বলল,

—নে ধর। দ্যাখ, যতো তোর মর্জি।

বলেই টারকিশের গেঞ্জি তুলল বুলন। কোমরে বেল্ট। বেল্টে পিস্তলের লেদারব্রিচেস্, পিঠের দিকে। ব্রিচেসের বোতাম খুলে তুলে নিল বাঁহাতে পিস্তল। ঘননীল-কৃষ্ণবর্ণ প্রায়। চকচকে ধাতব যন্ত্র।

পিস্তল তখন বুলনের হাতে। বলল,

—ধর। দ্যাখ। খেয়ে ফেলবি তো খা।

রঘুর মুখে শিশুসুলভ হাসি এমন—অবোধ বালক যেমন কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাতে পেলে হাসে।

তারপরই সমঝদার। পেশাদারি জাসুসের মতো পকেট থেকে বের করল রুমাল। ভাঁজ খুলে মেলে ধরলো নিজের চেটোয়। বলল,

—দাও।

বুলন দিল। রঘুর রুমালে-ঢাকা হাতে। নিয়েই মেলে ধরল চোখের সামনে। মুখে একটু আগের চপল হাসি।

বুলন হেসে ফেলল বিস্ময়ে। বলল অকপট তোয়াজ বা অন্য কিছুতে,

—উস্তাদোঁ কা উস্তাদ হ্যায়। হামারা লাইন মে পুরা ফিট তু!

রঘু এখন মহাবিজ্ঞ। বলল,

—কারও হাত থেকে যে-কোনো ধরনের অস্ত্র নিতে হলে খালি হাতে নেবে না কখনো, যদি একই অস্ত্র আবার ফিরিয়ে দিতে হয়। সমঝা কুছ?

বুলন বোকা বনে গেছে। বলল,

—কোত্থেকে শিখলি এসব? আমাদের লাইনে এমন নিয়ম আছে রে!

পৃথিবীর বিখ্যাত সব গোয়েন্দা কাহিনির ঘনীভূত জ্ঞান ও রঘুর একেবারেই নিজস্ব তীব্র সংবেদনশীলতা প্রায় প্রাজ্ঞ করে দিল ওকে। অপরাধ তত্ত্বের সবকিছু যেন ওর কাছে সহজপাঠ, তেমনি প্রত্যয়ে বলল বুলনকে,

—এ লাইনে মা, বাপ ভাই বহিন কাউকে বিশ্বাস করবে না বুলন ভাইয়া।

বুলনের মুখে-চোখে বিষণ্ণ ছায়া। স্পষ্টতই আহতস্বর। বলল,

—কাউকে না? তুই আমাকেও বিশ্বাস করিস না রঘু?

রঘু আশ্বস্ত করে,

—ওহ্ কামঅন! তা-নয় বড়কাভাইয়া। তুমি চাইলে এই রঘু পুরকায়স্থ নিজের কলিজা খুলে দেবে, ট্রাস্ট মি। আমি বলছি—সাধারণ অথচ জরুরি নিয়ম। মজবুরি মানুষকে দিয়ে অনেক কাজ অনিচ্ছায় করিয়ে নেয়।

বুলন আনমনা হয়। কী যেন ভাবে। তারপর বলল,

—ঠিক। তুই পাক্কা বলেছিস রঘু। মজবুরি ঔর লাচারি লেকর ইয়ে বে-মতলব জিন্দগি। কিছুই করার নেই।

রঘু পিস্তল নাড়াচাড়া করে। গ্রিপের ভেতরে ম্যাগ্‌জিন। ম্যাগজিনে লেবেনচুষের মতো দশটা আপাত শীতল কার্তুজ। পিস্তলের হ্যামারের তীব্র আঘাত পড়লেই জ্বলন্ত সিসা ছোটে—এফোড়-ওফোড় করে দেয় সব—সব তথ্য রঘুর জানা।

পিস্তলটা এমনভাবে দেখছে—মেলা থেকে কিনে আনা আদুরে খেলনা। রঘুর মজা লাগে। সেই একই শব্দ করে উচ্ছ্বাসে,

—এ, -হে-হে!

বুলন সাড়া দেয়না। সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে।

রঘু ডাকে,

—বড়কাভাইয়া

—কী?

—জীবনে বে-মতলব কিচ্ছু নেই।

—মানে?

রঘুর বয়স কুড়ি। তেমন অভিজ্ঞতা নেই হয়তো। তবু যতোটুকু নির্যাস শুষেছে জীবন নামক এক চলিষ্ণু উদ্ভিদ থেকে, সেই নির্যাসই মাঝে-মাঝে বড়োবেশি বয়স্ক করে দেয় এই রঘুকে। যেমন এখন। খুবই হাল্কা হলেও মেঘের গমগম স্বরে বলল রঘু,

—জীবনের সব অর্থ জীবনেরই পরতে-পরতে আছে। খুঁজে নিতে হয় শুধু। খুঁজে নিও বুলনভাইয়া।

জবাবে বুলন বলল,

—আমি পারি না রে রঘু। মূর্খ মানুষ আমি।

রঘু আগের মতোই প্রাজ্ঞ এখনও। আসলে ভেতরের সুস্থির রঘু উঁকি দেয় বারবার বাইরের রঘুর জিহ্বায়। বলে,

—জীবনের সব অর্থ কোনো কিতাবে খুঁজে পায় না কেউ। দিন যাক, সময় যাক, আরো ঘটনা ঘটুক। সারা মতলব নিজেই ধরা দেবে। মূর্খ-বিদ্বান এসব বাজে কথা। তোমার মতো জীবনে আর কে দেখেছে এত? একটা কথা বলি বুলনভাইয়া।

বুলন বলল,

—কী কথা?

—তুমি বুলনপ্রসাদ নও।

—মানে?

—হ্যাঁ। তুম্ বুলনিয়া। দূর কিসি গাঁও কা এক বালক—এ লার্নার। ডু ইট আন্ডারস্ট্যান্ড?

অন্তর্লীন রঘুর মুখে যে বাক্যই ফুটুক না কেন, মাংসপেশীধারী রঘুর ডানহাতে নাচে পয়েন্ট থ্রি-টু বোরের ঝকমকে ইংলিশ শস্ত্র। আপাতত এতেই সব মনোযোগ ও অভিরুচি ধাবিত হয় শতকরা শত ভাগ—। না চালিয়ে হাতিয়ার সামনে ধরে মুখে শব্দ করে কুড়ি বছরের অস্থির বালক,

—ডি-সিঁ-উঁ!

বুলন ডাকে গম্ভীর স্বরে,

—এ রঘু।

—বালো।

—আমার কতটুকু জানিস তুই। কিছুই জানিস না।

রঘু বুলনের কথায় মনোযোগ দেয়। বলল,

—জানি না ঠিকই। তবে অনুমান করতে পারি।

কী অনুমান করতে পারিস?

—বুলনিয়া কেন বুলনপ্রসাদ আজ? তুলসীদিদি কেন-ই বা ঐ নরকে আছে।

—তুই বুঝিস সব?

—সব তো না। কিছুটা।

—কতটা।

এক ট্র্যাক থেকে অন্য ট্র্যাকে দৌড়ে যাওয়া দুরন্ত ধাবক রঘু চিরকাল। প্রসঙ্গ পাল্টায় আবার। এবার আব্দার বা আহ্লাদী নেই। সোজাসুজি বলল,

—এক রাউণ্ড্ ফায়ার করবো।

বুলন আঁতকায়,

—কী!

রঘুর একই জবাব,

—এক রাউন্ড।

—নেহি।

—সির্‌ফ্ এক গোলি। অন্‌লি ওয়ান রাউন্ড।

বুলন বলল,

—কোথায় চালাবি?

—হাওয়ায়।

—পাগল হ্যায় তু।

—চালানে দো ইয়ার। এক রাউন্ডে কী হয়?

ওরা এখন এমন জায়গায়—চারদিকে দীর্ঘ পাটের খেত অনেক দূর বিস্তৃত। মাঝখানে অন্তত তিরিশ মিটার ব্যাসের গোলাকার জায়গার পাট কেটে ফেলা হয়েছে। একটা দোচালা ঘর আছে এখানে টেকোপাতায় ছাওয়া। ইকড়ের বেড়া। একটা দরজা। জানালা নেই।

কয়েকটা পোড়া ইট ইতস্তত ছড়িয়ে আছে উঠোনের মতো খোলা জমিতে। কিছুটা ঠান্ডা ছাই আছে ইটের পাশে, কেউ অস্থায়ী উনোন বানিয়েছিল হয়তো।

রঘু জানে—এটা ওদের গোপন জায়গা। হাইডআউট। সাময়িক লুকোনোর। রঘুকে এখানে থাকতে হবে অন্তত তিন-চারদিন।

একটা খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে রঘু। পুলিশ ওর পুরো নাম পায়নি। শুধু এতটাই খবর পেয়েছে—বিশ একুশ বছরের 'লিখাপড়া' একটা ছেলেও ঐ দলের সঙ্গে ছিল।

যখন অন্যদলের ওয়াগন ব্রেকারকে চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে দুই বগির মাঝখানে ফেলে দিয়েছিল ইনারদেও আর টাকলামুনির, সেদিন রঘু ছিল না ওদের সথে।

সেই চত্বরে প্রায়ই ওঠাবসা একসাথে করে বলেই রঘুর কথা কেউ বা কারা পুলিশকে বলেছে হয়তো—এমনি অনুমান বুলনের।

খবর পেয়েই রঘুকে হোস্টেল থেকে তুলে এনেছে বুলন মোটর সাইকেলে। বলেছে.

—জলদি চল। বহুৎ ফেরা হয়ে গেছে। তোকে সরতে হবে এখনি। আমার কথা মানিস না তো। এখন দ্যাখ্ ঝামেলা।

রঘু বলেছে,

—কেন, কী হয়েছে?

—খুন।

—খুন!

—হুঁ।

—কে?

—মোহন

—মোহন কে?

—দুসরা টৌলির লোক।

—কে খুন করেছে?

—সব শুনে তোর কাজ নেই।

রঘু আপত্তি করে,

—আমি পালাতে যাব কেন?

—তোকে ধরতে পারে।

—কে?

—পুলিশ।

—আমি কিচ্ছু করলাম না। ধরলেই হল?

—সে সব পরে হবে। পুলিশে ধরলে জানিস তো?

রঘু বলল,

—হ্যাং ইত্তর পুলিশ। হু কেয়ারস্? আমি স্টুডেন্ট। ইউনিয়নের ওয়ার্কিং কমিটিতে আমিও আছি। কারণ বারণ ছাড়া অ্যারেস্ট করলে কী হবে জান?

জানি রে ভাই।

রঘু বলল,

—কিচ্ছু জান না। সারা জিল্লার একুশ হাজার বিদ্যার্থী থানা জ্বালিয়ে দেবে। ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের ইয়ার্কি?

বুলন বলল,

—সব জানি। পুলিশের চেয়ে বেশি ভয় কী জানিস?

—কি?

—পুলিশ ধরলে তুই যদি সব উগলে দিস?

—কী? কী ভাব তুমি?

—আমি ভাবি না রে রঘু।

রঘুর মাথার সব সলতেয় বারুদ। প্রায় চেঁচিয়ে বলল,

—কোন শালা ভাবে? দাঁত খুলে নেব। কারা ভাবে?

—গণপৎ, ইনারদেও যদি ভাবে এমন?

রঘুর মাথায় দাবানল। বলল,

—ওরা হতে পারে দাদা। কিন্তু ওরা জানেনা, স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারের সাথে উল্টা-পাল্টা করলে কী হাল হয়?

বুলন বোঝায়,

—জানি বলেই তো এমন করছি।

—জান না তুমি। শুনে রাখো। ওদের জানাও। যদি আমি আমার উইংকে খবর দিই, কী হবে জান?

বুলন মাথা নাড়ে। শান্ত করে,

—জানি রে।

—জান যখন বলছ কেন?

—আমি চাই না ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িস তুই। তোকে এসব থেকে দূরে রাখতে চাই গঙ্গা কসম। তোর মাথা গরম তো। এদিকে গণপতের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুলসীকে কী জবাব দেব?

—মানে? আমাকে মারবে? মারুক।

বুলন বলল,

—উফ! কাকে বোঝাই। মগজ তো নয়। কামারের ভাট্টি। এখন একদম চুপ। আমি যা বলছি সব করবি।

—আর হোস্টেল?

—পরে দেখা যাবে ওসব। তোর ঝা-স্যার আছেন তো।

—তা আছেন। ছুটি দেখিয়ে দেবো তিন চারদিনের।

-ঠিক।

রঘু বলল,

—সারাদিন থাকতে হবে যেখানে নিয়ে যাচ্ছ?

—না!

—তো?

—সন্ধ্যায় জুটমিলের গোদামে নিয়ে যাব।

—জুটমিলের গোদামে?

—হুঁ। ওখানে থাকবি।

—কতোদিন?

—দু-তিন দিন, বেশি না। এরপরও যদি সব ঠান্ডা না হয়, তোকে গোরখপুর পাঠিয়ে দেব।

রঘু গরম হয়ে যায়। বলল,

—নন্‌সেন্স! কিচ্ছু করলাম না। এখন ভাগৌড়া হয়ে গেলাম।

বুলন বলল,

—দেখলি তো? সেইজন্যেই বলতাম, আসিস না আমাদের কাছে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। পুলিশের কাছে যাব। বলব পুলিশকে, আমি ছিলাম না। কেন খোঁজা আননেসেসাবী আমাকে?

মোটর সাইকেলের হ্যান্ডেলে জোর থাপ্পড় মেরেছে বুলন। ধমকেছে,

—তোর এত তেজ মগজে রাগের মাথায় সব ভুসা। চুপচাপ বোস্ বুরবক। যা করার আমি করব।

তাই এখানে, এই পাটখেতের অদ্ভুত হাইডআউটে আসা। বুলন কোনও আঁচ লাগতে দেবে না রঘুর গায়ে। বলেছে,

—প্রমাণ করে দেব যেমন তেমন, গত পনেরো দিন থেকে তুই আছিস গোরখপুরে আমার চচেরা ভাইয়ের বাসায়।

রঘু বলল,

—তোমার মাথায় গোবর আছে।

—কী?

—হোস্টেলের অ্যাটেড্যান্স রেজিস্টারে কী আছে জান?

ওখানে পুরো রেকর্ড আছে—আমি হোস্টেলে ছিলাম। সমঝে তুম?

বুলন বলল আস্তে, কঠিন স্বরে,

—তুই এখনও আমাকে চিনিস না। দরকার পড়লে হোস্টেলের সব কাগজ গায়েব করে দেব। রেজিস্টার তো কিয়া চিজ্। তোকে একটা অনুরোধ।

রঘু বলল,

—কী অনুরোধ?

—দয়া করে তোর মাথার আগুন ঠান্ডা রাখবি।

রঘু কারণ বারণ ছাড়া হাসল। চেঁচাল,

—ইয়াও!

বুলন অবাক। বলল,

—চেঁচাস কেন?

—মজা! থ্রিল!

—কিয়া মজা?

—এই আন্ডার গ্রাউন্ড জিন্দ্‌গি। সব আসবে ফিল্মে।

বুলন মাথা চাপড়ায়। নিজেকেই যেন বলে,

—কিয়া ইন্সান হ্যায় রে! কিস ধাতুকা বনা হ্যায় ইয়ে অজিব লড়কা! সব কুছ মে ফিল্লম!

রঘুর বুক ফুলে বিশাল দেয়ালের মতো। পরিস্থিতির পরিণামজ্ঞান থাকলেও কুছ-পারোয়া নেহি ভাব বিদ্যমান।

হাতে লোফালুফি করে খুবই দামি, সোফিস্টিকেটেড হাতিয়ার —এমন নাচাচ্ছে, যেন ড্যান্সিং ডল্। একবার সাবধান করেছে বুলন,

—এ, সামলে। ফায়ার হয়ে যেতে পরে।

রঘু ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট আবার। বলল,

—ডরো মত্। সেফটি ক্যাচ্ অফ্ আছে। হ্যামার লক্।

বুলন ইটের উনোনে চার জল গরম করছিল। রঘুর বিশেষজ্ঞ মতামত শুনে হাসল। বলল আস্তে,

—সব জানে, সব জানে রঘু উস্তাদ। পড়াশোনা নেই। খালি ঝামেলায় আছে।

রঘু বলল,

—কী বলছ?

বুলন বলল,

—আমার মুন্ডু বলছি।

রঘু বেজার। বলল,

—কী বড়কাভাইয়া। এত বিরক্ত কেন? আমার জন্যে তোমার দিগ্‌দারি হলো, তাই না?

এখানে চায়ের সরঞ্জাম আছে।

সে-সব জোগাড় করে চা বানাচ্ছে বুলন। দুটো কাচের গ্লাসে লিকার ছাঁকছে একমনে। পাগলের কথার জবাব দেয়ার কোনও মানে নেই। আবার হয়তো বলবে, 'ইয়াও, পুরা ফিল্লম।

রঘু চুপচাপ নেই। বলল,

—এ বুলনজি।

—কী?

রঘু বলল,

—তোরা ফেললি তো ফেললি একেবারে ট্রেনের তলায়। দুচারটে ফুল-স্ট্রোক পাঞ্চ ঝেড়ে দিলি না কেন থুবড়ায়? দু-একটা দাঁত খুলে যেতো। আসলে, এদের সেন্স্- অব-প্রোপোরশন নেই। শালা, এখন মর। মাঝখান থেকে আমি-ও লাফ্ড়ায় পড়লাম। অ্যানি-ওয়ে।

বুলন কোনও কথা না বলে চায়ের গ্লাস দিল রঘুকে।

এ এমন এক জায়গা, যেখানে ওরা দুজন এখন আছে—হেলিকপ্টার থেকে শুধু দেখা যেতে পারে ওদের যদি উপর দিয়ে উড়ে যায়। অন্তত আধকিলোমিটার বিস্তার। পাটগাছের খেত। গাছগুলো ভেঙে-ভেঙে আসতে হয়েছে এখানে। বুলন মোটর সাইকেল রেখেছে রাস্তার কালভার্টের তলায় এমনভাবে—কেউ দেখতে পাবে না ভালো করে লক্ষ না করলে।

রঘুর ডানহাতে পিস্তল। বলল,

—কটা কার্তুজ আছে?

বুলন বলল,

—পুরা লোড্। দশটা।

—চালাই?

—না।

—প্লিজ বড়কাভাইয়া।

একটু চিন্তা করল বুলন। বলল,

—পারবি?

—থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল চালিয়েছি।

বুলন বোঝায়,

—এটা পিস্তল। দেখতে সোজা মনে হলেও একটু হুঁশিয়ার হয়ে চালাতে হয়।

—কী হুঁশিয়ারি?

বুলন বুঝিয়ে দিল,

—চালাবার সময় কনুই টান করে হাত সামনে না-ধরলে ট্রিগার দাবাতেই কার্তুজ সোজা তোর কপালে ঢুকে যাবে। সমঝা তু?

রঘু বলল,

—জানা আছে।

বুলন রঘুর কথায় অবাক হল। বলল,

—তা-ও জানিস?

—ইয়েস উস্তাদ। এলবো টান করে চালাতে হয় রিভলবার পিস্তল দুটো পুঁচ্‌কে হাতিয়ার।

বুলন আর কী করে? রঘুর স্বভাব জানা আছে ওর। কথা বলতে-বলতে হয়তো হঠাৎ ট্রিগার টেনে দেবে এই ছোকরা। তাই বলল,

—আচ্ছা চালা। ওদিকে। ডানদিকে। আগে সেফটি ক্যাচ ঘোরা সামনে। হাত উপরে তোল। কব্জি শক্ত করে মজবুত হাতে পিস্তলের বাঁট ধরবি। ঢিলা ধরলে হাতিয়ার হাত থেকে পড়ে যাবে।

রঘু বলল,

—সেফটি ক্যাচ্ ঘুরিয়েছি অনেক আগে।

—কী? তুই আগেই রেডি? যা ভেবেছিলাম!

—ইয়েস বস্। শুধু তোমার অর্ডারের অপেক্ষায় ছিলাম।

বুলন তাকায় একদৃষ্টিতে। বলল,

—কোনও চিন্তা নেই তোর?

—কী চিন্তা?

—খুনের সন্দেহের লিস্টে তুই-ও আছিস।

—মিথ্যে সন্দেহে গুরুত্ব দিয়ে কী লাভ? অ্যানিওয়ে, বলো, ফায়ার করি?

বলেই বাঁ-হাতে পিস্তল নেয় রঘু। সামনে তুলে প্রসারিত করে বলিষ্ঠ হাত। টার্গেট

কিচ্ছু নেই। তবু, একটা পাট গাছকে টার্গেট স্থির করল

ব্যারেলের ডগা ও রঘুর বাঁ-চোখ এক সরলরেখায় এখন।

বুলন নির্দেশ দেয়,

—দাবা ট্রিগার।

রঘু ট্রিগারে চাপ দেয় তর্জনীর। পিস্তলের হ্যামার আঘাত করে চেম্বারের কার্তুজ।

'ঘুট'—চাপা শব্দ। টার্গেটের অন্তত পাঁচ-ছয় হাত উপরে অন্য এক গাছের ডগার ডাল ভেঙে নেতিয়ে গেলো। জ্বলন্ত বুলেট ছুটে গেছে পাটবনের ভেতরে, অন্তত পঞ্চাশ গজ। রঘুর টান হাত বুলেটের জোরালো থ্রাস্টে উপরে উঠে গেলো কিছুটা।

হাল্কা গন্ধ পোড়া বারুদের। অল্প কালো ধোঁয়া। ইংলিশ পিস্তলের ব্যারেল একটু গরম। রঘু অবাক। বলল,

—তাজ্জব!

—কী?

রঘু আবার বলল,

—কৌই ধমাকা নেহি! নো সাউণ্ড! বিল্ট-ইন সাইলেন্সার আছে।

বুলন বলল,

—অন্দর সাইলেন্সার হ্যায়।

রঘু বলল, উচ্ছ্বাস ও প্রথম হাতেখড়ির উত্তেজনায়,

—আই নো। আই নো। ভেরি সোফিস্টিকেটেড গান। জিনিসটা হাতে নিয়েই মনে হয়েছে তখন।

বুলন বলল,

—দে, ওটা।

—না।

—কী? দে জলদি।

রঘুর বালক-সুলভ জেদ, যাকে বুলন বলে—কুত্তার লেজ। ত্যারা তো ত্যারাই।

রঘু বলল,

—না, না। আগের নিশানা ফসকে গেছে। আবার চালাই। ওন্‌লি ওয়ান।

বুলন বাধা দেয়,

—না। সব কার্তুজ খালি করে দিবি তুই। দে।

রঘু দৌড়ায় সামনে। বুলন পিছনে, যেন দুই বালকের লেবেনচুসের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি।

বুলন ধমকায় আবার,

—দে রঘু।

রঘুর একই কথা,

—ওয়ান মোর প্লিজ।

রঘুর সঙ্গে সঙ্গত করে ঠারে-ঠোরে বেশ কিছু ইংরেজি বুলন বোঝে। বলল,

—কৌই ওয়ান্ মোর নেহি।

কথা বলতে বলতে, দাপাদাপি করতে করতে রঘু আবার ফায়ার করে।

এবার কার্তুজ প্রায় সোজা উঠে যায়—খোলা আকাশে। অন্ধকার আকাশ হলে দেখা যেত জ্বলন্ত সিসা।

বুলন ধমকায়,

—এক ঝাপড় খাবি।

বলেই পিস্তল কেড়ে নেয় বুলন। দুজনেই স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এবার বুলনের ডানহাতে চকচকে দামি শস্ত্র।

সহসা, একেবারেই আচমকা, বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায়, বেতের মতো হিলহিলে দৃঢ় শরীরের রঘু ফ্লাইং কিক্ মারে বুলনের কোমরে। বুলন পড়ে যায় মাটিতে, কয়েক ফুট দূরে। এত তাগড়া শরীর সত্ত্বেও পিস্তল ছিটকে গেছে ডানদিকে অন্তত তিন চার হাত দূরে, ইটের চুলোর ছালির ওপর।

রঘু পিস্তল তুলে নেয়! বুলনের দিকে তাগ্ করে বলল,

—নাউ গেট আপ।

বুলন তখনো একই ভাবে পড়ে আছে। বিস্ময়ের শেষ সীমা লঙ্ঘন করেছে। স্থির দেখছে রঘুকে।

রঘু বেজার, যদিও- হাসছে। বুলন বলল একসময়,

—এমন করলি কেন? মাথায় বেশি গর্মি চড়েছে তোর। বরফ ঢালতে হবে।

দমকা বাতাস দিচ্ছে এখন। পাটবনে হাওয়া ও পাতার শব্দ। পাট পাতার ঘ্রাণ। বাবুদের গন্ধ এই উদাম বাতাসে কখন মিলিয়ে গেছে।

বুলন হাত বাড়াল। রঘু টেনে তুলল ওকে। বলল,

—লাগেনি তো বড়কা ভাইয়া?

—লাগেনি মানে। সাইডকিক মারলি কোমরে এত জোরে। ইনারদেও হলে ওর কোমরের হাড় ভেঙে যেত। বহুৎ জান্ তোর পায়ে। কিন্তু এভাবে মারলি কেন?

কোনও কথা না বলে রঘু ওর স্বভাব অনুযায়ী এক কাজ করল; হঠাৎ উবু হয়ে বুলনের দুপা স্পর্শ করে নিজের কপালে ঠেকাল। বুলন বলল,

—একী রে! কী করছিস রঘু?

রঘু কাঠ-কাঠ, নির্বেদ স্বরে বলল,

—আরে ইয়ার বড়োভাই তুমি, গুরুজন। আমার পা লাগল যে তোমার শরীরে।

পরীক্ষা করলাম আর কী। কিন্তু, ইউ আর স্লো এণ্ড ল্যাজি। আরো চোস্ত হবে। কেউ অ্যাটাক করলে এভাবে ডিফেন্স করবে? হাতে হাতিয়ার থাকলেই হয় না। কিয়া সমঝে?

রঘুর দেওয়া শারীরিক প্রক্রিয়ার পাঠে নয়, একেবারেই বিরল এক মানবিক পাঠে আবার মাটিতে বসে পড়ল সেই বুলনিয়া। দুচোখ চকচক করে অসহনীয় আবেগে! বলল ধরা গলায়,

তু কৌন্‌রে রঘু!

এবারো হাসে ভেতরের সমাহিত রঘু আস্তে, নিঃশব্দে।

বুলন বলল আপ্লুত কণ্ঠে,

—আমায় বড়োভাই বললি? প্রণাম করলি? যা কেউ আমায় কোনোদিন করবে ভাবিনি। তুলসী ঠিকই বলে।

রঘু বলল

—কী? কী বলে?

—তোকে নিয়ে ওর খুব চিন্তা। আমারও।

রঘু বলল,

—কেন?

বুলন বলে,

—জানি না এতটাই জানি, তুই অন্যরকম।

অন্তর্লীন রঘু তখনো হাসে আর স্তব্ধ কণ্ঠে চলে যায় শাশ্বত বাক্য,

—আমি জানি তোমরা কেন ভাব। মানুষ মানুষের জন্যেই ভাবে। রঘু, তুলসী, তুমি—সবাই একসূত্রে গেঁথে আছ। থাকবে আজীবন।

বুলন যখন বুলনিয়া, তখনই চোখে জল। সবকিছু বুঝেও বাইরের রঘু বলল,

—কাঁদ কেন? কোমরে লেগেছে খুব?

বুলনও সবকিছু বোঝে। কোমরের চোট কিচ্ছু না। ভেতরে যে চোট দিল রঘু—একে আঘাত বলে না। কী বলে? বুলন ভাবে—সংসারে এমন আঘাতের এত অভাব কেন—যা দিল একটু আগে রঘু নামক এই মূর্তিমান অস্থিরতা।

রঘু আবার কপট প্রশ্ন করল,

—কিয়া উস্তাদ? খুব লেগেছে?

বুলন ভরপুর জবাব দিল কপট যন্ত্রণায়,

—লেগেছে মানে! এখনও কন্‌ কন্‌ করেছে। টেনে তোল। অনেক ভোগাবে তোর লাথির আঘাত।

রঘু পিস্তল ছুঁড়ে দিল বুলনের কোলের উপর অবহেলায়। এখন আর তেমন আকর্ষণ নেই। মাথায় চেপেছিল—পিস্তল চালাব। চালানো শেষ, সুতরাং শখও শেষ।

নিতান্ত অবহেলায় বলল,

—নিজে ওঠো বুলনপ্রসাদ। নেহিতো ডুব মরো চুল্লুভর পানিমে। শালা, এই পাটখেত, জুটমিলের গোদাম, না গোরখপুর—কোথায় থাকব ঠিক নেই। কতদিন এভাবে চোরের মতো থাকতে হবে? হেস্টেলে বাবার ফোন এলে সুপার যদি বলে দেয় আমি ছুটি নিয়েছি। তখন বাবা ভাববেন—আমি বোধহয় লাখনৌ যাচ্ছি। ওহ্ শিট্। ঝামেলা হবে বাবার সাথে। বলবেন—ছুটি নিলে কেন? না গেলে ভাবেন—রাস্কেলটা আবার গেল কোথায়? বাবা যদি এখন ট্যুরে পুনা কিম্বা দেরাদুন চলে যান, নো প্রোবলেম।

নিজে-নিজে সমস্যার মনগড়ন সমাধান বের করে নিশ্চিত হয়ে গেল রঘু। বলল,

—খিদে পেয়েছে, কিছু খাব বড়কা ভাইয়া।

বুলন বলল,

—এখানে দুধ ছাড়া-চা, ব্যস্। এছাড়া কোনও খাদ্য নেই। খাবি আর সন্ধের পর।

—থোড়া পানি মিলেগা?

—পানি?

—হ্যাঁ, এই দ্যাখো, পেট বিলকুল খালি। চুপ্‌সে গেছে।

রঘুর অসহায় কথা শুনে খচখচানি হয় বুলনের বুকে।

সামনে আসে রঘুর। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলে বুলন,

—খুব খিদে পেয়েছে রে?

—হ্যাঁ বড়কাভাইয়া।

—আচ্ছা রাখ, আসছি।

বলেই এগিয়ে যায় বুলন পাটখেতের দিকে। রঘু বলল,

—কোথায় যাচ্ছ?

—খাবার আনতে।

—এখানে কোথায় খাবার পাবে?

—পাব। তুই অভুক্ত আর আমি চুপচাপ বসে থাকব? তুই থাক। আমি আসছি। গন্ডগোল করবি না।

অন্তত পনেরো মিনিট পর রঘু মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনল। শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। রঘু বুঝল—বড়কাভাইয়া ছোটকাভাইয়া আহারের সন্ধানে কোথাও গেল এইমাত্র।

সূর্য ঢলছে পশ্চিমে। যেখানে এখন একা বসে আছে রঘু , ছায়া পড়েছে দীর্ঘ, পাটগাছের। ইটের অস্থায়ী উনোনে তখনো একটু আঁচ।

চায়ের শূন্য দুটো গ্লাস ও সসপ্যান পড়ে আছে। অদূরে দেশলাই।

অজস্র পাখি ডাকে এখানে—

চিচির-চিচির-চিচির-চিচির। বিরাম নেই।

উপরে তাকায় রঘু—শাদা শাদা হাল্কা মেঘ।

দূরের হাইওয়ে, ট্রাকের শব্দ। হারমোনিয়ম হর্ন বাজে ছুটন্ত ট্রাকের।

একা-একা সময় তো কাটে না। ধূর! এর চেয়ে জেল অনেক ভালো। বুঝে শুনেই আগেকার দিনে অপরাধীকে একা নির্বাসনে পাঠাত। মানুষ ছাড়া, সঙ্গীবিহীন থাকার মতো বড়ো দণ্ড আর কিচ্ছু নেই। যতই তোমার আশেপাশে অজস্র গাছ, মাথার উপর আকাশ থাকুক না কেন? মনমতো মানুষের সঙ্গ পেলে একচিলতে পরিসরে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বানানো যায়।

নেহা যদি থাকত এখন এখানে? আরে না না! এখানে পৌঁছোনোর পরিস্থিতিতে যেতেই দিতনা ঐ শান্ত, অনুশাসনপ্রিয় মেয়ে।

নেহা, তুমি যদি দেখতে বা জানতে আমি এখানে এখন? খুব চিন্তা হত তোমার? তুমি ভীষণ রেগে যেতে, আমি জানি। আমায় এখন শুনতে পাচ্ছ তুমি?

আমার মনে হয় শুনতে পাও। নিশ্চয়ই পাও। আমি তোমায় শুনি। রোজ শুনি। তুমি ডাকছ, পরিষ্কার শুনি।

—'রঘু, কাম হিয়ার। গলে যাচ্ছে আইসক্রিম। তাড়াতাড়ি এসো। রঘু-উ-উ-উ!'

তোমার আমার এ অনন্ত আইসক্রিম কোনোদিন গলে গলে নিঃশেষ হবে না নেহা।

আচ্ছা গো, ঐ যে, বাবলা গাছের ধারে পোড়ো এক হাভেলি ছিল। যেখানে আমি যেতাম দুপুর বেলা বাবলাগাছের ডাল আনতে। তুমি আসতে প্রায়ই আমার পেছন-পেছন। বাধা দিতে,

—রঘু, ডোন্ট গো দেয়ার।

—হোয়াই?

—দ্য প্লেস ইজ ফুল অব্ স্নেক্স্। ভীষণ সাপ ওখানে।

তোমার সব মানা আপত্তি উপেক্ষা করে আমি তবু যেতাম। তুমিও আসতে আমার সঙ্গে। আমার ডান হাত ধরে হাঁটতে। তোমার পরনে থাকতো— কোনোদিন সাদাজমিতে হালকা-হলুদ ছোটো-ছোটো ফুলের ছাপ দেয়া ফ্রক। ঘাড় অব্দি রেশমি চুল, বাতাসে ঢেউ খেলত ভীষণ। মনে হত, রোজ চুলে শ্যাম্পু দিয়েছো। কোনোদিন গোলাপি মিডি পরতে তুমি। পায়ে কোলহাপুরি। তোমার বাঁ-হাতের ছোট্ট রিস্টওয়াচ এখনো মনে পড়ে আমার। এতই ছোটো ছিল যে আমি বলতাম,

—নেহা, এঘড়িতে সময় দেখতে হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগবে।

তুমি হেসে বলতে,

—নেবে আমার ঘড়ি?

আমি বলতাম,

—না।

—না কেন? নাও না। আমি দিচ্ছি।

—ধুর, লেডিস ঘড়ি।

তুমি বোঝাতে,

—লেডিস-জেন্ট্স্ সব সমান। সব ঘড়িতে একই সময়।

আমি মানতাম না। নিতাম না। তুমি ক্ষুণ্ণ হতে। তারপর বলতে,

—রঘু, বড়ো হয়ে যেদিন চাকরিবাকরি করব, তোমাকে তোমার পছন্দমতো ঘড়ি কিনে দেব। সময় দেখবে।

আমি আজও সময় দেখি নেহা। আমার কব্জিতে এখন অন্যঘড়ি। ওতে সময়ের নির্দেশ আছে। নিন্তু, তোমার বলা সময়ের চিহ্নবর্ণ নেই। কোনদিন সময় হবে নেহা?

মনে আছে তোমার, সেই ভাঙা খন্ডহরের পুরোনো ইটের স্তূপে দাঁড়িয়েছিলাম তুমি-আমি? বিকেল সাতটা। পুনায় এমন সময়ও সূর্য অস্ত যায় না। তোমার পরনে ছিল কচি-কলাপাতা সবুজ কুঁচি দেয়া ফ্রক, অসংখ্য সাদা প্রজাপতির ছাপ পুরো জামায়। তোমার গায়ের রং আর পড়ন্ত রোদের রঙে কোনো ফারাক ছিল না। আমি একটা পাথর তুলে লোফালুফি করছিলাম, হাত ফস্কে পড়ল তোমার কপালের বাঁদিকে। তারপর রক্তে তোমার জামা, আমার হাত একাকার। বারবার আমার একই কথা,

—সরি, আয়াম সরি নেহা!

তুমি উল্টে আমায় সান্ত্বনা দিলে,

—ইট ইজ্ অলরাইট। নো ম্যাটার। চলো, বাড়ি চলো।

কপালের বাঁদিকে ছোট্ট কাটা দাগ পড়ে গিয়েছিলো তোমার। নেহা, আজও কি ঐ দাগ আছে তোমার কপালে? আমি এখনো স্পষ্ট দাগটা দেখি রোজ।

বুলন এল পাটখেতের অনেকগুলো গাছ লন্ডভন্ড করে। প্রায় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এসেই বলল,

—আয়, খেয়ে নে একটু।

রঘু বলল,

—এত দেরি?

—হয়ে গেল আর কী?

—কতদূর গিয়েছিলে?

কথার জবাব না দিয়ে বুলন বলল,

—কী করছিলি একা-একা?

— কী আর করব? এমনি বসেছিলাম। কী খাব এখন? খিদে মরে গেছে।

বুলন বলল,

—খেয়ে নে। খেয়েই চলে যাব। অন্ধকার হচ্ছে। রাতে গোদামে চিকেন খাবি তন্দুরিসহ। রিট্জ্ হোটেল থেকে আনাব।

টিফিন বক্সের বাটি খুলল বুলন। ওতে অনেকগুলো চাপাটি এখনো গরম। ডিমসহ আলুপটলের শুকনো সব্জি। আমের আচার। ছানার সন্দেশ কয়েকটা। বড়ো বোতলে জল।

খেতে খেতে রঘু বলল,

—কোত্থেকে আনলে? খুব নরম বানিয়েছে চাপাটি।

বুলন বলল-

—যত্ন করে বানাল। তাড়াহুড়োয় আর কিছু দিতে পারেনি।

—কোন দোকান?

—দোকান না।

—দোকান না তো কে দিল?

বলল আস্তে,

—তোর তুলসী দিদি।

রঘু খুব খুশি। বলল,

—তাই তো বলি? এতো নরম চাপটি বানাবে কোনো দোকানে? হাতির কানের মতো শক্ত বানায় আমাদের হোস্টেলের কুক।

—খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। বেরুতে হবে।

—বেরোব কী? বাইরেই তো আছি সারাদিন।

—আরে ভাই। পাটখেত থেকে বেরুতে হবে। অন্ধকার হলে ঘুরে মরতে হবে পাটের বনে। টর্চ নেই।

রঘু বলল,

—ওকে কষ্ট দিতে গেলে কেন?

—কাকে?

—কাকে আবার? তোমার তুলসীকে।

—আমার তুলসী?

—ইয়েস, ইয়োর তুলসী।

—ফাজিল হয়েছিস খুব। খা জলদি।

হঠাৎ কী মনে পড়ল যেন। বুলন বলল,

—ওহো। একটা জিনিস দিয়েছে তুলসী তোর জন্যে।

—কী জিনিস?

ডানহাতে পকেট যেকে বের করে দিল বুলন। বলল,

—তাবিজ। বলেছে তোকে পরাতে। আপদ-বিপদ নাকি ছুঁতে পারবে না। নিজের গলা থেকে খুলে দিয়েছে আসার সময়।

রঘু বলল,

—তুলসীদিদি নিজের তাবিজ দিল আমাকে পরতে?

বুলন বলল,

—তো কী শুনলি এতোক্ষণ? বকল আমাকে খুব।

—কেন?

—ঐযে, তোকে কেন সাবধান করি না, এইসব আর কী?

রঘুর গলায় দলা পাকায়। চাপাটি নয়। অন্যকিছু। বলল বসে যাওয়া স্বরে,

—আর কী বলল? আমাকে-ও নিশ্চয় বকেছে?

একটু হেসে বুলন বলল,

—তা বকেছে বইকি। মাথা গরম করিস না। তোর তুলসীদিদি ভালোর জন্যে বকে।

আকাশে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই। তবু রঘুর ভিন্ন আকাশে ঐ দুই জ্যোতিষ্ক ও অসংখ্য তারার দল মিলে মিশে আলো ছড়ায়।

আর রঘুর অজান্তে রঘুরই স্বপ্নের ছায়াছবিতে তুলসীর বরাদ্দের সীমাহীন অংশে ফুটেজ দীর্ঘ, দীর্ঘতর হয়।

রঘুর খাওয়া বন্ধ। লক্ষ করে বুলন বলল,

—এ, কিয়া হুয়া?

একবার চোখ তুলে তাকায় রঘু। মাটিতে সব আহার্য রেখে গলায় পরে নেয় তুলসীর পাঠানো তাবিজ। আবার বুদ্ধ গলায় সেই একই শব্দ করে,

—এ-হে-হে-হে!

বুলন বলল

—চেঁচাস কেন?

রঘু আবার চেঁচায়,

—এ-হে-হে-হে!

রঘু জেদা। সুতরাং, মানে না কোনোমতেই।

বলল?

—কোনও কথা শুনব না। তুমি দেখাও। কাম অন, শো মি। শুট্।

বুলন বলল,

—অন্ধকার হচ্ছে। পাটের জঙ্গল থেকে বেরুতে হবে।

—আরে দিখাও। কিয়া নখ্‌রা করতে হো!

—বোলা তেরে কো। আজ নেহি।

রঘুর এবড়ো-খেবড়ো থেঁত্‌লা জেদ।

—নো। শো মি, রাইট নাউ। অভি দিখাও।

—না।

রঘু তাতায়,

—ধুর, চালাতে পার না বলো। তখনি দেখেছি, তমঞ্চা হাতে নিতেই তোমার বাজু কাঁপে।

বুলন চাপাস্থরে বলল,

—কুত্তা কা দুম। লে, ইয়ে দেখ্‌ কলাবাজি। এক কাজ কর;

—কী?

—একটা চৌঅন্নি উপরে ছুঁড়ে দে। জলদি।

রঘু একটা পঁচিশ পয়সার মুদ্রা অনেক উপরে ছুঁড়ে দিল। দিতেই ব্রিচেস থেকে পিস্তল তুলে নিল বুলন। সেফ্‌টি ক্যাচ্‌ অন্‌ করে ট্রিগার টানল। বুলেট ছিটকে গেল উপরে। অন্তত পনেরো ফুট উপরে পড়ন্ত চৌঅন্নি বুলেটের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বুলন পিস্তল রাখল আবার ব্রিচেসে।

সবকিছু ঘটল প্রায় বিদ্যুতের বেগে। কয়েক সেকেন্ডে।

বুলন বলল,

—অভ্‌ চল্‌।

হতভম্ব রঘুর হা-মুখ থেকে শব্দ বেরোল,

—সুভান আল্লা!

তারপর উত্তর বিহারিতে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ওর মতে মূল্যবান, প্রমাণপত্র দিয়ে দিল মুখে,

—তোহর নিশানা কা জবাব নেহিকে বা! বেচারা চৌঅন্নি! টুকড়া-টুকড়া হ গইল! অলিম্পিক যাও তুম। ইত্‌না সাফ তোহর নিশানা। গোল্ড মেডে্‌ল জরুর মিল যাই।

বুলন বলল,

—তোকে-ও শেখাব। এখন চল মেরে বাপ।

—শেখাবে, সত্যি?

—সত্যি।

—ইয়াও। আই ওয়ান্ট টুবি এ হাইক্লাস মার্কসম্যান!

কথা বলতে বলতে ওরা ঢুকেছে প্রায়ন্ধকার পাটখেতে।

বুলন সাবধান করল,

—আমার পেছন-পেছন আয়। তোর অস্থির কদমে হাঁটলে সারারাত পাটবনেই ঘুরবি। আমাকে ও ঘোরাবি।

রঘু বলল,

—তবে মজা হবে।

—ধুর বুরবক। সবকিছুতেই মজা। কী মজা পেলি?

রঘু আবার সাব্যস্ত। বলল,

—বকার বকার না। আগে বাড়ো। সামনে কত কাজ।

বুলন বলল,

—আচ্ছা আর বকবক করব না। কত চুপচাপ শান্ত আছিস তুই!

বুলনের স্নেহ ও ব্যঙ্গ শুনে হাসে রঘু। বলল,

—আচ্ছা বড়কাভাইয়া!

বুলন কথা বলেনা। রঘু আবার ডাকে,

—এ বুলন ভাইয়া!

বুলন নিশ্চুপ. রঘু চেঁচায়,

—এ বুলন প্রসাদ!

বুলন একমনে হাঁটে। জবাব দেয় না।

রঘু তেমনি জোরে বলল,

কী হল? কানে শুনতে পাচ্ছো না?

—পাচ্ছি।

—জবাব দিচ্ছ না কেন?

—কী করে দিই?

—কেন?

—একটু আগে যে বললি, বকার-বকার করব না।

—ওহো! ডাকলে জবাব দেবে তো?

—কী বলবি বল?

—আমি তোমার ঝামেলা বাড়িয়ে দিলাম, তাই না? তোমার কাজের ক্ষতি হল।

বুলন বলল,

—এক থাপ্পড় খাবি, উল্লুক!

রঘু হেসে বলল,

—আমাকে নিয়ে তোমার সমস্যা বুলন ভাইয়া?

বুলন শান্ত কণ্ঠে বলল,

—ছোটোভাইকে ঝামেলা থেকে বাঁচাতে বড়োভাই ঝাঁপিয়ে পড়বেই।

বুলনের কথা শুনে কুড়ি বছরের টগবগে ঘোড়া বলল অকৃত্রিম স্বরে,

—আর বড়োভাই যদি কোনো ঝামেলায় পড়ে, তোমার এই ছোটকাভাই আকাশ-পাতাল এক করে দেবে। সচ্। মা-কসম!

পাটবনের অন্ধকারে বুলন থমকে ঘুরে দাঁড়ায়। তাকায় রঘুর দিকে পলকহীন। বলে খুবই আস্তে আবেগমথিত স্বরে,

—বহুৎ বড়া দিল তেরা রঘু। ভগবান করুন, তুই যেন এমনি থাকিস চিরকাল। এখন চল। তোর কথার পাল্লায় পড়লে সব গোল্লায় যাবে।

রঘু জোরে, খুব জোরে শব্দ তোলে,

—এ-হে-হে-হে!

বুলন ব্যঙ্গ করে,

—কিয়া, এ-হে-হে-হে! শালা, রুলা দেতা হ্যায় বারবার। তোর সাথে পরিচয়ের পর লিটার লিটার পানি বর্ষেছে আমার চোখ থেকে। চল জলদি চল। বড়োভাই বলিস, কিন্তু আমার একটাও কথা মানিস না।

গোটা পাটবন দাবড়ে বেড়ানো উচ্ছল রঘু বলল,

—মানব, এবার থেকে মানব। তোমার কথা, তুলসিদিদির কথা, হিমানীজির কথা। আই প্রমিজ। হেই, লিস্‌ন্ এভরিবডি। রঘু, আয়াম রঘু। আই শ্যাল কিপ মাই প্রমিজ!

নিরিবিলি আমবাগানে বসে আছে রঘু। পাশে ভাঙ্গাড্ডু।

এখন অন্ধকার। অদূরে শিবমন্দির। মাঠের বাঁদিকে, পোড়োজমির ওদিকে অজস্র জোনাকি।

এ.টি.মেল চলে গেছে অনেক আগে। দূরে কোথাও মাইক বাজে, যেমন প্রায়ই বাজে।

আজ, এখন রঘুর প্রিয় ফিল্মি গান বাজে—'রহে ন রহে হম/মেহেকা করেঙ্গে/বনকে কলি/বনকে শবা/

কোন গানে মন নেই রঘুর। গানের ক্ষীণ শব্দ-দূর থেকে ভেঙে আসে। কিছুই শোনে না এখন।

দুপুর থেকে একইভাবে বসে আছে এখানে। রোদ মিলিয়েছে, সূর্য অস্ত গেছে, পাখিরা ঘরে ফিরেছে। তবু রঘু যায়নি কোথাও। এক জায়গা, একই গাছতলায় স্থির। রঘু যখন স্থির হয়, তখন কঠিন বরফের মতো জমে যায়, এ-ও ওর স্বভাবের এক ভিন্ন রূপ।

খুঁজতে খুঁজতে বিকেলের পর ভাঙ্গাড্ডু এসেছে এখানে। সে-ও জানে সব বৃত্তান্ত।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির ধ্বনি। হাতে ঘন্টি, ডানহাতে প্রদীপ নিয়ে গোটা চত্বরে আলো দেখান পুরোহিত দুবেজি। অন্য আরো একজন নাকাড়া বাজায় একটানা। কুয়োতলায় চান সেরে গিরি পহেলওয়ান যোগাসনে বসেছে। আরো কয়েকজন সাধুসন্ত, ভক্তজন নাম গান

গায়। একই স্বরে— 'জয়জগদীশ হরে ...! রোজই এমন হয়।

যেভাবে রোজ থাকে— আজও আকাশে অসংখ্য তারা। আকাশের মাঝামাঝি এদিক-ওদিক দুধেল ছায়াপথ—আকাশগঙ্গা।

কালোবর্ণের রাতচরা এক পাখি উড়ে গেল আকাশ চিরে।

এখন কোন পক্ষ—শুক্ল না কৃষ্ণ, রঘু জানে না।

যে-কোনো পক্ষই হোক আজ সবকিছু আলোহীন, রঘুর কাছে। নিঃসীম অন্ধকারই ধ্রুব-সত্য।

সময় গড়ায় নিজের মতো। জোনাকি ওড়ে আলো বিলিয়ে। রাত বাড়ে মাঝরাতের দিকে। বাতাস বয় আপনমনে। কেউ থমকে যায় না।

যায়—একজন যায়। রঘু। অবশ হয়ে যায়।

একসময় ভাঙ্গাড্ডু বলল, স্মিতস্বরে,

—রঘুভাইয়া।

—হুঁ।

—চলো।

—কাঁহা?

—রাত হ গইল। হোস্টেলে যাবে না?

লম্বা শ্বাস ছাড়ে রঘু। বলে,

—যাব।

আরো কিছুটা সময় কাটে চুপচাপ। সময় শব্দহীন গড়ায়।

দূর স্টেশনে ট্রেনের হুইস্‌ল ভাসে হাওয়ায়।

রঘু বলে শান্ত কণ্ঠে,

—ভাঙ্গাড্ডু।

—কী ভাইয়া?

রঘুর বিদীর্ণ বুক থেকে শব্দ বা হাহাকার উত্থিত হয় বাতাসে,

—এক সচ্চা ইনসান চলা গয়া রে হর হমেশা কে লিয়ে।

রঘুর কণ্ঠস্বর নেই। গলা বসে যায়। ভাঙ্গাড্ডুকে সংক্রামিত করে রঘুর পাঁজর ওগলানো শব্দ।

ভাঙড্ডু মথিত স্বরে বলে,

—তোমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। কে এমন কাজ করল রঘুভাইয়া?

রঘু বলল আক্রোশে,

—জানলে কি আর জ্যান্ত রাখতাম ওদের? নিজের লোক, বিরুদ্ধ দলের লোক, যে কেউ হতে পারে।

ভাঙ্গাড্ডু বলল,

—কভ গয়ে থে বুলনজি শিলিগুড়ি?

একটু চিন্তা করে রঘু বলল,

—আজ তো শনিবার। গত মঙ্গলবারে গিয়েছিল।

ভাঙ্গাড্ডু বলল,

—তোমার সাথে শেষ কবে দেখা?

—গত রোববার সকালে টেলিফোন অফিসের সামনে। মোটর বাইকে যাচ্ছিল কোথাও। আমাকে দেখেই জোরে চেঁচিয়ে বলেছিল—মঙ্গলবার শামকো সিলিগুড়ি যাউঙ্গা। কিছু আনব তোর জন্যে? প্রতিটি শব্দ এখনো কানে বাজে রে ভাঙ্গাড্ডু।

আবার চুপ। একসময় ভাঙ্গাড্ডু বলল,

—তারপর!

—আমি বলেছিলাম,

বলেই পুরো থমকে যায় রঘু। দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা গোঁজে নিঃশব্দে। আর কোন কথা বলতে পারে না। ডুকরে ওঠে।

কিছুসময় আরো কাটে। শার্টের হাতায় দু-চোখ মুখে রঘু বলে অসহায় গলায়:

—বলেছিলাম, কুছ নেহি চাহিয়ে ভাইয়া। তুম জল্‌দি আনা।

একটু থামে রঘু। বাঁ হাতে বুক চেপে আকাশের দিকে মুখ তোলে। দুচোখ থেকে দুই নদীর ধারার মতো জল গড়ায়।

ভাঙ্গাড্ডু দুহাতে চেপে ধরে রঘুর ডানহাত। বলে,

—মত্ রোও ভাইয়া।

রঘু আবার চোখ মোছে। বসন্তের দাগে ভরা বুলন প্রসাদের কালোমুখ স্পষ্ট চোখে ভাসে।

সেই মুখ মনে পড়তেই বুক আর ওথ্‌লায়। আবার মাথা গোঁজে দুই হাঁটুর ফাঁকে। বলে কাঁপা-কাপা ফোঁপানো গলায়,

—ঔর কভি নেহি আয়েগা বুলনজি। মার ডালা কুত্তোনে!

স্টিম ইঞ্জিনের বিলম্বিত হুইসল এখন স্পষ্ট। অদূরের রেল লাইন ধরে ছুটে যায় মালগাড়ি। এই ট্রেন ওয়েস্ট কলোনির ঐ পথের পাশ দিয়ে যাবে যে পথে একদিন ফিরে আসছিল দুজনে। যে পথে চলতে-চলতে বুলন প্রথম শুনিয়েছিল ওর বাল্যের নাম আর পঠিত 'পাহাড়া'।

রঘু মনে-মনে উচ্চারণ করে,

—বুলনিয়া, বুলনিয়া।

এই বুলনিয়া পুরোপুরি নিষ্প্রাণ হয়ে গেল শিলিগুড়ির অদূরে সুক্‌নার পথে।

ভোররাতে রাস্তার পাশে পাওয়া গেল বুলনের লাশ। তলপেটে ছোরার তিনটে ফোঁকর-সহ মাথার বাঁদিকে রডের তীব্র আঘাত।

রাত আরো বাড়ে। ভাঙ্গাড্ডু কিছু বলে না। মন্দিরের সন্ধ্যারতি শেষ।

দূরের মাইকে কোন গান নেই এখন।

রাতের বাতাসে তেমন জোরালো শব্দ না হয়ে-ও শব্দ হয়—বাতাস-বাতাসে ঘষাঘষি হয়ে বাতাসেরই শব্দ।

আমগাছের ঘুমন্ত পাতারা অনিচ্ছা সত্ত্বে ঘুমের ঘোরে নড়াচড়া করে।

আর রঘু নির্বাক বসে কল্পনা করে—গোরখপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে, খাপরায় চাল-ছাওয়া কয়েকটা দোচালা ঘর সহ এক ঝিমন্ত গ্রাম।

ঐ গ্রামে 'পাহাড়া' পড়ে এক মেধাবী বালক। যে বালক আজ মুছে গেছে। নিজেকে বড়ো অস্পষ্ট রেখে চলে গেল অনেকদূর। বহুদূর।

রঘু আনমনে বলে, ঠিক বলে না। আসলে রঘুর জিহ্বায় উচ্চারিত হয় বুলনিয়ার সেই বিলীন নামতা—'দো ইক্কম দো/দো দুনে চার'

রঘুর অশ্রুর ভরা-জোয়ার বাঁধহীন আবার। রাতের আকাশ, নক্ষত্র, বাতাস, গাছের পাতার সরসরানি, ভাঙ্গাড্ডুর স্নেহস্পর্শ—কেউ সামলাতে পারে না।

ভাঙ্গাড্ডু রঘুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রাখে। রঘু নিঃশব্দে কাঁদে। কিচ্ছু বলেনা আর। কিছুই বলার থাকে না।

হোস্টেলে যায়নি রঘু। সারারাত বসে থাকে ভাঙ্গাড্ডুর দাওয়ায়।

দু একটা পাখি এদিক ওদিক ওড়ে। আকাশ ফর্সা হয় একটু। খোঁটায় মাথার ঠেস দিয়ে রঘু বসে আছে। পাশে ঘুমন্ত ভাঙ্গাড্ডু।

কুয়োতলায় মুখহাত ধুতে যায়। জল ছিটায় চোখেমুখে। ডানহাতে মুখ-চোখ-গলায় জল বোলায়। হাতে লাগে তাবিজ।

তাবিজ! তাবিজের স্পর্শে এতোক্ষণে মনে পড়ে তুলসীর কথা।

তুলসী দিদি কি জানে? ও কি করছে এখন এসব মনে পড়তেই সব অবসাদ ঝেড়ে ঝুড়ে জোরে ডাকে রঘু,

—এ ভাঙ্গাড্ডু, ওঠ্ তাড়াতাড়ি।

প্রবল চিৎকারে চমকে ওঠে ভাঙ্গাড্ডু। বলল,

—কী রঘুভাইয়া?

—চল্ তাড়াতাড়ি।

—কোথায়?

—তুলসীদিদির ওখানে। চল, সময় নেই। ও একা হয়ে গেছে। ওকে আনতে হবে, এখনি।

বলেই দৌড়ায় রঘু আধা অন্ধকার, আধা আলোয় মোড়া মাঠের দিকে। গন্তব্য একটাই—তুলসীদিদি।

গতকাল শ্যামাটকিজে নূন-শোর পর যখন ফিরে আসছিল হোটেলে, গাঁজাগলির মোড়ে পৌঁছতেই দূর তেকে ইনারদেও ডাকল,

—রঘুভাইয়া, দাঁড়াও একটু।

রঘু লক্ষ করেছে ইনারদেও-র বিধ্বস্ত চেহারাছবি। কাছে আসতেই বলল,

—কী ব্যাপার ইনারদেও ?

ইনারদেও বলেছে,

—তোমার হোস্টেলে গিয়েছিলাম একটু আগে। পাইনি তোমাকে। কোথায় গিয়েছিলে ?

রঘু বলেছে,

—কেন, কী হয়েছে ? তুমি নার্ভাস কেন ?

—একটা বাজে খবর আছে রঘুভাইয়া।

—বাজে খবর ? কী খবর ?

—গজব হয়েছে !

—গজব ! আবার খুন উন কি ?

চারদিকে তাকিয়ে ইনারদেও আবার বলেছে,

—আহিস্তা। আস্তে বোলো।

—ধূর ! কী হয়েছে বলবে তো।

—তুমি ঠিক ধরেছ রঘু। খুন।

—খুন ? আবার ?

—হ্যাঁ।

রঘু বলেছে,

—আমাকে আবার পালাতে হবে তুমি বলছো ?

—আরে না না। এই লফ্‌ড়ায় তুমি নেই।

—তো আমাকে জানালে কেন ?

—তোমাকে জানানো দরকার তাই।

রঘু বিরক্ত। বলেছে,

—হোয়াট ননসেন্স ! সাফ-সাফ বলো কী হয়েছে ?

ইনারদেও বলেছে আরও চাপাস্বরে,

—অন্য আরো বড়ো ব্যাপার।

—অন্য বড়ো ব্যাপার মানে ! হোয়াট হ্যাপেন্ড ? কিয়া হুয়া ?

ইনারদেও বলেছে,

—ওদিকে চলো।

গাঁজাগলির শেষ মাথায় বুড়ো গাছ ইমলির। পাশে রেলের দোতলা লম্বা কোয়ার্টার। ডানদিকে রেলের জিমনাসিয়াম।

গাছের তলায় নিয়ে গেল রঘুকে ইনারদেও। একটু দম নিয়ে আবার চারদিক লক্ষ্য করে বলেছে,

—বড়ো বাজে খবর রঘু! বহুৎ দর্দ্‌নাক!

—বলবে তো আগে কী হয়েছে?

—মেরে ফেলেছে।

—কে মেরে ফেলেছে? কাকে মেরে ফেলেছে?

ঢোঁক গিলল ইনারদেও।

তারপর বলল আরো আস্তে,

—বুলনজিকে।

রঘু প্রায় চিৎকার করল,

—কী!

রঘুর মাথা-মগজ ঝাঁ-ঝাঁ করে। কোনোমতে বলেছে তখন,

—কোথায়?

—শিলিগুড়ি। অকশনের সিন্ডিকেট মেম্বার ছিল বুলনজি। অকশনে গিয়েছিল।

—কারা মেরেছে?

ইনারদেও বলেছে,

—এটাই মুস্কিল। স্পষ্ট বোঝা যায়না। মুনিমজি মহাশয়তান। ওর পেটে কী মতলব কেউ জানে না। এটা আমার সন্দেহ। না-ও হতে পারে।

রঘুর মাথায় দপ-দপ করে আগুন।

বলেছে কঠিন, হিংস্রস্বরে,

—সবাই মিলে খুঁজে বের করি চলো। তুলে এনে টুকরো-টুকরো করে কোশিতে ফেলে দেব, হাউ ডেয়ার!

উত্তেজনায় কিছুই বলতে পারে না রঘু। ইনারদেও বলেছে অসহায় গলায়,

—এত সোজা না। কে বা কারা মারল, কিচ্ছু জানা নেই। যারা বুলনজিকে মারতেজি পারে এদের হাত বহুৎ লম্বা। আমরা কয়েকজন কী করতে পারি?

—কেন পারবনা? অন্তত একটাকে ধরে,

এবারো রঘুর কথা শেষ করতে না দিয়ে ইনারদেও বলেছে,

—তুমি সব বুঝবে না রঘু। এমন ঘটনার পর আর কিছু ঝামেলা হয় পর পর। আমি সরে যাবো এখন কিছুদিনের জন্যে। তুমি সাবধানে থেকো। চলি রঘুভাইয়া তোমাকে খবর

জানানো দরকার মনে হল, তাই দিলাম।

আর কিছু না বলে ইনারদেরও চলে গিয়েছিলো মঙ্গল বাজারের দিকে।

দৌড়তে-দৌড়তে ভাবছে রঘু, বুলনের লাশ এখন কোথায় আছে? শিলিগুড়ি মর্গে? এখানে কবে আনা হবে? পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে কি? সৎকার কোথায় হবে? লাশ কার কাছে সমঝে দেবে পুলিশ?

বুলনজির লাশ! বড়কাভাইয়ার সৎকার! না, না। বড়ো খাপছাড়া লাগে বড়কাভাইয়া। মানা যায় না। মানতে পারি না। তোমার সব কথা মানব আমি—তোমাকে কথা দিয়েছিলাম সেই পাটবনে!

আবার মুচড়ে ওঠে রঘুর বুক।

দৌড়তে-দৌড়তে ফুঁপিয়ে ওঠে। চোখের জলে পথ ঝাপসা লাগে।

তবু দৌড়ায় রঘু প্রাণপণে। তুলসীদিদিকে তুলে আনতে হবে। ওর এখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

বুলনজির নিষ্প্রাণ দেহ আমি সমঝে নেবো। পুলিশকে বলবো,

—উ হামার বড়কাভাইয়া!

রঘু দৌড়ায় ওভার ব্রিজে। পেছনে অনুচর ভাঙ্গাড্ডু। হাতে তেল চকচকে আড়াই হাত লাঠি।

সোজা তিনতলায় উঠে গেল রঘু। এ পাড়ায় এমন ভোর-ভোর সময়ে পুরো মাঝরাত। সারারাত হুল্লোড় চলে, তাই।

তুলসীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপায় রঘু। ভাঙ্গাড্ডু নিচে রাস্তায়।

রঘু দরজায় ধাক্কা দেয়। ডাকে,

—তুলসীদিদি, ও তুলসীদিদি! দরজা খোলো!

কেউ খোলে না। আরো জোরে ধাক্কা দেয়। ভেতর থেকে কোনও শব্দ নেই।

ডাকে রঘু, আবার,

—খোলো না। চলে যেতে হবে তোমাকে। নিয়ে যাব আমি। তাড়াতাড়ি সব গোছাও। এখানে আর নয়।

তবু খোলে না দরজা। তুলসীদিদি কী করে এতোক্ষণ! এত গাঢ় ঘুম ওর?

এবার খেয়াল করে রঘু। উত্তেজনার আগে দেখেনি। দরজায় বড়ো তালা।

তালা কেন! রঘু থমকে যায়। আশেপাশের কাউকে জিজ্ঞেস করবে, তেমন কেউ নেই। সব ঘর বন্ধ। ঘুমোচ্ছে সবাই।

রঘু জানে—এখন যারা ভেতরে আছে, শেষরাতে ঘুমিয়েছে। জাগবে না ডাকাডাকি করলে।

তুলসীদিদি গেল কোথায়—এই চিন্তা নাজেহাল করে রঘুকে।

কাউকে কিচ্ছু না বলে, কোনও কথা জিজ্ঞেস না করে, তুলসীর হদিশ না জেনে, ভ্রান্ত বিধ্বস্ত পায়ে আস্তে-আস্তে নেমে এলো রঘু।

রাস্তায় দাঁড়ানো ভাঙ্গাড়ু বলল,

—তোহর দিদি কাঁহা?

চূর্ণবিচূর্ণ হুয়ে যাওয়া রঘু বলল,

—নেই।

—মতলব?

—ঘরে তালা।

—কোথায় গেলেন?

—জানি না। কোথায় যেতে পারে তুলসীদিদি এই ভোরে!

দালানের তলায় চায়ের দোকান। উনুনে আঁচ তুলছে দোকানি। রঘু ডাকল,

—এ, সুনো।

দোকানি দেখল একবার। বলল না কিছুই। রঘু আবার ডাকে,

—এ ভাইয়া।

এবার জবাব দেয় দোকানি,

—কিয়া হ্যায়?

—তুলসী কো জানতে হো?

—তুলসী!

—হ্যাঁ। হাভেলির তিনতলার ঔরত্। চেন ওকে?

দোকানি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে যায় এবার। কিচ্ছু বলে না।

রঘু শান্তস্বরে বলল,

—চেন ওকে? দেখেছ আজ বা, কাল বা পরশু? খুব জরুরি দরকার ভাই!

তবু জবাব দেয়না দোকানি। শুধু বলল,

—ফুটো ইহাঁসে। যাও। ভাগো!

রঘুর মাথার সব বাবুদে আগুন পড়ে। অন্য চেহারায় ফিরে আসে। শরীরের সমস্ত মাংসপেশিতে আগুন ছড়কায়। লোহার মতো শক্ত হয় যায় দেহ।

বলিষ্ঠহাতে গলা চেপে ধরে ওর চেয়ে বয়সে বড়ো দোকানিকে। ঠেলে দেয় জোরে দেয়ালে। দাঁতে দাঁতে ঘষে বরফের মতো ঠান্ডা স্বরে গর গর করে,

—এ পুত্তর! যা বলছি জবাব দে। তুলসীকে দেখেছিস?

ভাঙ্গাড়ু লাঠি তোলে মাথার উপর। বলে চাপাস্বরে,

—উড়িয়ে দিই শালার খোপড়ি। কুছ বোলতা কাহে নেহি!

দোকানি ঘাবড়ায়। বোঝে—এ দুইজন জানবর সে বত্তর এখন। মেরে ফেলবে।

ভয়-ভয় গলায় বলল,

—কেটে ফেলবে ওরা!

রঘু বলল,

—হম কাট ডালেঙ্গে তেরেকো ভোঁসড়িওয়ালে! বতা জলদি। দোকানি বলল,

—ওরা নিয়ে গেছে।

রঘু-ভাঙ্গাড়ু দুজনেই বলল একসাথে,

—কৌন?

—একটা জোঙ্গাগাড়ি এসেছিল পরশু রাতে। তিনজন লোক ছিল। কারা চিনি না। ওরা নিয়ে গেল তুলসীবাঈকে।

রঘু বলল,

—জোর জবরদস্তি?

দোকানি বলল,

—প্রায় ওরকমই। আর জানি না। খোদাকসম!

ওরা ছেড়ে দিল দোকানিকে। দুই সহচর রাস্তায় হাঁটে হতাশ! চারদিকে তাকায়।

সূর্য উঠছে। আকাশে মাছের আঁশের মতো থাক-থাক সাদা মেঘ। পাখি ওড়ে নিজের মনমতো। লোকজন রাস্তায় হাঁটছে। ডেয়ারী ফার্মের দুধের গাড়ি ছুটছে নিউকলোনির দিকে। ব্যস্ত জংশনের হুইসলের শব্দ স্পষ্ট। রাতের ডিউটি শেষ করে ফিরছে দুজন নার্স রিকসায়। সিনেমার হোর্ডিংগুলোর মাথায় অসংখ্য কাক।

কয়লা পোঁড়ার হাল্কাহলুদ ধোঁয়া ওড়ে বাতাসে। এরি গন্ধ।

হাঁটতে-হাঁটতে একসময় ভাঙ্গাড়ু বলল,

—তোমার দিদিকে কোথায় নিয়ে গেল!

কোন জবাব দেয় না রঘু। বসন্ত-টকিজের চৌমাথায় দাঁড়ায় দুজন। শহর সরগরম হচ্ছে আবার। আকাশে সূর্যের খর আলো।

রঘু ভাবে আর ভাবে। কোন থই পায় না — কোথায় গেল তুলসীদিদি? কারা নিয়ে গেল? কেন নিয়ে গেল?

গলার তাবিজে হাত দেয় রঘু। বুক কঁকিয়ে ওঠে আবার। চোখ ঝাপসা হয়। নোনা জল গড়ায় গালে।

নিজের রক্ষাকবচ আমায় বিলিয়ে দিয়ে কোথায় গেলে তুমি? কই খুঁজি এখন তোমায়? ওগো, আমার বড়কাভাইয়া আর নেই। তোমার বুলন আর নেই! তোমায় উদ্ধার করা হল না আমাদের। কী করে খুঁজব এই বিশাল পৃথিবীতে তোমাকে? আমার মন বলছে—তোমাকে পাবো না আর কোনোদিন।

তীব্র দহনে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাওয়া কুড়ি বছরের রঘু কতটুকুই বা দেখেছে এই

আঁধার জীবনের সব চোরাগলি। দেখেনি এখন কিছুই। তবু, যা দেখা হল আজ অবধি, সেইসব আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল অসহায়, হতাশ, আপাত স্থবির, কোলহলে মুখর রাজপথে।

এই সব নিরর্থক বা প্রচণ্ড ব্যঞ্জনাময় অসম্পূর্ণ খণ্ডিত উপাখ্যানের পরতের পর পরত মেলে ধরে একবার, আবার বন্ধ করে দেয়। এমনি বার বার নাড়াচাড়া করে রঘু প্রায়ই। এখনও করছে একা, আমবাগানের গাঢ় ছায়ার তলায়, শিবমন্দিরের খোলা প্রাঙ্গণে বসে। ভরদুপুর এখন।

ঘটনার আড়াইমাস পেরিয়ে গেছে। ফাইনাল পরীক্ষাও শেষ। গত পরশু হয়ে গেলে ফিজিক্স্ প্র্যাকটিক্যাল। ইঙ্গিত পেয়েছে—আবার চলে যেতে হবে। বাবার মেল এসেছে কেমিস্ট্রি পরীক্ষার দিন রাতে। জানা ছিল এমনি হবে।

গতকাল বাবার চিঠিও এসেছে। লিখেছেন , কাটিহারে তোমার সব অ্যাক্টিভিটির খবর পাচ্ছি। কী মনে কর তুমি? তোমার কোনও খবর আমি রাখি না? তুমি কী চাও রঘু? ছোটবেলা থেকেই তোমার মতিগতি এমন কেন? তোমার মা বেঁচে থাকলে আমার দায় কম হত। কী চাও তুমি, স্পস্ট করে বলবে? দিনদিন এমন আনবুলি বিশৃঙ্খল হচ্ছ কেন তুমি? যা খবর পাচ্ছি, তোমাকে আর ওখানে রাখা চলে না। পরীক্ষা তো শেষ। কী পরীক্ষা দিয়েছ, তুমিই জান। সব গোছগাছ করো। ড্রাফ্ট পাঠিয়েছি। টাকা হাতে পেয়েই রিজার্ভেশন করবে। একটা কথা স্পষ্ট মনে রেখো- শুধু আর তিনটে বছর দেব তোমাকে। কী না হতে পারতে তুমি? আমার সন্তান তুমি। আমি তো বুঝি- মেধা তোমার কম নেই। সুস্থ উন্নত জীবিকার সব পথ খোলা তোমার কাছে। মনে রেখো, আর তিনবছর। এরপর নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবে। তোমার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন উশৃঙ্খলকে আর কতদিন দেখব, তুমিই বলো? কোথাও স্থিরতা নেই তোমার। আর সওয়া যায় না। যেখানেই যাও জট পাকাও, ঝামেলা কর। কেন? রঘু, মানুষ হওয়ার চেস্টা করো। স্থির কোনো বিন্দু সামনে রেখে এগোও। না হলে এ সংসারের কোথাও কোন স্থায়ী স্থান হবে না তোমার। ডিসিপ্লিন শব্দটা বুঝতে চেস্টা করো।

তুমি সন্তান। তাই আশীর্বাদ করছি। ইতি, বাবা।

আজ সকাল থেকে একেবারেই অকারণ হোস্টেলের কিচেন গার্ডেনে একনাগাড়ে খাবলা খাবলা মাটি কুপিয়েছে রঘু। কোথাও স্থান হবেনা আমার? কিন্তু মাটির তলায় পাতাল তো আছে।

সারা গায়ে ঘাম ও মাটিমাখা রঘু তারপর ছুটে এসেছে মন্দিরের প্রায় নিরালা বিরাট প্রাঙ্গণে।

'এ সংসারে কোথাও কোনও স্থায়ী স্থান হবে না তোমার'- অতি সহজ এই শব্দ-সঙ্কলন ক্রমাগত বিদ্ধ করে রঘুকে।

আর মনে প্রাণে বলে নিঃশ্চুপে-এখানে শেকড় গেড়েছি কিছুটা। দু-একটা কচি পাতা দেখা দিয়েছে গাছে। পাতাদের যতোই কষ্ট জমুক গুমরে গুমরে। তবু তলায় মাটি আছে তো। শেকড়টাকে একটু সুস্থির হতে দাও দয়া করে। কচিপাতার সবুজ কণায় অনেকে আছে- ঝা স্যার, হিমানী, ঝিলিক, দিয়া, ভাঙ্গাড্ডু, সুরতিয়া, আর তুলসীদিদি, বুলনভাইয়ার ভরপুর স্মৃতি। এরাই তো পরিচর্যা করবে উদ্ভিদ। আর কতবার উপড়ে ফেলা যায় একই বৃক্ষ! এভাবে বেশিদিন বৃক্ষ বাঁচে না। যদিও বাঁচে, একে বাঁচা বলে না।

ধুর! কাকে বোঝাব এইসব! ভেতরের রঘু বলে দেয় কানে কানে,

-ফুলফলহীন বৃক্ষ হয়েই টিঁকে থাক। বুঝিস না তুই। তোর ফুলফল সবই আছে। তবে গাছের ডালে দৃশ্যমান নয় এরা। অন্যখানে, অন্য বৃন্তে ধরে রাখ এদের।

কখন যে অনুসরণ করে ঝিলিক এসেছে পেছনে খেয়াল করেনি রঘু।

একটা মজা হয়ে গেছে ঝিলিক আসার আগে।

সমস্ত শরীরে মাটি রঘুর। কোমরে কালো ফুল প্যান্ট। মাথার ঝাকড়া কালোচুল অবিন্যস্ত। মুখে বিন্দুবিন্দু ঘাম। দু চোখে ক্লান্তি। পেট অভুক্ত।

খালি গায়ে বিহারী লাল গামছা জড়ানো। ইটের বড়ো খিলানে বসে আছে রঘু।

দুজন মাড়োয়ারি মহিলা এসেছিল মন্দিরে উপচারসহ। প্রণাম সেরে ফেরার পথে এগিয়ে এলো রঘুর পাশে।

নিঃশব্দে দুজনেই হাত জোড় করে নমস্কার করল ওকে।

তারপর টেকো পাতায় দুটো ছানার সন্দেশ ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা রেখে চলে গেল চত্বরের বাইরে।

রঘু নির্বাক। কী ভাবল এরা! ভিখিরি? নাঃ ভিখিরির পরনে এতো দামিপ্যান্ট হয় না। চেহারা? কালো হলেও জীর্ণ-শীর্ণ ভিখিরির নয়।

তবে? ভবঘুরে ভেবেছে? কিম্বা সহায় সম্বলহীন ক্ষুধার্ত উন্মাদ?

হতে পারে। নিজের জন্মদাতা যদি জাতককে না বোঝে, ঐ মহিলা দুজন তো কী?

পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা তুলে জোরে ছুঁড়ে দিল বিগ্রহের দিকে। ধাতুর চাক্তির মতো ওটা সবেগে ছুটে যায়, আর আটকে গেল পাথরের শিবের বাঘছালের তলায়।

মুখে বলল,

-যাঃ শালা। ভিখিরি তুই নে! আমি শুধু সন্দেশ খাব।

দুটো সন্দেশ একসাথে মুখে পুরে দেয় রঘু। তারপর কুয়োতলায় ঠান্ডা জল খায়।

চিঠিপড়ার পর থেকে কিচ্ছু খায়নি কাল রাত থেকে। মাথায় বারবার আঘাত একই বাক্যের, স্থান নেই, স্থান নেই, স্থান নেই।

মন্দিরের চত্বরে ছায়া আরো গাঢ় হয়। পাশে, একটু দূরত্ব মেনে ঝিলিক। আজ পরেছে ফিকে গোলাপি জমিতে শাদা বুটিদার শাড়ি। এই প্রথমবার শাড়ি-পরা দেখল রঘু

ঝিলিককে।

চুলছড়ানো পিঠের ওপর। গলায় পাতলা হার লকেটবিহীন। পায়ে কোল্‌হাপুরি চটি। বাঁহাতে চৌকো ঘড়ি। ডানহাতে একগাছা সোনারবালা, কয়েকগাছা হাল্কা সবুজ কাঁচের চুড়ি, যা মাঝে মাঝে শব্দ তোলে, রিনির-ঝিনির। সারামুখ দিব্‌দিব্ করছে ঝিলিকের, যেন এইমাত্র সেরে এল। মুখে অল্প হাসি খুবই চাপা। বলল শান্তস্বরে,

-কী হচ্ছে এখানে একা বসে-বসে?

একটু সময় নিয়ে আরো শান্ত ধীরস্বরে রঘু বলল,

- কেন আসিস আমি যেখানে যাই?

-কী?

-কেন আসিস ঝিলিক?

ঝিলিকের কপটতা অনাবিল এখন। বলল,

-এঃ ! কী না নবাব রে! তোমার পেছনে আসব কেন?

এত যে বকে, তার কাছে কেন যাব?

-এই তো এলি আবার।

-মন্দিরে এসেছি।

-কেন?

- মন্দির কি তোমার?

-না মন্দির কেন, কিছুই আমার নয়!

থমকে যায় ঝিলিক। রঘুর শেষ শব্দগুলোই এমন। থমকে দেয়।

বলল খুবই নিচু স্বরে,

-বসি না এখানে একটু। কী হয় বসলে তোমার পাশে?

রঘু বলল,

-তুই যা ঝিলিক। ভাল্লাগে না। মন ভালো নেই।

- কী হয়েছে তোমার?

- যা তুই। কিচ্ছু হয়নি।

- তোমার বুলন ভাইয়া তুলসী দিদির কথা মনে পড়ছে?

-তুই জানিস ওদের ?

- জানি তো। তোমার সাথে কী সম্পর্ক সব বলেছে ভাঙ্গাড়ুদা।

রঘু দেখে ঝিলিককে। ঝিলিকের চোখেমুখে কোথাও কোনও চপলতা নেই। শান্ত নীল আকাশের মতো ঝকঝকে।

ঝিলিক কেন এত উদগ্রীব? জানতে চায় কী হয়েছে। রঘু বুঝেও বলে না। দৃষ্টি ফেরায়। ঝিলিক আবার বলে,

-যাক। আমার দিকে এতক্ষণ তাকালে তো। আচ্ছা রঘুদা, তোমায় খুব উত্তক্ত করি। খারাপ পাও, আমি জানি।

রঘু বলল,

- জানিস যখন, আসিস কেন?

-উফ্ এতো কাঠ কাঠ কথা তোমার। কারও মন বলে যে কিছু আছে, তা বোঝে না কেন?

এবারও জবার দেয় না রঘু। আসলে উন্মোচিত হৃদয় যখন প্রশ্ন করে-একে প্রশ্ন না বলে অভিমানের অভিযোগ বলা হয়। তেমনি উত্তরনিরপেক্ষ প্রশ্ন ঝিলিকের।

ঝিলিক বলল,

-কিছু খাবে?

রঘু বলল,

- খেয়েছি।

- কী খেয়েছ?

- সন্দেশ।

- প্রসাদ দিয়েছে মন্দিরের?

-না।

- তো?

রঘু বলল নিরাসক্ত গলায়,

-ভিক্ষে।

ঝিলিকের বিস্ময়। বলল,

-ভিক্ষে! ভিক্ষে তোমায় কে দিল?

-দুজন মাড়োয়ারি মহিলা দিয়ে গেল একটু আগে। আর একটা জিনিস দিয়েছিলো।

- কী জিনিস?

-পয়সা।

-কী?

-হ্যাঁ। পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়েছি ওদিকে। শিবের ল্যাঙটের তলায় খুঁজলে এখন পাবি। সন্দেশ খেয়ে ফেলেছি। কী করব। কাল রাত থেকে কিচ্ছু খাইনি।

ঝিলিকের দিকে এবার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকানো যুগ্ম রঘু, ভেতরের বাইরের। ভিতরের রঘু দৃশ্যমান হল না ঝিলিকের চোখে। বাইরের রঘুর কোমরে রেয়ন প্যান্ট বেল্টসহ। চৌড়া দৃঢ়মাংসের পেশিসহ বুক খোলা। বুকের মাঝখানে কালো কচি লোমের স্পষ্ট রেখা। দুচোখ ক্লান্তিতে অবসন্ন। চোখের তারায় বিষণ্ণতা কুয়াশার মতো।

ঝিলিক চেয়ে থাকে গভীর দৃষ্টিতে। মায়া হয়। ভীষণ মায়া, বুক খুবলে খুবলে ওঠে।

আরো কী কী হয় বোঝেও স্পষ্ট বোঝে না ঝিলিক। এটাই বোঝে,একেবারে ভিতরে প্রবল থেকে প্রবলতর কিছু হয় রঘুকে ঘিরে।

ঝিলিক রঘুর চোখেমুখে নিবিষ্ট। এই ছেলেটার কালোমুখ নিজের বুকে সজোরে লেপ্টে ধরতে ইচ্ছে হয় প্রবল। ওর ঠোঁটে নিজের পাতলা গোলাপি ওষ্ঠ গলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ভীষণ।

ঝিলিক এসব কিছুই করে না। অন্যদিকে তাকানো রঘু বলল,

-কী দেখছিস রে পেত্নি

ঝিলিক বলল,

-কী করে বুঝলে তোমায় দেখছি!

- আমার সবদিকে চোখ আছে ঝিলিক। বল, কী দেখছিলি?

- না। কিচ্ছু না।

- কিচ্ছু না তো বাড়ি যা। এখানে কেন? ভিক্ষে দিবি?

ঝিলিক বলল,

- ছিঃ ছিঃ! আমি ঝিলিক। তোমায় দেব ভিক্ষে!

রঘু বলল একটু হেসে,

-ঐ মহিলা দুজন দিয়ে গেল যে!

ঝিলিক বলল প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ঝিলিকের বিরোধী স্বরে,

-ভরদুপুরে গায়ে মাটি মেখে একা একা কেউ বসে এমন?

- কী হয় বসলে?

ঝিলিক বলল,

-কী আর হবে? মাড়োয়ারি মহিলাদের মতো অনেকেই এমন ভাববে। আমি ছাড়া।

ঝিলিক এখনো গভীরতায় লীন। কতোটা গভীর পরিমাপ নেয় না রঘু। স্পৃহা নেই। বলল,

-তুই না কেন?

ঝিলিক বলল, অন্যকথা,

-আবার ভিক্ষে,পেলে আমাকেও দিয়ো।

- কী !

-হ্যাঁ, দুজনে খাব।

চপল ঝিলিকের চোখেমুখে এমন এক হাসি যা মোটেই চপল নয়। বলল হাল্কা ক্রোধে অথচ অব্যাখ্যাত প্রত্যয়ে,

-শিবও তো সবচে বড়ো ভিখিরি। মহিলাদের চোখ নেই?

রঘু বলল,

-কী?

-কিচ্ছু না। এই শোনো।

-কী?

-আমসত্ত্ব খাবে? পিসিমা বানিয়েছিলেন। এই দ্যাখো।

রঘু লক্ষ করেনি আগে। শাড়ির আঁচলের আড়ালে ঝিলিকের বাঁহাতের মুঠোয় কাগজের মোড়কে আমসত্ত্ব।

রঘুর তালিকা আরো একটু বর্ধিত হয়। যেন মূল কলমে কালি শেষ, তবু লেখা বাকি রয়ে গেছে। তেমনি, রঘু লিখে নিল, পাগল ঝর্ণার জলের মতো, আঠারোর সুঠাম এক তরুণীর নাম। আস্তে আস্তে লিখলো রঘু-ঝি-লি-ক!

ক্ষুধার্ত রঘুর কুণ্ঠিত মুঠোয় আমসত্ত্বের গ্লানিহীন ভিক্ষে গুঁজে দেয় এক নতুন অন্নপূর্ণা। বলে একেবারেই ভিন্ন কণ্ঠে,

-একটু খেয়ো।

- কেন?

- খালি পেট বলছিলে যে।

-কিচ্ছু হবে না।

- একটা কথা মানবে?

ভক্ষণরত রঘু বলল,

-কী কথা?

-ভাত এনে দেব?

- কী?

- মুখ দেখে বোঝা যায় নাওয়া-খাওয়া করনি ক দিন।

রঘু বলল,

- কোত্থেকে আনবি ভাত?

ঝিলিকের উৎসাহ সীমাহীন এখন। বলল,

-দৌড়ে যাব। দৌড়ে আসব। বাড়ি থেকে নিয়ে আসব। ছানার ডালনা হয়েছে আজ। রেওয়া মাছের ঝোল আছে। তুমি কুয়োয় চান সেরে নাও। আমি ভাত বেড়ে দেবও, কেমন?

রক্তমাংসধারী রঘু চুপ এখন। ঝিলিকের সাথে কথা বলে ভেতরের প্রাজ্ঞ রঘু। বলে গম্ভীর স্বরে,

-আমাকে কাঙাল পেয়েছ?

ঝিলিক চোখ বোঁজে আবেশে। বলে

-ওহ্! আজ প্রথম আমাকে তুমি তুমি বললে।

ভেতরের রঘু সময় বুঝে সরে যায়। স্বস্থানে ফিরে আসে উদ্ভট রঘু। বলল জোরে,

-আমাকে ভিখিরি বানাবি তুই থার্ডক্লাস মেয়ে!

ঝিলিক আহত হয় না। বোঝে,রঘু কেমন। বলল শান্ত গলায় ভরাট অভিমানে,

-এমন বলবে জানতাম। চামারটৌলিতে রোটি খাও গপাগপ। তাড়ি খাও গলা অব্দি। আমি কিছু দিতে চাইলেই থার্ডক্লাস! এতো গুমোর ভালো নয়।

কথাশুনে চণ্ডাল রঘু থু থু করে ফেলে দিল মুখের সব আমসত্ত্ব। বলল অবজ্ঞায়,

-ভালোমন্দ আমি বুঝব। তুই ভাগ চুড়েইল। আঠার মতো চিপ্‌কে আছিস।

তবু রক্তাক্ত হয় না ঝিলিক। এতো লাঞ্ছনের পরও দৃঢ় থাকে ওর মানবী সত্তা। বলল আবার,

-একটা কথা আজ বলবোই।

- কী নাটক আবার?

- বিলিভ মি। নাটক না রঘুদা।

রঘু উত্তক্ত। বলল,

- কী বলবি?

একটু গোছায় ঝিলিক। তারপর দ্বিধাহীন বলে দেয়,

- তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না গো!

গাছের পাতার ফাঁকে রোদের আভাস। পাখিরা ডাকে বাধাহীন। ঝিলিকের শব্দ অনুরণন তোলে।

ফোরডাউন আসাম মেইল রেলইয়ার্ড পেরিয়ে যায় সশব্দে। ডিজেল ইঞ্জিনের হুইসল শব্দ তোলে শঙ্খের।

শঙ্খের ধ্বনি ভাসে বাতাসে। ঝিলিকের উচ্চারিত 'তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না গো'- এই ধ্বনি যান্ত্রিক শাঁখের শব্দ মিল খায়, মিশে যায়।

আর অনবরত সঙ্গত দেয় আম্রকুঞ্জের হাওয়ার শব্দ ও পাখির ডাক।

কিছুটা সময় কাটে। দুজনেই কিচ্ছু বলে না।

শঙ্খের একটানা ধ্বনি দূরে মিলিয়ে যায়। পাখিদের কলধ্বনি তখন চলে।

রঘু বলে,

- যে গাছের শেকড়বাকড়ে স্থায়ী কোন মাটি নেই, সেই গাছে কোন ফুলফল ধরে না। এমন গাছের কাছে কোন মনোবাঞ্ছা নিয়ে যাস্‌নে।

মেয়েদের সহজাত তীব্র এক অনুভব থাকে, এই অনুভবের তীব্রতায় বুঝে নেয় ঝিলিক যদিও পুরোপুরি ধরতে পারে না শব্দও বাক্যের অর্ন্তবয়ন। ভাসাভাসা বুঝতে পারে। এই স্বল্পবোধ থেকেই এমন এক কথা বলে ঝিলিক-যে কথায় উদ্ভাসিত হয় রঘুর পরিচিত ঝিলিকের এক অদেখা বর্ণ।

স্তিমিত মিইয়ে যাওয়া রোদের ম্লানতা অথচ অমোঘ নিশ্চিতিতে বলে ঝিলিক,

কোনগাছ ভেসে ভেসেই বড়ো হয়। ফুলফল দেয়। অন্যকে আশ্রয় দেয়। এমন গাছ হলেও চলবে আমার। তুমি আমার কথা শোনো, প্লিজ!

ঝিলিকের রাম, রাবণ, একটু আগের ভিক্ষুক শিব হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কেন হয়, নিজেই জানে না।

তীব্র তিরস্কারে গালাগাল দেয় রঘু,

-তুই ভাগ, থার্ডক্লাস মেয়ে! ভাগ তুই!

রঘুর থার্ডক্লাস মেয়ে এবার প্রকৃতই রক্তাক্ত হয় ভেতরে। চুপচাপ বসে থাকে একদা উচ্ছল প্রাণচঞ্চল ঝিলিক। অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে যায়। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মাটির দিকে।

একসময় উঠে যায় ঝিলিক। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় পায়ে চলা পথে, আমবাগানের গাছের ফাঁকে। রঘু ডাকে না।

তবে স্পষ্ট দেখে নেয়, বাঁহাতে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে একাকী হাঁটে ঝিলিক। রঘু তবু ডাকে না। হাতে এখনো কাগজে মোড়া ঝিলিকের দেয়া আমসত্ত্ব।

অপমানিত, নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত আঠারোর উদ্দাম সদ্যযুবতি ফিরে যায় মাঠের বুকচেরা পায়ে-চলা পথে, যে পথে কতবার এসেছে এর আগে রঘুর কাছে।

একবার ফিরেও তাকাল না আর। কিম্বা তাকাল হয়তো এমন চোখে, যে চোখ কপাল ও ভুরুর প্রতিবেশী নয়। সে চোখ থাকে অন্যখানে- উপেক্ষা ও আবেগের দহনে নীরবে একলা কাঁদে।

দূরগামিনী ঝিলিকের দিকে পলকহীন চেয়ে থাকে রঘু। আনমনে বলে নিঃশব্দে,

-ও ঝিলিক, তুমি খুব ভালো। সত্যি ভালো। আমি ঈশ্বর বুঝি না, ভগবান বুঝি না। কার কাছে কী চেয়ে নিতে হয় বুঝি না। তবু মনে মনে কামনা করি তোমার মঙ্গল হোক। তোমার ভালো হোক। আমার ভেতরে ঝোপঝাড় আকন্দপাতার বনবাদাড় ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। ওখানে বসত হয় না ঝিলিক। হলেও করতে নেই।

মাঠের শেষপ্রান্তে ঝাপসা অস্পষ্ঠ দেখা যায়,ঝিলিক মিলিয়ে গেল ওদের দালানের পাশের অ্যাকাশিয়া গাছের আড়ালে।

রঘু মন্দির চত্বরে প্রকৃত নিঃস্ব ভিখিরির মতো বসে রইল একা।

আঙ্গিনায় দাঁড়াল রঘু। কেউ নেই এখানে। গ্যারেজে গাড়ি নেই। স্যারের বাবা ফেরেননি এখনো, স্যার দশদিন হল দিল্লি গেছেন। পশ্চিমের কোনায় মোটরবাইক। স্যার ওটা ইদানীং চালান না। নতুন স্কুটার নিয়েছেন। স্কুটার বারান্দার শেষ মাথায় স্ট্যান্ড করা। রঘু তিনদিন খুব চড়েছে। বলেছিল,

- স্যার, স্কুটার ঠিক নেহি হ্যায়।

স্যার বলেছিলেন,

- তুই সবজান্তা? নতুন স্কুটারের কী খুঁত, পেলি?

- নেহি স্যার, খুঁতটুত না।

- তো কী বলছিস। ঠিক না কেন?

রঘু বলেছিল,

- মেয়েদের জন্যে এমন জিনিস প্রথম বানায় ইটালিতে।

স্যার হেসে বলেছিলেন,

-রাখ তোর ইটালি। স্কুটার এখন নিউটার জেন্ডার। পুরুষ মহিলা সবাই চালায় দেখিস না! তোর চাচিজি চালাবেন।

হিমানী ছিলেন আঙ্গনায়। বলেছিলেন আমার এত শখ নেই খাটারা চালানোর।

- লছমতিয়া এলো আঙ্গনায়। ভেতরে ছিল হয়তো।

সন্ধ্যা হচ্ছে। একটু একটু শীত আছে বাতাসে, যদি ও বসন্ত এসে গেছে। আর দু-চারদিন পর রঙ। হোলি। গুলাল ছড়াবে অন্তত এক হপ্তা। পুরো বিহার নাচবে - ছে রে রে ফাগুয়া!

মদ আর মারপিট হবে খুব তখন। হোলিতে এমন ঝামেলা প্রতিবছর হয় এখানে।

তবু, হোলি রাঙ্গা করে দেয় সব। রাস্তা দালান দেয়াল গাড়ি ট্রেন কোনো কিছু বাদ যায়না। গতবার রঘু আর ওর দলবল এক ট্রাফিক পুলিশকে রঙিন করে দিল পুরোপুরি। বলল,

- এ ভাইসাব, বুরা মত্ মানিয়ে গা।

পুলিশ ভাই বলল,

- বুরা কাহেকা? হোলি হ্যায়। মজা কিজিয়ে আপলোগ। লস্সি উস্সি পিজিয়েগা ক্যা?

এমনই হোলি চলে এখানে। এবার হবে। কিন্তু রঘু এখানে থাকবে না। ও থাকবে রাঁচি

পিঞ্জরার পাখিটা রঘুকে চেনে,এমন বলেন হিমানী। রঘুর মনে হয় পাখিরা কাউকে চেনে না। কার জন্যে এদের টান নেই।

পাখিরা এক চেনে খোলা আকাশ আর দিকবিদিক উড়ান।

পাখিটা জোরে চেঁচাল,

-আঁইয়ে, আঁইয়ে!

একই রকম শব্দ কোনোকিছু দেখলেই। লছমতিরা আতিশয্যে বলে সব সময়,

- নাম ধরে কী সুন্দর ডাকে পাখিটা।

হিমানীর আতিশয্য পছন্দ নয়। বলেন,

- এ বাড়িতে আঁইয়া আঁইয়া কার নাম রে?

রঘু বোঝে,সবই তোয়াজ। হিমানীর প্রিয় পাখি কথা বলতে পারে, পাখিকে তোয়াজ করার ছলে হিমানীকে খুশ্ করা লছমতিয়ার।

একদিন রঘু বলেছিল,

- চাচিজি।

- কী ?

রঘু হেসেছে। উনি বলেছেন,

- হাসিস কেন ?

রঘু বলেছে ,

- তোমাকে তেল দেয়ার কত কায়দা লাছমতিয়ার।

হিমানীও হেসেছেন। বলেছেন,

- সব বুঝি আমি।

- একদিন স্যার বলছিলেন,

-রঘু, হিমানীজির লছমতিয়া বাজে কথা বলে।

- জানি স্যার। পাখি নাকি কথা বলে।

- ওর মাথা বলে। পাখিরা কোনোমতেই মানুষের মতো কথা বলতে পারবেই না। মানুষের ল্যারিংস্ বলে একটা বিশেষ অঙ্গা আছে।

রঘু বলেছে

-দ্যাট্স্ ইট। কাকে বলে কা- কা। তারমানে কাকা বলে ডাকল ?

হিমানী তখন বলেছিলেন,

-পন্ডিত তুই ? নিজের মাতৃভাষা জানিস না। তুই ভাষাবিদ্ হলি কবে থেকে। লছমতিয়া ঠিকই বলেছে , ঘুন্চি (পাখির নাম) আঁইয়া আঁইয়া বলতে বলতেই মাইয়া মাইয়া বলবে। তোর মতো বর্ণবোধ ভালোভাবে শেখেনি তো।

ওকে দেখেই লছমতিয়া বলল,

- এলেন রঘুজি ?

- হুঁ। চাচিজি কই ?

-ভেতরে যান।

লছমতিয়া চলে গেল বাইরে। কিছু কিনে আনতে মোড়ের দোকানে গেল হয়তো।

যখন পা ধুয়ে বারান্দায় এলো রঘু, করিডোর ধরে হিমানী বেরোলেন। গাঢ় সবুজ পাড়হীন সিল্কের শাড়ি পরেছেন। রঘুর খেয়াল হয় আজ গুরুবার। অর্থাৎ সন্ধ্যারতিসহ ঠাকুরঘরে এক ঘন্টার ব্যস্ততা। কথা বলার সময় হবে না এখন। রঘুর দিকে না তাকিয়ে বললেন,

-এলি ?

হিমানী আবার নিজের কাজে মগ্ন। কোনও কথা যেন শোনার সময় নেই। রঘু

বলল,

-হ্যাঁ। কাল ফোনে কোনও জবাব দিলে না কেন?

- কী জবাব দেব। জানালি। জানলাম। কবে যাচ্ছিস বললি তখন?

রঘু সঙ্গে সঙ্গে কিছুই বলল না। কাজে ব্যস্ত হিমানী বললেন আবার,

- কবে যাচ্ছিস? রিজার্ভেশন পেলি?

রঘু বলল,

- এর মানে ফোনে সব শুনছ। তবু ভান করছ জান না কিছুই। কী হয়েছে তোমার?

কথা বললেন না হিমানী। শান্ত স্বরে রঘু অনুনয় করল,

-বলবে না, বলো না। দয়া করে একটু বেরোবে?

হিমানী বললেন,

- কেন?

- কাজ আছে। চিন্তা করো না। ছোঁব না তোমাকে বাসি কাপড়ে। না ছুঁয়ে প্রণাম করবো।

হিমানীর গলা একটু কাঁপল। টের পেল না রঘু। প্রতিবাদ করলেন হিমানী,

- না!

- না কেন?

- ছুঁতে না পারলে প্রণামের প্রয়োজন নেই। ভালো থাকিস। পড়াশোনা করিস। আর কী!

একটু সময় চুপচাপ কাটে। রঘু বলল,

-চলি।

চা খাবি না?

রঘুর কণ্ঠে অভিমানের হাল্কা বাষ্প। বলল,

-না। খাবনা। তোমার বাজে চা, খাই না।

হিমানী অন্য কথা বললেন,

-কাল ক-টায় ট্রেন তোর?

- দশটা কুড়ি। কাটিহার বারৌনি প্যাসেঞ্জার।

- অ। আচ্ছা। যদি কোনোদিন চক্কর পড়ে এদিকে, মন করলে আসিস।

রঘু স্পষ্টতই আহত। এতো শৈত্য হিমানীজির গলায়! বলল, আর অভিমানে,

- চলি চাচিজি। আপনি আপনার পুজো করুন।

অভিমানের তীব্র ছোবল রঘুর 'তুমি'কে 'আপনি' করে দিল সহসা।

হিমানী আমল দিলেন না। বললেন,- তুই যা। আমার অনেক কাজ!

রঘু প্রায় ছিটকে, আঙ্গনা পেরিয়ে বেরিয়ে এল সদর দরজার বাইরে।

রঘু আঙ্গানা পেরিয়ে চলে যেতেই ঠাকুরঘরে বসে থাকা হিমানী ঘুরে তাকালেন পেছনে। অস্পষ্ট, একেবারেই শব্দহীন কণ্ঠে বললেন,

- রঘু, কোথায় তুই ?

রঘু হিমানীর স্বরও বিন্দুবিন্দু অশ্রু কিছুই দেখলনা। ও তখন রাস্তায়।

সব সামগ্রী একপাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হিমানী।

পূজার সমূহ উপচার, বিগ্রহ পেছনে ফেলে সুতীব্র যন্ত্রণায় ছুটলেন।

ছুটলেন আঙ্গানা পেরিয়ে সদর দরজা, দরজা পেরিয়ে আরো বাইরে। এত জোরে ছুটে এলেন এখানে, আগে কোনোদিন ছোটেননি এমন।

আবার ডাকলেন আগের মতোই,

রঘুরে, শোন্।

অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে রঘু এখন। এখানে তিন-মোহনী। রঘু একবার তাকাল পেছনে।

রাস্তার কিনারায় তখন দাঁড়িয়ে আছেন হিমানী। রক্ষণশীল পরিবারের কোন মহিলা এ এলাকায় এমন বেরোয় না রাস্তায়। হিমানীও বেরোননি কোনোদিন।

আজ বেরোলেন সব সংস্কার, রীতি অগ্রাহ্য করে, অদৃশ্য লক্ষণরেখা পেরিয়ে।

রঘু দেখছে, মাথায় আঁচল আরো তুলে, হাত মৃদু নাড়লেন ওর দিকে চেয়ে। হিমানী দাঁড়িয়ে আছেন অস্থির। উদগ্রীব।

স্তিমিত আলোময় পথের বাকি আঁধার মুছে দিল হিমানীর বিচ্ছুরিত বিকিরণ। আঁচলে চোখ মুছলেন একবার।

বাঁ-হাত তুলে আবার মৃদু নাড়লেন। বেশ জোরেই বললেন,

-আবার আসিস। আমি পথ চেয়ে রইব। আর কিছুই বললেন না। রঘু বুঝল, হিমানীর স্বর, কথা ফুরিয়ে গেছে।

আর কোন কথা না বলে, উৎপন্ন অভিমান হিমানীকে ফিরিয়ে দিয়ে, রঘু এগোয় সামনে।

চোখ ঝাপসা হয় আবার। পকেটে রুমাল আছে, তবু নেয় না হাতে।

অনেক নোনাজল মুছে নিতে হয় চোটের উল্টোপিঠে। রঘু তাই করে।

'কৃপয়া ধ্যান দিজিয়ে, কৃপয়া ধ্যান দিজিয়ে। কাটিহার বারৌনি ডাউন প্যাসেঞ্জার, দশবজকর পঁচাস মিন্ট পর তিননম্বর প্ল্যার্টফর্ম সে ছুটেগি

'অ্যাটেনশন প্লিজ, অ্যাটেনশন প্লিজ, বারৌনি বাউন্ড, ডাউন কাটিহার বারৌনি প্যাসেঞ্জার।

দুইভাষায় পরপর করেকদফা, ঘোষকের সূচনা, গমগম সারা জংশনে।

আরো নানান কোলাহল দইওয়ালার ডাক- দহি - দহি - দহি।

সিঙ্গাড়ার হকার বলে, সমোসা-আ সমোসা-আ।

গরম পানীয়ের ফেরিওয়ালার ভিন্ন আলাপ- চায় গরম, চায় গরম।

'গরম' শব্দের গ একদম বলেনা। শুনতে শোনা যায়- চায় রম,' 'চায়রম'। যেন চা আর রাম দুটোই পাওয়া যাবে।

প্ল্যাটফর্ম পুরোপুরি নিজের চেহারায়।

একটা 'তাজাখবর' নিয়ে জোর বলছে খাগারিয়া কলেজের এক পড়ুয়া,

দিখা দিয়া অম্‌রিকা! চাঁদ কা সত্‌হ্ পর ইন্সান উতার দিয়া! দাদা রে দাদা! উ কা কম বাত! রাশা (রাশিয়া) পিছে পড় গইলে।

কয়েকজন দেহাতি যাত্রী হা-মুখে শোনে আমেরিকার চাঁদের মাটি দখলের বাখান। যুবকের উত্তেজনা এমন, আগে চেষ্টা নিলে ওর দাদা, বাপ কয়েকশ একড় জমিন দখল নিতে পারত। তাগড়া তাগড়া বয়েল দিয়ে গেহুঁ মকাইর খেতি হত মজাসে চাঁদের মাটিতে।

ট্রেনের ছুটন্ত কামরা, বিয়েবাড়ি, শ্রাদ্ধ-এমন আসরে সবাই অর্থনীতিবিদ, সমাজনীতিবিদ, কতকিছু বনে যায়, ঠিক নেই। কতো রাজাউজিরকে ধরাশায়ী করা হয়, তুলে আবার রাজা বানিয়ে দেয়া হয়।

যেমন এখন, ট্রেনের কামরায় নিজলিঙ্গাপ্পাকে পটল তুলিয়ে ইন্দিরা গান্ধিকে আনন্দময়ী মা বানাচ্ছে কয়েকজন। ওরা খবর পেয়েছে সমাজবাদ নাকি এখন দিল্লির উপকণ্ঠে। হাতের ছোঁয়া পেলেই দেশের দশদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রান্তিক চাষি গোছের একজন বলল, ই সমাজবাদ কা হৈ ভাইয়া?

প্রশ্ন শুনে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। চট করে গোছাতে পারল না বেগুসরাই কলেজের বিদ্যার্থী, তো কী বলবে অন্যকে।

রাজা রাজোয়াড়ার প্রিভিপার্স ছিনিয়ে নেবে নয়া সরকার। বদলে এদের দেয়া হবে অল্প কিছু, কাউকে মন্ত্রীত্ব, কেউ হবে এম পি। কেউ রাষ্ট্রদূত। সমাজের কাউকেতো আর শূন্যহাতে বসিয়ে রাখা যায় না। সমাজবাদ বলে কথা।

গরিবি হঠিয়ে দেয়া হবে। চোদ্দোটা বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক সরকার নিজের হাতে নিতে চলেছে। সবাই টাকা ধার পাবে। পারলে পরিশোধ করো। না পারলে চুপচাপ বসে থাকো, কেউ তাড়া তাগাদা দেবে না। চোখ রাঙাবে না।

জানালার পাশে বসেছে রঘু। কামরার এইসব সময়কাটানোর অর্থহীন কথাবার্তা কিছুই কানে যায় না। কিছু শোনে না।

বাইরে তাকায়। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম জমজমাট।

ভাঙ্গাড়ু দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। কোনো কথা বলছেনা।

রঘু দেখছে একমনে। মাত্র চোদ্দামাসে কত পরিচিত হয়ে গেল এই জনপদ!

মানুষের অতলে মানুষই কেন বারবার গড়িয়ে দেয় ভারী নোঙ্গর আবার তুলে নিতে

হবে জেনেও। কী এমন চিরন্তনী প্রত্যাশা মানুষের!

উত্থিত নোঙরসহ যে মাটি উঠে আসবে, তা বইতে কার সাধ হয় দিনের পর - দিন! বড়ো ভার, বড়ো বেশি ভার!

হিমানী, ঝা-স্যার, বুলন, তুলসী দিয়া, ঝিলিক, সুরতিয়া- এরা কারা?

এরা কি দুর্গম পথের পাশে নিবিড় পান্থশালা? নাকি খরস্রোত জলধারার মাঝপথে সময়ের আবর্ত?

কে বলতে পারে এত খুঁটিনাটি ? রঘু বোঝে না, থই নেই

কত যে ঋণ জমে জমে পাহাড়! যে ঋণের পরিশোধে পুরোপুরি অক্ষম যে-কোনো খাতক। পরিশোধের প্রয়োজন তো নেই।

এমন ঋণ সজীব থাকে বলেই মানুষের সান্নিধ্য মানুষই চায়।

রঘু পাঠ পড়ে। একমনে নিজের মতো করে বুঝে নেয়, শিখে নেয়- বর্ণ, বাক্য, প্রশ্নবিহীন সমূহ পাঠ।

ট্রেন দোলে। একটু পিছিয়ে সামনে এগোয়। ক্রমশ গতি বাড়ে।

ভাঙ্গাড্ডুর ডাকে অতল থেকে উঠে আসে রঘু,

-ভাইয়া, চললে?

রঘু কিচ্ছু বলেনা। ট্রেনের গতি বাড়ে। পাশে পাশে কাতর ভাঙ্গাড্ডু দৌঁড়ায়। স্পর্শ করে রঘুর হাত। চাপাশব্দে কাঁদে। দৌড়ায়। স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে ট্রেন ছুটে যায় আর দূরে।

প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় রঘুর অনুচর দাঁড়িয়ে থাকে ভিড় কোলাহলে। পাশাপাশি ছুটে চলার আর পথ নেই।

জানালার উঁকি দেয় রঘু, পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায় ভাঙ্গাড্ডু।

নিষ্ঠুর অরণ্য লুটেরা হয়ে যায় ট্রেন, ক্রমাগত উপড়ে তোলে রঘুর শেকড়।

সমূলে তুলতে পারে না সব। বেশ কিছু শেকড় রয়ে যায় ঐ মাটিতে। যে মাটি সিঞ্চন করবে কেউ কেউ আরো কিছুদিন। কেউ হয়তো জীবনভর।

ট্রেনের গতি আরো বাড়ে। বাড়তেই থাকে।

ঐশ্বর্যময় রিক্ততার সঞ্চয়ে প্লাবিত এক চিলতে নদী আবার বয়ে যায় কলকল।

রঘুর সঞ্চিত সব গল্প সঙ্গে যায়, আর মানুষ পড়ে থাকে পেছনে।

উপাখ্যানের আদ্যোপান্ত ছায়ার মতো একসাথে চলে, যা আগলে ধরে রাখে রঘু।

নদীর বুক থেকে সব জল হারিয়ে যায় কি কোনোদিন? শুকিয়ে যায় হয়তো কিছুটা। শুকোতে শুকোতে বাকি যে জল নদী ধরে রাখে প্রাণপণ-একেই তো স্মৃতি বলে।

এমনি নীলাভ দহনে নীল রঘু মনে মনে বলে,

-ভাঙ্গাড্ডু, ফিরে যা তুই! ফিরে যা আমাদের মায়ের কাছে! মাকে বলিস,ওঁর হাতে

গড়া রুটির টানে আবার আসব আমি! খান কয়েক রুটি যেন সেঁকে তুলে রেখে দেন আমার জন্যে, কোনও অমোঘ তৈজসে! আমি আসবই! দূরে যেতে হবে জেনেও আমায় বারবার ফিরে আসতে হয় মানুষের কাছে।